মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্

ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

নূর-উদ-দীন আহমদ
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ঃ
মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী
অনুবাদ ঃ নূর-উদ-দীন আহ্মদ

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৭৩০
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২২·৯৭
ISBN : 984-06-0087-7

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্টোবর ১৯৬৯

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
ডিসেম্বর ১৯৯২
কার্তিক ১৩৯৯
রবিউস সানি ১৪১৩

প্রকাশনায় ঃ
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়েঃ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৫৫·০০ টাকা

SHAH WALIULLAH O TAR RAJNAITIK CHINTADHARA: Shah Waliullah and his political thoughts, written by Moulana Obaidullah Sindhi, translated by Nur-ud-din Ahmed, and published by Director of Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. December 1992

Price: TK. 55·00 ; Dollar (US) : 3·00

প্রকাশকের কথা

উপমহাদেশের অন্যতম প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারার উপর মওলানা উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধী রচিত 'শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ আউর উনকি সিয়াসী তাহরীক' পুস্তকটি তৎকালীন মুসলিম রাজনৈতিক পরিবেশ ও বৈপ্লবিক চেতনার একটি তথ্যবহুল চিত্র। 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা' তারই সাবলীল বাংলা অনুবাদ।

এই গ্রন্থখানির মাধ্যমে তদানীন্তন মুসলিম সমাজ শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যেভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, আধুনিক বাংলাদেশী মুসলিম পাঠক সমাজ অনুরূপভাবে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সংগে পরিচিতি লাভে সমর্থ হবেন, অনুপ্রেরণা পাবেন এবং সেই সংগে তার মূল্যায়নও করতে পারবেন।

বইটির পর পর তিনটি সংস্করণ সেই উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করা হল।

প্রসংগ কথা

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী একটি সুপরিচিত নাম। খুব বেশি দিনের কথা নয়, ১৯৪৪ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বৈপ্লবিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত থেকেও বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে উর্দু ভাষায় রচিত 'শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আওর উনকি সিয়াসী তাহরীক' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মওলানা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহলবী উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের অন্যতম খ্যাতনামা দার্শনিক পন্ডিত। সম্রাট আলমগীর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উপমহাদেশের মুসলিম সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ধসে পড়ে। সর্বস্তরে মুসলমানের পতন আরম্ভ হয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আপন সমাজের এ পতন রোধ করার জন্য বিশেষ তৎপর হন এবং তৎকালীন বিচারে একটি নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, মারাঠা-শক্তি খর্ব করার অভিপ্রায়ে তিনিই আহমদ শাহ্ আবদালীকে আহ্বান করেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে সাধক শ্রেণীর আলিম হয়েও সামাজিক অবক্ষয় রোধের জন্য যে পন্থা নির্দেশ করেন তৎকালীন অবস্থায় তাঁকে বৈপ্লবিক বলা যায়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র মতেঃ 'যদি কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার বিকাশধারা অব্যাহত থাকে তাহলে তাদের শিল্পকলা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তারপরে শাসকগোষ্ঠী যদি ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ এবং ঐশ্বর্যের মোহে আচ্ছন্ন জীবনকেই বেছে নেয়, তাহলে সে আয়েশী জীবনের বোঝা মজদুর শ্রেণীর উপরেই চাপে; ফলে সমাজের অধিকাংশ লোক মানবতাশূন্য পশুর জীবন যাপনে বাধ্য হয়। গোটা সমাজ জীবনের নৈতিক কাঠামো তখনই বিপর্যস্ত হয় যখন তাকে বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়। তখন লোককে রুজী-রুটির জন্য ঠিক পশুর মতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। মানবতার এ চরম নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগের মুহূর্তে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্য

আল্লাহ্ কর্তৃক নিশ্চয়ই কোন পথের নির্দেশ এসে থাকে, অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের বুকের উপর থেকে বেআইনী শাসকচক্রের জগদ্দল পাথর অপসারিত করার ব্যবস্থা তিনি করেন।' উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের ইতিহাসে এরূপ বৈপ্লবিক মতাবলম্বী এবং সর্বজনস্বীকৃত সাধক আলিম বিরল। উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর লিখিত গ্রন্থে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার তথ্যসম্বলিত বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশী পাঠক সমাজকে মুসলিম ইতিহাসের এই মূল্যবান অধ্যায়ের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে এই বংগানুবাদ প্রকাশ করা হলো।

বিষয়–সূচী

পরিশিষ্ট

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

লেখক পরিচিতি

ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেছিলেন মরহুম উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান এবং মর্যাদার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে ইসলামী সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং চিন্তাধারার দিক দিয়ে বিপ্লবী। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচিত্র গতি–প্রকৃতি এবং বিবর্তন–পরিবর্তন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মোহাদ্দেস দেহ্লবীর রাজনৈতিক দর্শনের তিনি ছিলেন নিপুণ সমজদার।

এ গ্রন্থে তিনি সে আন্দোলনের একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে এ উপমহাদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি অজ্ঞাত যুগের চিত্র উন্মোচিত করেছেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ পূর্ব পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার চিয়ানওয়ালীতে এক শিখ পরিবারে উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল রাম সিং। এ পিতৃহীন শিশু তাঁর মামার অভিভাবকত্বে ডেরাগাজী খানে এক স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ডেরাগাজী খান সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশের সন্নিহিত পাঞ্জাবের একটি জেলা। সিন্ধু এবং সীমান্তে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা পীর–ফকীরের প্রতি বরাবরই খুব অনুরক্ত। কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সবাই সূফী–সাধকদের কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভে আগ্রহান্বিত। এ অঞ্চলে বহু বড় বড় সূফী–দরবেশের আবির্ভাব ঘটেছে। সাধারণের উপর সূফী–সাধকদের বিশেষ প্রভাব–প্রতিপত্তি ছিল। তারা শ্রদ্ধার সাথে ওঁদের কীর্তিকলাপ স্মরণ করে থাকে। এ পরিবেশেই শিখ উবায়দুল্লাহ্র শৈশবের দশ–বারো বছর কেটেছিল। তাঁর পরিবারের সবাই ছিল শিখ। শিখদের গুরু বাবা নানক।

বাবা নানক ছিলেন স্বয়ং একজন সাধু দরবেশ। তাঁর শিক্ষা মুসলিম পীর-দরবেশের শিক্ষার সাথে অনেকখানি সাদৃশ্যপূর্ণ। পরে অবশ্য রাজনৈতিক কারণে শিখদের ধর্ম ও সমাজের রূপ অনেকটা পরিবর্তন লাভ করে। মোট কথা, শিখদের ধর্মমত এবং সূফী দর্শনের মধ্যে বেশি ব্যবধান ছিল না। ধর্মের বাহ্যিক আচারের প্রতি অনাসক্তি, আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস, অহিংসা, সৎকর্মে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বুনিয়াদী বিষয়ই শিখ ধর্মের মূলমন্ত্র। এ সাদৃশ্যের ফলে সংখ্যাগুরু মুসলমান সমাজের সাথে শিখদের ভাব বিনিময় এবং মেলামেশা সহজ হওয়ার পথে অন্তরায় না থাকারই কথা। শিখ বালক উবায়দুল্লাহ্ মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছিলেন এবং তার ফলে পরধর্মের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার ভাব ধীরে ধীরে লোপ পায়। মুসলমানের ধর্ম-কর্ম, আচার-আচরণ খুব নিকট থেকে দেখবার এবং বুঝবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

এ ঘনিষ্ঠতার ভিতর দিয়ে মন তার অজ্ঞাতসারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁর অনুসন্ধিৎসু কচি মনে নিজের ধর্ম এবং সমাজের চেয়ে ইসলামই অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। দু'টি ধর্মের ভাল-মন্দের বিচার বিবেচনা তিনি নিজে নিজেই করেছিলেন। কেউ কোনদিন তাঁকে ইসলামের মাহাত্ম্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাতে যায়নি বা কারো মুখে শোনা কথার প্রতিও তাঁর কোন আস্থা জন্মেনি। ইসলামের ন্যায় শিখ ধর্মেও আল্লাহ্র একত্ব স্বীকৃত, এ ধর্মেও সাম্যের শিক্ষা আছে। তবু ইসলামই বালকের হৃদয়কে আকৃষ্ট করেছিল।

এ আকর্ষণ দিন দিন তাঁর কিশোর মনে গভীর দৃঢ়মূল হতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন, একমাত্র ইসলামই তাঁর প্রাণকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। কিন্তু স্নেহময়ী মা, ভগ্নী, মামা, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ এবং জাতি? তাদেরকে কি তবে চিরতরে ত্যাগ করতে হবে?

এ প্রশ্ন যে তাঁর কচি মনকে বিব্রত করেনি, তা মনে করা চলে না। কিন্তু সংখ্যায় খুব অল্প হলেও এমন বিপ্লবী মনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা প্রাণের দাবির কাছে সব কিছু বিসর্জন দিতে পেরেছে। বিশেষ করে ইসলাম গ্রহণের বেলায় তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শিখ বালকের বেলায়ও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। ইসলামের আকর্ষণ তাঁকে একদিন ধর্ম–সমাজ, জ্ঞাতি–স্বজন, সব বন্ধন ছিন্ন করতে প্রেরণা যোগাল।

একদিন বালক চুপ করে ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে সিন্ধুর এক মুসলিম ধর্ম সাধকের হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কোন মোহ, আকর্ষণ, প্রচার বা প্রতারণা, ভয় বা ভীতি ছাড়াই একটি বালকের পক্ষে একান্ত সুস্থ পরিবেশে এমন একটি গুরুতর বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যার ফলে তাঁকে আত্মীয়–স্বজন, সমাজ–ধর্ম সবই চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিতে হয়েছিল–কতো বড় দুরূহ কর্ম তা সহজেই অনুমেয়। সত্যের জন্য যারা অবলীলাক্রমে জীবন বিসর্জন দিতে পারে, এ কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব। এ বালক যে একটি দুরন্ত বৈপ্লবিক মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, শৈশবে ইসলাম গ্রহণের মধ্যেই তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিদ্যমান।

শিখ পরিচয় নিঃশেষে মুছে ফেলে তিনি মুসলিম সমাজে নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর ইসলামী নামকরণ হলো উবায়দুল্লাহ্।

তারপর উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধুর তৎকালীন পীর–সুফীদের খানকায় ঘুরে ঘুরে ইসলামের রীতিনীতি, ইবাদত–বন্দেগী এবং তরীকা–তাসাউফ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। শৈশবে ক্রমাগত বিচার–বিবেচনার পর অটল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে যে পথ গ্রহণ করেছিলেন সেখানেই তিনি তাঁর মনের সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন। এভাবে তাঁর জীবনের পঁচিশ বছর কেটে গেলো। অতপর তিনি দেওবন্দে এসে দীনী–ইলম শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান ছিলেন তখন দেওবন্দের প্রধান পরিচালক এবং ওস্তাদ। তিনি নও–মুসলিম যুবক উবায়দুল্লাহ্র মধ্যে প্রতিভা, দৃঢ়তা এবং বৈপ্লবিক মনের পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিজ আদর্শে গড়ে তুললেন।

উবায়দুল্লাহ্ দেওবন্দের শিক্ষা সমাপ্ত করে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্, মান্তেক এবং ইসলামী দর্শনে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি পুনরায় সিন্ধুতে ফিরে যান এবং সেখানে ৬/৭ বছর শিক্ষাদান কার্যে লিপ্ত থাকেন। তিনি সেখানে একটি মাদ্রাসাও স্থাপন করেছিলেন। মাদ্রাসার ছাত্র এবং শিক্ষকদের ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন।

কিছুদিন পর তিনি তাঁর ওস্তাদ শায়খুল হিন্দ কর্তৃক দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠনের কার্যে আহূত হয়েছিলেন।

মওলানা উবায়দুল্লাহ্ দেওবন্দে শিক্ষালাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি দেওবন্দের বাহ্যিক রূপ, রং এবং আকৃতি-প্রকৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্র যে চিন্তাধারা দ্বারা দেওবন্দের বিশিষ্ট নেতাগণ অনুপ্রাণিত ছিলেন, তিনি সে আদর্শ ও দর্শনের মর্মমূলে পৌঁছে ছিলেন এবং তারই তিনি অনুরক্ত ছিলেন। শায়খুল হিন্দও তাঁর এরূপ যোগ্য শিষ্যের কাছে দেওবন্দ প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক লক্ষ্যের বিষয় খুলে বলেছিলেন। মওলানা উবায়দুল্লাহ্ ইসলামকে যে দৃষ্টিতে দেখছিলেন দেওবন্দের ওলামাদের এক অংশের তা মনঃপূত ছিল না। এজন্য তাঁরা মওলানার প্রতি কাফেরী ফতোয়া পর্যন্ত আরোপ করেছিলেন।

দেওবন্দ থেকে তিনি দিল্লীতে চলে এলেন। সেখানে এসে কুরআনের শিক্ষা ও মূল্যবোধের আদর্শে মুসলমান সমাজকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 'নাজারাতুল মা'রেফ' নামে একটি মাদ্রাসার ভিত্তি পত্তন করেন। মওলানার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, ইসলাম মানব সমাজের মুক্তির শ্রেষ্ঠতম উপায়। তাঁর আপত্তি ছিল, মনগড়া সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং তার বিরুদ্ধেই তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ইসলামের সত্য রূপ কুরআনে বিধৃত এবং কুরআনের ইসলামই বিশ্বমানবকে এক সূত্রে আবদ্ধ করতে সক্ষম, তিনি এ দৃষ্টিভংগিতেই ইসলামকে দেখেছিলেন এবং এ আস্থায় অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি কার্যে অবতীর্ণ হন।

১৯১৪ সন। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। মওলানা অন্য ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন। সে দিন বিশ্ব-মুসলিমের আশা-আকাংক্ষা নিবদ্ধ ছিল তুর্কী খেলাফতের উপর। ইংরেজরা তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। উপমহাদেশের মুসলমানরা তুর্কী মুসলমানদেরকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করলো। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ওস্তাদ শায়খুল হিন্দের নিকট থেকে কাবুল গমনের নির্দেশ লাভ করেন। বৃদ্ধা শিখ জননীর সান্ত্বনার একমাত্র নির্ভর ছিল তাঁর এ ধর্মত্যাগী পুত্র। কিন্তু কর্তব্যের আহবানে তাকে কাবুল যেতে হলো। বহু কষ্ট স্বীকার করে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কাবুল পৌঁছেন।

হাবিবুল্লাহ্ খান তখন কাবুলের বাদশাহ। তিনি ছিলেন বৃটিশের সাথে চুক্তিবদ্ধ বরং কতকটা বৃটিশের আশ্রিত। বৈদেশিক ব্যাপারে বৃটিশের পরামর্শ ব্যতীত তাঁর এক পাও নড়বার সাধ্য ছিল না। মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর কাবুল যাওয়ার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। উপমহাদেশ থেকে আরো অনেকে তখন কাবুলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তুরস্ক এবং জার্মানী থেকেও কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের দরবারে উপস্থিত হন। পাঠান জাতি যাতে বৃটিশের সংগে সহযোগিতা না করে এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা সকলে কাবুলে এসেছিলেন। আমীর হাবিবুল্লাহ্ খান এ সকল প্রতিনিধির সাথে বাহ্যত ভাল ব্যবহারই করেছিলেন। কিন্তু বৃটেনের বিরুদ্ধাচরণ করা তখন তিনি সমীচীন মনে করেন নি। আফগানিস্তানের তখন উভয় সংকট। একদিকে বৃটেন এবং রাশিয়ার চেষ্টা ছিল আফগানদেরকে নিরপেক্ষ রাখা। অন্যদিকে তাদের শত্রুদের চেষ্টা ছিল আফগানদের বৃটেনের বিরুদ্ধাচরণে প্রবুদ্ধ করা।

কাবুল সেদিন ছিল এশিয়ার সুইজারল্যান্ড। প্রত্যেক দেশের রাজনীতিক ও কূটনীতিকগণ সেখানে কূটনৈতিক কার্যকলাপে বিশেষভাবে লিপ্ত হয়েছিলেন। মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী বিশ্ব–রাজনীতির এ ক্রীড়া সেখানে বসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ কূটনৈতিক তৎপরতার তিনি নীরব দর্শক ছিলেন না, বরং তাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের রাষ্ট্রশাসন প্রণালীও খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। কাবুলের এ স্বৈরতান্ত্রিক শাসন যে ভিতর থেকে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল তা তিনি স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

মওলানা বিশ্ব–মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রেরণায় যখন স্বদেশ পরিত্যাগ করেছিলেন তখন তাঁর নিজের এবং তার বন্ধুবর্গের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে, যে কোন মূল্যে উসমানীয় খেলাফতের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে; কিন্তু তিনি কাবুলে পৌছে দেখলেন যে, প্রত্যেক দেশেরই তার নিজস্ব সমস্যা রয়েছে এবং সে সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিতে সে বাধ্য। কাবুলে বসবাসকালেই তাঁর এ অভিজ্ঞতা জন্মেছিল যে, নিজ গৃহ, দেশ এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আফগান এবং উপমহাদেশের মুসলমানগণ, মুসলমান

হিসাবে এক হওয়া সত্ত্বেও তাদের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা রয়েছে। পাঠান উপমহাদেশের মুসলমানের নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি নয় এবং উপমহাদেশের মুসলমানও তেমনি পাঠান নেতৃত্বের অধীনে কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে না। সম্ভবত এসব লক্ষ্য করেই মওলানা বিশ্ব–মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি বুঝতে পারেন, জাতীয়তাবোধের একটি স্বতন্ত্র দিক রয়েছে।

সম্ভত এ থেকেই তাঁর মধ্যে উপমহাদেশীয় জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি হয়েছিল। মওলানার পরবর্তীকালীন চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে হলে তাঁর কাবুল প্রবাসকালীন জীবন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক।

মওলানার কাবুলে অবস্থানকালেই বিশ্বযুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে। জার্মানী পরাজয় বরণ করলো এবং তুরস্ক মিত্রশক্তি দ্বারা অবরুদ্ধ হলো।

মওলানা তুরস্কের খেলাফত রক্ষার জন্য দেশ ত্যাগ করেছিলেন। দেখা গেল, খেলাফত তার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হলো না। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে নামমাত্র বন্ধন অবশিষ্ট ছিল তাও শেষ হয়ে গেল। তুরস্কের সহায়তায় উপমহাদেশের মুসলমান তার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। তুরস্কের পতনের পর সে আশা বিলীন হয়ে গেল।

অতপর উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতির নতুন পর্যায় শুরু হয়। মওলানার দৃষ্টিভংগিও পরিবর্তন লাভ করে। মওলানা মাহমুদুল হাসান মালটার বন্দীজীবন থেকে ফিরে এসে কংগ্রেসে যোগদান করেন। মওলানা মুহম্মদ আলী, ডাঃ আনসারী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ নেতা কংগ্রেসে যোগদান করলেন। কাবুলেও তখন কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী সে শাখার সভাপতি ছিলেন। তখনকার বিশ্ব–মুসলিম রাজনীতির প্রেক্ষিতে উপমহাদেশের অধিকাংশ নেতাই হিন্দু–মুসলমান মিলিত রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন।

মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীও সে পথই বেছে নেন। অবশ্য প্যান–ইসলামিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁদের মতে অটল থাকলেন। কাবুল থেকেই মওলানা উপমহাদেশের মুসলমানদের

রাজনীতির মোড় পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাঁর কংগ্রেসে যোগদানের মূলে আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের পরামর্শ ছিল বলে তিনি বলেছেন।

আফগানিস্তান তখন একটি বিপ্লবের সম্মুখীন। আমীর হাবিবুল্লাহ্ খান তাঁর জালালাবাদের গ্রীষ্মাবাসে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এরপরে এলেন আমীর আমানুল্লাহ্। তিনি সিংহাসনে বসেই বৃটিশ ভারতীয় শাসনের উপর আক্রমণ চালালেন। দু'একটি সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর বৃটেনের সাথে আমীর আমানুল্লাহ্‌র সন্ধি হলো। বৃটিশ সরকার আমীর আমানুল্লাহ্‌কে আফগানিস্তানের সার্বভৌম বাদশাহ বলে মেনে নিলেন। আফগানিস্তান এবার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ব্যাপারে সার্বভৌম মর্যাদার অধিকারী হলো।

আফগানিস্তানের এ বিপ্লব এবং তার পরিণতি মওলানা সেখানে বসে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

অজ্ঞাত কারণে তিনি কাবুল পরিত্যাগ করে ১৯২২ সনে রাশিয়া চলে যান। দীর্ঘ এক বছর ধরে তিনি রাশিয়া ভ্রমণ করেন এবং মস্কোতে অবস্থান করেন। ১৯২৩ সনে তিনি সেখান থেকে তুরস্ক চলে যান।

কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে তিনি রাশিয়া গিয়েছিলেন। লেনিন তখন জীবিত। রাশিয়ায় তখন জারের আমল খতম হয়েছে। সাম্যবাদী রাশিয়ার উথানপর্ব জোরেশোরে চলছিল। মওলানা রাশিয়ায় সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দকে বিপুল কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ দেখতে পান। তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, ত্যাগ এবং কর্মনিষ্ঠা দেখে মওলানা অনুপ্রাণিত হন। মস্কোতে তিনি এক বছর অবস্থান করেন।

কাবুলের প্রবাসজীবনে গোঁড়া আলিমদের সংকীর্ণতা, ইসলামী রাষ্ট্রগুলির পতন এবং আরো বহু দৃশ্যপট একটির পর একটি মওলানার চোখের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছিল। তিনি পরে যখন রাশিয়ায় আর একবার এসেছিলেন তখন সেখানে এক নতুন সৃষ্টির মহা উদ্যম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি সেখানকার নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তাঁদের দ্বারা অনেকখানি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি তাঁর অটল-অবিচল ভক্তিতে কোন ফাটল সৃষ্টি হয়নি। নতুন রাশিয়া ছিল ধর্মহীন এবং

মওলানা ছিলেন খাঁটি মুসলমান, পাকা দ্বীনদার। এ সত্ত্বেও তিনি রাশিয়ার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের অসাধারণ কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সাম্যবাদী আদর্শের ভালো দিকগুলির স্বীকৃতি দানে অকুণ্ঠ ছিলেন। তবু তিনি মুসলমান ছিলেন এবং সাম্যবাদী বিপ্লবের চেয়েও ইসলামের বৈপ্লবিক শক্তি এবং আদর্শ অনেক উঁচু বলে বিশ্বাস করতেন।

মওলানা নীতিনিষ্ঠ লোক ছিলেন। বিবেককে তিনি কখনও বিসর্জন দেন নি। তাঁর মধ্যে কপটতা ছিল না। অন্তরে যা বিশ্বাস করতেন তা প্রকাশ করার সাহস তাঁর ছিল। নিজের বিবেক–বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী তিনি চলতেন। কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার কাছে তিনি নতি স্বীকার করতেন না। ব্যক্তিত্বের হোক, ধর্মের নামে হোক, যে কোনরূপ বাধার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করতেন। এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, তিনি ইসলামের বৈপ্লবিক শক্তি এবং ইসলামিক জীবনবোধকে রাশিয়ার সাম্যবাদী বিপ্লবের চেয়ে অনেক উচ্চে স্থান দিতেন। কিন্তু এও সত্য যে, ইসলামের যে বৈপ্লবিক রূপ তাঁর মানসলোকে ছিল, উপমহাদেশ বা কাবুলে সে ইসলামের নমুনা তিনি দেখতে পান নি। কাজেই স্বৈরাচারী বাদশাহ্ এবং আদর্শচ্যুত ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তিনি সমর্থন জানাতে পারেন নি। পূর্বেও এসব বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। মস্কো থেকে ফিরে আসার পর তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত হন। পূর্বেই বলা হয়েছে, মস্কো থেকে মওলানা তুরস্কে চলে গিয়েছিলেন। মুস্তফা কামাল পাশা তখন তাঁর মত ও আদর্শানুযায়ী নব্য তুর্ক গঠন করেছিলেন। খেলাফত উচ্ছেদ করা হয়েছিল। শরীয়তী কানুনের পরিবর্তে সুইজারল্যান্ডের অনুকরণে কানুন জারি হলো। তুর্কী টুপি ধারণও নিষিদ্ধ করা হলো। শায়খুল ইসলাম তুরস্ক থেকে নির্বাসিত হলেন। ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং মাদ্রাসাগুলি আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। আরবী বর্ণমালা উচ্ছেদ করে ল্যাটিন বর্ণমালা জোর করে প্রবর্তন করা হলো। এক কথায় সমস্ত প্রচলিত ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে এক সম্পূর্ণ নতুন তুরস্ক গঠনে মনোযোগ দিলেন কামাল পাশা ও তাঁর অনুসারিগণ। দীর্ঘ সারে তিন বছরকাল মওলানা এ বিপ্লব স্বচক্ষে দর্শন করেন। তাঁর মতো তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি যে দুনিয়ার এরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন নির্বিকার চিত্তে দর্শন করেই সন্তুষ্ট

ছিলেন না তা সহজেই অনুমান করা চলে। পৃথিবীব্যাপী এ বিপ্লব এবং তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল ও তাৎপর্য নিশ্চয়ই তিনি গভীর নিষ্ঠার সাথে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছিলেন।

তুরস্ক থেকে তিনি ইসলামের কেন্দ্রভূমি হিজাযে চলে আসেন। হিজাযের পথে তিনি ইটালী এবং সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন। হিজাযে তখন ইবনে সউদের হুকুমত কায়েম হয়েছে। প্রায় বারো বছর কাল তিনি সেখানে অবস্থান করে সেখানকার ইসলামী হুকুমতের নমুনা খুব নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পান। সেখানে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। হিজায সরকার সম্পর্কে উপমহাদেশের মুসলমান দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি তা থেকে নিরপেক্ষ ছিলেন প্রমাণ পেয়েই সৌদী সরকার তাঁকে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দেন।

হিজাযের সুদীর্ঘ জীবন তিনি অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনাতে কাটান। উপমহাদেশ এবং আরবের বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে তিনি অধ্যয়নের জন্য গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। শিক্ষার্থীদেরকে তিনি বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষা দিতেন। এ সুদীর্ঘ অবকাশকালেই তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লবীর গ্রন্থাবলী আগা-গোড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন। এবং তেরশ' বছরের ইসলামী ইতিহাস গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ পান।

হিজায প্রবাসকালে তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। সেখানে যাঁরা তাঁর সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন, তাঁরা তাঁকে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মধ্যে ডুবে থাকতে দেখেছেন।

হিজাযের সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবনে মওলানা নিজের অতীত জীবন এবং সে জীবনের সঞ্চয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন। সেখানে বসেই তিনি তাঁর বক্তব্য ভাষায় রূপ দেন। তাঁর স্বকীয় চিন্তাধারা প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। সুতরাং তিনি যে নির্ভুল ছিলেন এ বিশ্বাস তাঁর হয়েছিল।

তিনি তাঁর চিন্তা ও গবেষণার ফলাফল এবং অভিজ্ঞতা জনসাধারণের গোচরে আনয়ন করতে এবং তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বহু মূল্যবান সঞ্চয় সকলের মধ্যে

বিতরণ করতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু হিজাযের জনসাধারণ না তার কথা হৃদয়ংগম করতে পারতো, না তাদের কোন প্রয়োজন ছিল। মওলানার চিন্তাধারা দ্বারা তাঁর স্বদেশবাসীই উপকৃত হতে পারতো। কিন্তু তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সুযোগ পেলেন, তখন সরকার তাঁর উপর বহু বিধিনিষেধ আরোপ করলো। এসব স্বীকার না করে তাঁর পক্ষে দেশে আসা সম্ভব ছিল না। সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও তৎলব্ধ জ্ঞান ও জীবনবোধ স্বদেশবাসীকে দেবার জন্যই সমস্ত বিধিনিষেধ স্বীকার করেও জীবনের শেষভাগে তিনি দেশে ফিরে আসেন।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ৯ই মার্চ তিনি করাচীর উপকূলে অবতরণ করেন এবং সেখান থেকেই তিনি তাঁর মতামত প্রচার করতে শুরু করেন। তাঁর দীর্ঘ ২৪ বছরের প্রবাস–জীবনে তাঁকে সংকটের মোকাবেলা করতে হয়েছে। সুদীর্ঘ প্রবাস–জীবনে কত কথাই না জমা হয়েছিল! কিন্তু প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। দেশে ফিরে তিনি সে সব কথা বলার জন্য ব্যাকুল হলেন। তাঁর কথা সকলের মনঃপূত হয়নি। কিন্তু তারা জানতো না মওলানার জীবনে কতো তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং সে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া কত প্রয়োজন!

তিনি বলতেন, 'তোমরা এ যে খেলনার ঘর তৈরী করেছ এবং একেই বিশাল আসমান বলে বিশ্বাস করে নিয়েছ, কালের প্রবাহের মুখে এ টিকে থাকতে পারবে না। তোমাদের সংস্কৃতি,সভ্যতা, তোমাদের সমাজ, তোমার চিন্তাধারা তোমাদের রাজনীতি এবং তোমাদের অর্থনীতি সব কিছুর মধ্যে ঘুন ধরেছে। তোমরা একেই ইসলামী সভ্যতা নাম দিয়েছ, কিন্তু এতে ইসলামের কোন চিহ্ন নেই। তোমরা তোমাদের গোঁড়ামিকেই মযহাবের নামে চালিয়ে নিচ্ছ। মুসলমান হতে চাও তো ইসলাম কি, তা আগে বোঝ। তোমরা যাকে ইসলাম বলছ, ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তোমাদের নেতৃবৃন্দ পদমর্যাদালোভী। তোমাদের শাসকবৃন্দ ভোগবিলাসী এবং তোমাদের জনসাধারণ বিভ্রান্ত। জাগো! পরিবর্তন আনো! যুগ তোমাদের চিহ্ন পর্যন্ত মিটিয়ে দেবে।'

মওলানা এসব কথা তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বলতেন। তিনি কাবুলে আমীর হাবিবুল্লাহ্ খানের পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছেন,

তিনি তুরস্কে সুলতান আবদুল হামীদ জিল্লুল্লাহ্‌র পরিণাম দেখেছেন, তিনি রাশিয়ায় জারের পতনও দেখেছিলেন। এসব দেখেশুনেই তিনি তাঁর দেশবাসীকে শোষণ এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন। তাঁর সে আহবানে সাড়া দেওয়ার প্রতি অনেকেরই আগ্রহ ছিল না। তাঁরা তাঁকে ব্যংগ–বিদ্রূপ করতেন, গালিগালাজ করতেন। কিন্তু তিনি যে বিপ্লব তরংগ উত্থিত হতে দেখেছিলেন, দেশ ও জাতিকে তৎসম্বন্ধে সাবধান না করে তাঁর পক্ষে বিরত থাকা সম্ভব ছিল না।

যে উদ্দেশ্যের জন্য মওলানা তাঁর মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছিলেন, সে উদ্দেশ্যের জন্য তিনি বন্ধু–বান্ধব পরিত্যাগ করাও তার পক্ষে কঠিন ছিল না। সুদীর্ঘ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন মনে করতেন, বন্ধু–স্বজনের প্রীতি, ভালবাসা এবং মান–মর্যাদার খাতিরে সে সত্য তিনি গোপন রাখতে পারতেন না।

মওলানা ছিলেন শাহ্‌ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারার অনুসারী। শাহ্‌ সাহেবের রাজনৈতিক দর্শন উপমহাদেশে যে বিরাট মুজাহিদ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, বালাকোটের ময়দানে মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর শাহাদতের আন্দোলনের সাথে তার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। দেওবন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলনের কার্যধারা পরিচালিত হয়েছিল। শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান ছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে এ আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। মরহুম উবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধী ছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ও বিশিষ্ট কর্মী। তাঁর সমগ্র জীবন জাতির মুক্তি সংগ্রামে অতিবাহিত হয়েছে। গভীর অনুসন্ধিৎসা, উদ্যম, উদ্দীপনা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং অবিরাম চেষ্টাই ছিল তাঁর মহান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দর্শন ও চিন্তাধারা তিনি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ দেহ্‌লবী প্রবর্তিত রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি উর্দুতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি শাহ্‌ 'ওয়ালীউল্লাহ্‌ দেহ্‌লবীর দর্শন' নামেও একখানা পুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া তিনি 'কুরআনী দস্তুরে ইনকিলাব' নামেও একখানা পুস্তক রচনা করেছেন।

১৯৪৪ সনের ২০শে আগস্ট তিনি ইন্তিকাল করেন।

উপক্রমণিকা

করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে—

সব গুণগান আল্লাহ্‌র ; সত্য পথ প্রাপ্তদের উপর বর্ষিত হোক শান্তি।

১৯১৫ সনে আমরা কাবুলে পৌঁছি। শায়খুল হিন্দ–এর (মাহমুদুল হাসান) নির্দেশানুযায়ী আমরা এ সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সুতরাং আমাদের এ সফর উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ডাঃ স্যার ইকবাল খুব সম্ভব আমাদিগকে স্মরণ করেই তাঁর 'খিয্‌রে রাহে' উল্লেখ করেছিলেন—

'উহ্ হয্‌র বে বর্‌গ ও সামাঁ
উহ্ সফ্‌র বে সন্‌গ মীল

সে নিঃসম্বল, পাথেয়হীন, সে নিরুদ্দেশের যাত্রী।–দীর্ঘ সাত বছর কাবুলে অবস্থানকালে, বর্তমান দুনিয়ার সাথে উপমহাদেশের যোগসূত্র কি, এ প্রশ্নটাই বুঝতে চেষ্টা করেছি। তার ফলে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের দেশে এমন কিছু সংখ্যক তীক্ষ্ণধী লোক অবশ্য এখনো রয়েছেন, যাঁরা আল্লাহ–দত্ত প্রজ্ঞার বলে অথবা ইউরোপে অবস্থান করে বিভিন্ন বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করার পর, বর্তমান জগতের সঠিক পরিস্থিতি অনুধাবনে সক্ষম; নতুবা আমাদের সাধারণ শিক্ষিতদের সম্পর্কে বলা যায় ঃ

'হায় হনুয খাব মে, জু জাগে হায় খাব সে'

ঘুম থেকে যে জেগেছে, সেও সে ঘুমেই কাতর। –ইউরোপে অবস্থানকালে ফরাসী বিপ্লব এবং তার পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছি। তার ফলে, বাদশাহ্ আলমগীরের পরবর্তীকালে এই উপমহাদেশের রাজনীতিতে যে উত্তাল তরংগের ঘাত–প্রতিঘাত দেখা দিয়েছিল, তার মাঝে একটি আশার আলোকস্তম্ভ

দেখতে পেলাম। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র আন্দোলন সে আলোকস্তম্ভ। মক্কা মুয়াজ্জমায় বসে আমি সে আন্দোলনের বৈপ্লবিক ভূমিকা নির্ধারণ করি।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র দর্শন গভীরভাবে পর্যালোচনা করার পর আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, কার্ল মার্কসের দর্শনের তুলনায় ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র দর্শন যে পৃথিবীর জন্য অধিকতর কল্যাণকর, একথা আমরা জোর করে বলতে পারি। সে আন্দোলন থেকে আমরা এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উত্তরাধিকার লাভ করেছি। বালাকোটের ঘটনার পরে এদেশে যতগুলি নতুন রাজনৈতিক আন্দোলন জন্ম নিয়েছেন তার কোনটাকেই খাঁটি বলা যায় না; কিন্তু ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র আন্দোলনে কোন কৃত্রিমতা নেই।

এখানে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র গণআন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পেশ করছি। এতে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে শায়খুল হিন্দ পর্যন্ত ঘটনাবলীর একটা মোটামুটি আভাস দেওয়া হয়েছে এবং তা 'হিযবে' ওয়ালীউল্লাহ্‌র ইতিহাসের ভূমিকারূপে পরিগণিত হতে পারে।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র দর্শন আমরা যেভাবে বুঝেছি তার তাৎপর্য তাঁর আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা ব্যতীত অপরকে বোঝানো সম্ভব নয়। আমার এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা গোটা আন্দোলনেরই ভূমিকা। অবশ্য এ কাজ অর্থাৎ দেশের ইতিহাস আলোচনা আমাদের মেধাবী তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য। তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হলে এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের বিরাট সৌধ গড়ে তুলতে পারেন।

১১৪৪ হিজরীর ২১শে যিল্‌কদ মোতাবেক ১৭৩১ খৃস্টাব্দের ৫ই মে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ দিল্লী রাজ–তখতের বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলা রোধ করার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে একটি বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সম্ভবত তার পাঁচ বছর পূর্বে তিনি কুরআন শরীফ সর্বপ্রথম ফারসীতে তরজমা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ফরাসী বিপ্লবের আটান্ন বছর পূর্বে উপমহাদেশের ইতিহাসে এ বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা সংঘটিত হয়। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ নিজেই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্থির করেছিলেন, কর্মপন্থা বেছে নিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন

করেছিলেন এবং তার শাখা সারা দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। এভাবে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক একটি মুসলিম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এ সংগঠনকে একটি অস্থায়ী সরকারের রূপ (Provisional Government) দিয়েছিলেন। কিন্তু ১২৪৬ হিজরীর ২৭শে যিল্‌কদ মোতাবেক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে শুক্রবার বালাকোটের ময়দানে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

এ এক শতাব্দীকালের মধ্যে এ আন্দোলনের পুরোভাগে তিনজন ইমাম বা জাতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল এবং এভাবে একটি জাতীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(১) ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ ১৭৩১–১৭৬৩খৃঃ

(২) ইমাম আবদুল আযীয ১৭৬৩–১৮২৪

(৩) ইমাম মুহম্মদ ইসহাক ১৮২৪–১৮৪৬,,

অস্থায়ী সরকারের আমীর সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলবী ১৮২৬–১৮৩১ খৃষ্টাব্দ।

আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এভাবেই শেষ হয়েছিল। আন্দোলনের এ পর্যায়ে আর এক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছিল। তিনি আমীর, নেতা বা ইমাম কিছুই ছিলেন না বটে, কিন্তু চরিত্র মাহাত্ম্যে এবং শাহাদত বরণ করে তাঁর পিতামহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্দোলনে নবজীবন সঞ্চার করেছিলেন। তিনি হলেন ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র পৌত্র শাহ্ আবদুল গনী সাহেবের পুত্র মওলানা শাহ মুহম্মদ ইসমাঈল শহীদ।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেছিলেন ইমাম মুহাম্মদ ইসহাক ১৮৩১ সনে। তিনি ১৮৪১ সন পর্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করেছিলেন।

তারপরে তিনি ১৮৪৬ সন পর্যন্ত মক্কা শরীফে ছিলেন। মওলানা মমলুক আলী সাহেব তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লীতে অবস্থান করতেন। মওলানা মমলুক আলীর পরে আমীর ইমদাদুল্লাহ বারো বছর পর্যন্ত দিল্লীতে থেকে এ আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তারপর তিনি মক্কা শরীফে চলে যান, সে ছিল ১৮৫৮ সন।

মওলানা ইমদাদুল্লাহ সাহেবের প্রতিনিধি ছিলেন মওলানা মুহম্মদ কাসেম সাহেব। তাঁর কার্যকাল ছিল ১৮৭৯ সন পর্যন্ত। তারপর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত

মওলানা রশীদ আহমদ গাংগোহী এবং তাঁর পরে শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান ১৯২০ সন পর্যন্ত এ আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত এসে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয়েছিল।

১৯২০ সনের কিছুকাল পূর্বে শায়খুল হিন্দ এ আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় সূচনা করেছিলেন।

বয়তুল হিকমত , উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

২৫ অক্টোবর–১৯৪১

আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ঃ হিজরী ১১৩১–১১৭৬

সুলতান মুহাম্মদ শাহ্ যে বছর সম্রাট আলমগীরের মস্‌নদে বসেছিলেন শাহ্ ওলালীউল্লাহ্ও ঠিক সে বছরই তাঁর পিতা দিল্লীর বিশিষ্ট সূফী এবং আলিম শাহ্ আবদুর রহীম বিন্ ওয়াজীহুদ্দীন সাহেবের মাদ্রাসায় তাঁরই স্থলবর্তীরূপে অধ্যাপনার কাজে বহাল হয়েছিলেন। এ ছিল ১৭১৯ খৃঃ মোতাবেক ১১৩১ হিজরী সনের ঘটনা।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১১১৪ হিজরীতে কোন এক বুধবার এবং ১১৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। সম্রাট আলমগীরের মৃত্যু তারিখ হলো ১১১৮ হিজরী ২৮শে যিল্‌কদ শুক্রবার। এ হিসাব অনুসারে সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর চার বছর পূর্বে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্ম হয়েছিল। তিনি ইন্তিকাল করেন দিল্লীর অন্ধ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের আমলে। এ হিসাবে শাহ্ সাহেব দিল্লীর দশজন সম্রাটের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাঁরা ছিলেন ঃ ১। সম্রাট আওরংগজিব, ২। প্রথম বাহাদুর শাহ্, ৩। ময়েনউদ্দীন জাহাঁদার শাহ্, ৪। ফররুখ সিয়ার, ৫। রফীউদ্ দারাজাত, ৬। রফিউদ্ দওলাহ্, ৭। মুহম্মদ শাহ্, ৮। মাহমুদ শাহ্, ৯। দ্বিতীয় আলমগীর এবং ১০। অন্ধ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম।

অন্ধ সম্রাট শাহ্ আলমের হাত থেকে লর্ড ক্লাইভ কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। এ ছিল শাহ্ সাহেবের ইন্তিকালের অনুমান দুই বছর পূর্বের ঘটনা।

উপরোক্ত সম্রাটগণের আমলে দিল্লীর মসনদ কি বিপর্যয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে চলেছিল তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানার কথা। সৈয়দ–ভ্রাতাদের উত্থান এবং তাঁদের হাতে একান্ত অসহায় ভাবে ফররুখ সিয়ারের কারাগারে

মৃত্যুবরণ, তারপর তুরানীদের হাতে সৈয়দ-ভ্রাতাদের পতন, মারাঠা বিদ্রোহ এবং তাদের উত্থান, শিখ বিদ্রোহ, নাদির শাহের অভিযান এবং দিল্লীতে ব্যাপক হত্যাকান্ড,পানিপথের যুদ্ধে আহমদ শাহ্ আবদালীর হাতে সত্যের বিজয়, উপমহাদেশের রাজনীতিতে রোহিলাদের অনুপ্রবেশ, ইরানী এবং তুরানী আমীর-উমারাদের (উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী) পারস্পরিক হানাহানি, উপমহাদেশের প্রতি ইউরোপীয় জাতিগুলির লোলুপ দৃষ্টি, তারপর ইংরেজ কর্তৃক বাংলা-বিহারের কর্তৃত্ব দখল এবং এগুলি ছাড়া অন্যান্য আরও বহু পরিবর্তন এবং বিপ্লব শাহ সাহেব নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

দিল্লীর মসনদ তখনকার দিনে যে উত্তাল তরংগের আঘাতে দোল খাচ্ছিল, শাহ সাহেব সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন। মক্কা শরীফ চলে যাওয়ার পর তিনি সেখানে বসে তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। শাহ সাহেবের এক পত্রে এ সম্পর্কে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন ঃ 'উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি বে-খবর নই, কারণ ওখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং লালিত-পালিত হয়েছি। আমি আরব দেশও দেখেছি এবং বিশ্বস্ত লোকের মারফতে খবরাখবর নিয়েছি।' সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া থেকে তিনি নির্বিকার থাকতে পারেন নি।

শাহ্ সাহেব তাঁর পাঠ্য জীবনের কথা প্রসংগে 'জুযবে লতীফ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ ''পাচ বছর বয়সে আমি মক্তবে ভর্তি হই। সাত বছরে পদার্পণ করলে মাননীয় পিতা আমাকে নামাযে দাঁড় করান এবং রোযা রাখার উপদেশ দেন। ঐ বছরই আমার খত্না পর্বও সমাধা হয়। আমার যতদূর মনে পড়ে ঐ বছরের শেষের দিকে আমি কুরআন শরীফ খতম করি। দশ বছর বয়সে আমি 'মোল্লা জামী' অধ্যয়ন করি এবং তারপর থেকে সাধারণভাবে যে কোন কিতাব পাঠ করার দক্ষতা আমার লাভ হয়েছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। অবশ্য আমার বুজুরগ্ পিতা এ বিষয়ে বড় তাড়াতাড়ি করেছিলেন। আমি শ্রদ্ধাস্পদ পিতার হাতে যখন বাইয়াত গ্রহণ করি, তখন থেকেই তাসাউফ সাধনায় প্রবৃত্ত হই। খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দের তরীকাই

আমার লক্ষ্য ছিল। তফসীর-ই-বাইযাভীর অংশ বিশেষ ঐ বছরই পাঠ করেছিলাম। সে বছর পিতা একটি বিরাট রকমের খানাপিনার আয়োজন করেছিলেন। সে উপলক্ষে অনেক বিশিষ্ট এবং সাধারণ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এ অনুষ্ঠানেই আমার সর্বপ্রথম অধ্যাপনার অভিষেক হয়েছিল। মোটকথা, পনরো বছর বয়সে তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলাম। আমার সতরো বছর বয়সকালে ওয়ালেদ সাহেব ইন্তিকাল করেন। তারপর থেকে ক্রমাগত বারো বছর ধরে ধর্ম এবং অন্যান্য শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকি এবং সে সব বিষয়ে যথাসাধ্য গবেষণায়ও লিপ্ত রয়েছি।'

শাহ্ সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পিতার মৃত্যুর পর থেকে বারো বছর কাল তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর ওয়ালেদ এবং তাঁর বন্ধুদের নিকট থেকে যে সব জ্ঞান এবং তত্ত্ব শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার মধ্যে কুরআনের তরজমা, ব্যবহারিক দর্শন এবং আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহ সাহেব তাঁর প্রণীত 'তাফহীমাতে এলাহিয়া'য় তাঁর সমকালীন তিনটি বিষয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। একটি হলো যুক্তি দর্শন, ব্যবহারিক দর্শন যার শাখা বিশেষ। শাহ্ সাহেব উল্লেখ করেন যে, এ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল এজন্য যে, তখন গ্রীক দর্শন শিক্ষা মুসলমানের রেওয়াজ হয়ে পড়েছিল। এ শাস্ত্রের প্রবণতা বিতর্কমূলক বিষয়ের প্রতি।

দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক বা তত্ত্ব দর্শন। সে যুগে দেশের সকল শ্রেণীর লোক সূফীদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল ছিল। 'কিতাব' এবং সুন্নাহ্র তুলনায় সূফীদের উক্তি এবং আদর্শ সাধারণ লোকের অধিক মনঃপূত ছিল। এমন কি, জনসাধারণ সূফীদের অনুমোদন ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ করতে রাজি হতো না। সুতরাং যিনি সূফী মতবাদ মেনে নিতে অস্বীকার করতেন অথবা উপেক্ষা করে চল্‌তে চাইতেন তাঁর কথার প্রতি আদৌ কোন গুরুত্ব দেওয়া হতো না এবং তিনি ধার্মিক ব্যক্তিরূপেও পরিগণিত হতেন ন। শাহ্ সাহেব উল্লেখ করেন যে, এ সব কারণেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চা তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা একটি প্রয়োজনীয় অংগ বলে বিবেচিত হতো।

শিক্ষার তৃতীয় বিষয় ছিল শ্রুতবিদ্যা অর্থাৎ হযরত রসূলে করীম (সা)–এর মারফতে যে জ্ঞান লাভ হয়েছিল। বলাই বাহুল্য এর মধ্যে কুরআনই ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শাহ্ সাহেব উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সে কালের শিক্ষিত ব্যক্তিরা আত্মকেন্দ্রিকতার ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, যে–কোন জটিল বা দুর্বোধ্য সমস্যা সমাধানের জন্য কেউ কারুর সাথে আলাপ–আলোচনার প্রয়োজন স্বীকার করতো না। ছোটবড় সবাই নিজ নিজ ধারণা মতো শরীয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করে নিত এবং নিজেদের যুক্তি ও জ্ঞানই চূড়ান্ত বলে মনে করতো।

শাহ সাহেব উল্লেখ করেন যে, সমকালীন আইন শাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ চলতো। বিশেষ করে হানাফী এবং শাফেয়ী মাজহাবের আইন শাস্ত্রবিদগণ নিজ নিজ ওস্তাদের পক্ষ সমর্থন করতেন। ফলে প্রতিটি আইন শাস্ত্রজ্ঞ সম্প্রদায়ের আইন–কানুন, মাস'আলা এত বৃদ্ধি পেতে লাগলো যে, তার মধ্য থেকে আসল সত্য খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য ও দুষ্কর হয়ে পড়েছিল।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে শাহ সাহেবকে স্বাভাবিকভাবেই উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে হয়। সংস্কার দ্বারা সত্যোদ্ধারকে তাঁর বিপ্লব–আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

কুরআন পাকের তরজমা প্রসংগে শাহ সাহেব মন্তব্য করেন যে, আমার সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য, আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার কুরআন–অধ্যয়ন শ্রেণীতে একাধিকবার শামিল হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কুরআনের অতি নিপুণ এবং গভীর ব্যাখ্যা তিনি দিতেন। আয়াতগুলির 'শানে নযূল' ব্যাখ্যা করতেন এবং ব্যাখ্যা–সাপেক্ষ বিষয়গুলির আলোচনার সময় তফসীরের সাহায্য নিতেন। এর ফলে আমার সম্মুখে সফলতার দ্বার উম্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

আমার পিতার নিয়ম ছিল এই যে, তিনি তাঁর শ্রেণীতে প্রত্যহ কুরআনের তিন রুকূর কিছু কম পড়াতেন এবং তার অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ দিতেন।

শাহ সাহেব হজ্জ থেকে ফিরে আসার পাঁচ বছর পরে কুরআন শরীফের ফারসী তরজমা করেছিলেন[১] এবং এগারো বছর পরে তিনি সর্বপ্রথম তা প্রচার করেছিলেন।

হিকমতে আমলী

হিকমতে আমলী অর্থে সাধারণ ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বা ব্যবহারিক বিধান বুঝায়। 'কুরআনের ব্যবহারিক জ্ঞান' হচ্ছে শাহ সাহেবের নিজস্ব একটি পরিভাষা। শাহ সাহেবের বহু পূর্বেই সম্রাট আকবরের আমল থেকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম সমাজের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আবুল ফজল আকবরী শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদ তৈরী করেছিলেন এ ব্যবহারিক মূল্যবোধের উপরে। তখন থেকে মুহম্মদ শাহের আমল পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ভিত্তি ছিল এই। শাহ সাহেব এই ব্যবহারিক মূল্যবোধকে করেছেন কুরআনের পরিচয় লাভের মাধ্যম এবং সে উদ্দেশ্যে তৎকালীন মূল্যবোধকে কুরআনের ব্যবহারিক নীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে চেয়েছেন। এভাবে তিনি কুরআনের ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি মুসলমানদের সম্মুখে পেশ করেছেন। দীর্ঘ বারো বছর যাবত শাহ সাহেব তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সে দিনের দিল্লী যদিও একদিক থেকে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছিল, তবু তার অতীত গৌরবের ছিটেফোঁটা নিদর্শন হিসাবে, বিশিষ্ট আমীর-উমারা শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিচক্ষণ চিন্তাশীল এবং রাজনীতিজ্ঞ ও পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা আসফ জাহ[২] এবং সূফী শ্রেণীর মধ্যে মিরযা মুহম্মদ মাযহার জানেজা'নাঁ[৩] বেঁচেছিলেন। রাজধানীতে গ্রন্থাগার এবং পন্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন। মোটকথা, সে যুগেও দিলীতে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য যথেষ্ট উপকরণ বিদ্যমান ছিল।

---

১. মিরযা হায়রত দেহলবী লিখেছেন যে, শাহ সাহেব কর্তৃক কুরআন শরীফ ফারসীতে অনূদিত হওয়ার ফলে দিল্লীতে এমন আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলে তাঁকে বাধ্য হয়ে হজে যেতে হয়েছিল। মিরযার এ উক্তি যথার্থ নয়।

২. বিস্তারিত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৩. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শাহ সাহেব দীর্ঘ বারো বছর অধ্যাপনা এবং গবেষণার পরে সংস্কার আন্দোলনের জন্য দু'টি মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন।

প্রথমত মানুষের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগিই আসলে কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রমাণ। তিনি কুরআনের এ ব্যবহারিক মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠাকে তাঁর শিক্ষা-সংস্কারের বুনিয়াদরূপে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাবকে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং জাতীয় জীবনে নৈতিক ও ব্যবহারিক বিকৃত, বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলার কারণ বলে নির্দেশ করেছিলেন। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সবার দৃষ্টিভংগি এক নয়। পবিত্র কুরআনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বহুকালের স্বীকৃত সত্য হলেও দর্শন-ঘেঁষা আলিমগণ এ ব্যাপারে তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এ সম্পর্কে তাঁদের বিরোধীদলের পক্ষ থেকে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। দর্শন-ঘেঁষা আলিমদের মতের ব্যাখ্যা যদি এভাবে করা যায় যে, অনারব জাতিসমূহ, যারা কুরআনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি অনুধাবন করতে সক্ষম নয় তাদের জন্য কুরআনের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য একমাত্র মানরূপে স্বীকৃত হতে পারে না। সুতরাং তাঁদেরকে কুরআনের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে হয়েছে। কারণ, এভাবেই সমস্যাটার একটা সহজতর সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

মুতাজিলাপন্থী আলিম আবদুর রহীম খাইয়াত তাঁর 'আল ইন্‌তিশার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইব্‌রাহীম বিন্ সাইয়্যারের মত ছিল এই যে, বাচনভংগীর দিক থেকে কুরআন অসাধারণ নয়, এ ধরনের রচনাশৈলী লোকের সাধ্যায়ত্ত। আবুল আলা মু আরবী তো এ সম্পর্কে একখানা পুস্তকই রচনা করেছিলেন। সে পুস্তকের নাম 'আস্‌সুরফাহ' অর্থাৎ তিনি মন্তব্য করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের প্রেরণাকে কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রুদ্ধ করে দিয়েছেন। নতুবা মানুষের পক্ষে এ ধরনের ভাষা সৃষ্টি কিছু অসম্ভব ছিল না।

যা হোক, শাহ সাহেব কুরআনের জীবন-দর্শনকেই প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করেছেন। এর ফলে, বাস্তব জীবনে কুরআনের কার্যকারিতাই তাঁর নিকট মোজেযা বা অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। আরব-অনারব, সাধারণ,

শিক্ষিত, দার্শনিক কিংবা সহজ বুদ্ধির মানুষ, যে কেউ হোক না কেন, কুরআনের জীবন–দর্শন সবার কাছেই বোধগম্য হতে পারে এবং সবাই এর উপযোগিতা মেনে নিতে পারে। এবং এদিক দিয়ে কুরআনের অলৌকিকত্বও অনুধাবন করতে পারে। কুরআনের অলৌকিকত্ব যদি একমাত্র তার ভাষাগত অলংকারেই সীমাবদ্ধ হয়, সেক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সবাই কুরআনের অলৌকিক মাধুর্য থেকে বঞ্চিত থাকতো। কুরআনের এ ব্যবহারিক দিক ছাড়া অর্থনৈতিক সমতাকেও শাহ সাহেব তাঁর সংস্কারসূচীর শামিল করেছিলেন। সাধারণভাবে নৈতিক জীবনবোধই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। যদিও জৈব পর্যায়ে মানুষের জীবিকার প্রয়োজন অনিবার্যভাবে স্বীকৃত, কিন্তু মানব জীবনের সাথে জীবিকার সেই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতি কেউ লক্ষ্য করেন নি। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের রাষ্ট্রনীতি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। বিদ্বান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ দেশের সাধারণ রাজনীতি থেকে পৃথক থাকাটাকেই নিজেদের কৃতিত্ব বলে ধারণা পোষণ করেন। তাসাউফ শাস্ত্রে পুস্তকগুলির ব্যর্থতা এখানেই। কারণ গ্রন্থকারগণ মানুষের নৈতিক জীবনের সাথে অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং একটির উপর অন্যটির প্রভাব–প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব মোটেই উপলব্ধি করেন নি। পক্ষান্তরে শাহ সাহেবের দৃষ্টিভংগি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি জীবনের এ ধ্রুব সত্যকে বাস্তব দৃষ্টিতেই দেখেছেন এবং তাঁর গ্রন্থে সে দিকে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রসংগত, তিনি তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগায়' উল্লেখ করেছেন যে, যদি কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যতার বিকাশধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে তাদের শিল্পকলা পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তারপর শাসকগোষ্ঠী যদি ভোগ–বিলাস,আরাম–আয়শ্ এবং ঐশ্বর্যের মোহে আচ্ছন্ন জীবনকেই বেছে নেয়, তাহলে সেই আয়েশী জীবনের বোঝা মজদুর শ্রেণীর উপরই চাপায়; ফলে সমাজের অধিকাংশই মানবেতর পশুর জীবনযাপনে বাধ্য হয়। গোটা সমাজ–জীবনের নৈতিক কাঠামো তখনই বিপর্যস্ত হয়, যখন তাকে বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে জীবনযাপনে বাধ্য করা হয়। তখন লোককে রুযী–রুটির জন্য ঠিক পশুর মতই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। মানবতার এ

চরম নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগের মুহূর্তে, এ অভিশাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নিশ্চয়ই কোন পথের নির্দেশ এসে থাকে। অর্থাৎ স্রষ্টা নিজেই বিপ্লবের আয়োজন করেন। জনগণের বুকের উপর থেকে বেআইনী শাসকচক্রের জগদ্দল পাথর অপসারিত করার ব্যবস্থা তিনি করেন। রোমান এবং পারসিক শাসকগোষ্ঠীও সে জুলুমবাজির পথে এগিয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ তাদের ঐশ্বর্য ও বিলাসের যোগান দিতে গিয়ে জনসাধারণকে পশুর স্তরে নেমে আসতে হয়েছিল। এ জুলুমশাহীর প্রতিকারের জন্যই আরবের জনগণের মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সা)--কে অবতীর্ণ করা হয়েছিল। মিসরে ফিরাউন বা ফারাওদের ধ্বংস এবং রোম ও ইরান সম্রাটের পতন এ নীতি অনুসারে নবুয়তির আনুষংগিক কর্তব্যরূপে তামিল হয়েছে।

শাহ সাহেব দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেছেন যে, দিল্লীর সম্রাট এবং আমীর–উমারার অবস্থাও প্রায় পারস্য ও রোম সম্রাটদের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যত্র তিনি সুদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, ইসলাম সুদকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করেছে। তিনি বলেন যে, ধন–স্ফীতি থেকে সমাজকে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক।

মোটকথা, সমাজ–জীবনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিধান একান্ত জরুরী। প্রত্যেকটি মানবগোষ্ঠীর জন্য এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে যাতে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত প্রয়োজন মিটে যায়। জীবিকা সংস্থানের দুশ্চিন্তা থেকে অবকাশ লাভের পরেই শুধু মানুষ নীতি, আদর্শ প্রভৃতি জীবনের অন্যান্য দিকের উন্নতির প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। আসলে এ সবই হচ্ছে মানবতার মূল সম্পদ। কিন্তু মানুষ যদি বেঁচে থাকার জন্য ভাত–কাপড়ের ব্যবস্থাই করতে না পারে––মানুষের জীবনযাত্রার সামনে যদি পশুর জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়, তাহলে মানব জীবনের মহত্তর লক্ষ্যের কথা ভাববার মতো জ্ঞান কেমন করে এবং কখন আসবে? কাজেই মানব সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুশৃংখল ও সুষম হলেই শুধু নৈতিক আদর্শ পূর্ণতা লাভ করবে। ইহলোকে মানসিক সংযম সাধনার মাধ্যমে নৈতিক জীবনকে সুস্থ ও পূর্ণ করতে পারলে পারলৌকিক জীবনেও কবর এবং হাশরের সংকট–সমস্যাগুলি সহজ হয়ে যায়। চরিত্রে এ

পূর্ণতাই তাকে বেহেশ্‌তের অধিকারী করে। পরিপূর্ণ বিকাশের শেষ স্তরে মানুষ তার প্রতিপালকের দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। গোটা মানব সমাজকে উন্নতি ও বিকাশের এ পথে পরিচালনই যদি নবুয়তের আসল লক্ষ্য বলে স্থির করা যায় তাহলে নবুয়ত মানব জাতির জন্য একটি স্বাভাবিক প্রয়োজনরূপে গণ্য হয়।[৪] আর নবী যখন না থাকেন, তখন নবীদের শিক্ষার আদর্শে সত্য-সন্ধ ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ সে কাজ সম্পন্ন করেন।এ রূপে গোটা মানব সমাজের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। শাহ্ সাহেবের নিকট এই হচ্ছে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের ব্যাখ্যা।

কুরআনের ব্যবহারিক মূল্য প্রদর্শন এবং অর্থনৈতিক সমতা বিধান এ দুটিই ছিল শাহ সাহেবের প্রস্তাবিত সংস্কারমূলক কর্মসূচীর মূল বুনিয়াদ। মোটামুটিভাবে তার ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া হয়েছে।

পিতার মৃত্যুর পর শাহ সাহেব সুদীর্ঘ এক যুগ ধরে এসব বিষয়ে গবেষণা করেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি উক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচীর আকারে সমাজের চিন্তাশীল এবং সুধীবৃন্দের সম্মুখে নিজের বক্তব্য পেশ করা। এব্যাপারে হাদীস শাস্ত্রে গবেষণারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার উপকরণ দিল্লীতে মওজুদ ছিল না। সে কারণেই তাঁকে হেজায সফর করতে হয়। সেখানে কামেল ওস্তাদগণের সাহচর্যে এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সম্বলিত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করে, দু'বছর কাল মধ্যে তিনি হাদীস এবং ফেকাহ শাস্ত্রে মুজতাহিদসুলভ[৫] জ্ঞান অর্জন করেন। সংস্কারমূলক কার্যে আহবানের প্রস্তুতি হিসাবে এ শিক্ষা তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ছিল।

মক্কা-মদীনা সফরের উল্লেখ প্রসংগে শাহ সাহেব বলেন, 'দীর্ঘ বারো বছর এভাবে অতীত হওয়ার পর মক্কা-মদীনা সফরের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়; সুতরাং ১১৪৩ হিজরীতে আমি মক্কা শরীফ চলে যাই। ১১৪৪ সন মক্কা এবং মদীনায়ই অবস্থান করি। মক্কায় শায়খ আবু তাহির এবং অন্যান্যা আলিমের

---

৪. মানুষের গোটা জীবন ব্যবস্থার সংস্কারই হচ্ছে নবুয়তের অন্যতম লক্ষ্য। ইবনে খালদুনের মতে নবুয়ত কেবল পরকালের পথপ্রদর্শনের জন্যই প্রয়োজন, এ ধারণা ভুল।

৫. পরিশিষ্ট নং ৩ দ্রষ্টব্য।

কাছে হাদীস অধ্যয়ন করি। এ সময়ে মদীনা শরীফ সফরেও যাই এবং সেখানে রসূলুল্লাহ্ (সা)–র রওযার সান্নিধ্যে এসে অফুরন্ত প্রেরণা লাভ করি। হেজায সফরকালে সেখানকার অধিবাসিদের সংগে আমার গভীর অন্তরংগতা সৃষ্টি হয়। শায়খ আবূ তাহির আমাকে তরীকতের খির্কা দান করেছিলেন। এ খির্কা ছিল তাসাউফের সবগুলি তরীকার সনদ স্বরূপ। এ সনেরই শেষের দিকে দ্বিতীয়বার হজ্জ সমাধা করে ১১৪৫ হিজরীতে দেশে ফিরে আসি।[৬]

সংস্কার আন্দোলনের জন্য ফেকাহ এবং হাদীসে স্বাধীন ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করা আবশ্যক।

মক্কা–মদীনা অবস্থানকালে শাহ সাহেব ইজতিহাদের উপযোগী পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। সে সংগে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকেও প্রেরণা লাভ করেছিলেন। এরূপে তিনি দর্শন, রাজনীতি এবং সমাজ–বিজ্ঞান সম্পর্কে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, 'ফুয়ুযুল হারামাইন' গ্রন্থে তিনি তার উল্লেখ করেছেন।

দীর্ঘকাল অধ্যয়ন, গবেষণা এবং বিশেষ করে মক্কা–মদীনা সফরের ফলে লব্ধ প্রেরণাই তাঁকে ইন্‌কেলাবী আন্দোলন শুরু করার জন্য সজাগ করেছিল। এ বিষয়ে তিনি স্বপ্নযোগেও বহু কিছু জ্ঞাত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১১৪৪ হিজরীতে (১৭৩১ খৃঃ) এক জুমার রাতে তিনি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন[৭] দেখেন। সে স্বপ্নের অন্তর্নিহিত নির্দেশের তিনি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

১. তাঁর হাতে তৎকালীন রাজনৈতিক বিশৃংখলার অবসান ঘটবে এবং তিনিই সে দায়িত্ব বহন করবেন। অন্য কথায় তাঁর পরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলন দ্বারা একটি স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা লাভ হবে।[৮]

---

৬. জুযবে লতীফ (২)

৭. ৪ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৮. ফেকাহের স্বাধীন মুজতাহিদগণের আদর্শের ভিত্তিতে যাঁরা ইজতিহাদ করেন, তাঁরা অধীন মুজতাহিদ হয়ে থাকেন। এমন কি কোন শাহী খান্দানের অন্তর্ভুক্ত থেকে যাঁরা মসনদ অর্জন করেন, তাঁরা উত্তরাধিকারী বলে আখ্যাত হন। এর বিপরীত আদর্শের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয়, তাকে স্বাধীন সরকারই বলা সমীচীন। শাহ সাহেব যে দর্শনের ভিত্তিতে সরকারের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা ছিল স্বাধীন এবং তা একমাত্র খুলাফায়ে রাশেদীনের উত্তরাধিকারীই হতে পারে।

২. বর্তমান সরকারের পরিবর্তে একটি নতুন সরকার গঠিত হবে, তিনিই হবেন তার উপলক্ষ এবং উপমহাদেশে ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং জাতীয় আন্দোলনের তিনিই নেতা[৯] হবেন।

৩. তিনি স্বপ্নযোগে এও জ্ঞাত হন যে, বিপ্লবী আন্দোলন দীর্ঘ কালব্যাপী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবে।

মোটকথা, এ সব স্বপ্নের মোটামুটি তাৎপর্য তিনি এরূপ ধরে নিয়েছিলেন যে, তিনি এ উপমহাদেশে একটি গণ–বিপ্লব শুরু করবেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে, তিনি মক্কা–মদীনা থেকে সংস্কার–বিপ্লব শুরু করার দৃঢ় ধারণা নিয়েই দেশে ফিরেছিলেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মতালিকা অনুসারে সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল ফার্সী ভাষায় কুরআন শরীফের পূর্ণাংগ তরজমা করা।

এ তরজমার নাম 'ফতহুর রহমান'।[১০] এতে তিনি তাঁর কর্মতালিকার উল্লেখ করেছেন। ১১৫৬ হিজরী, মোতাবেক ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ থেকে যে তরজমা তিনি পাঠ্য তালিকাভুক্ত করেছিলেন, তার টীকায় তিনি তা সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতিগুলি আলোচনা করেছেন।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, যে বিষয়ের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, তা হলো, তাঁর মতে ইসলামী হুকুমতের বুনিয়াদ সর্বপ্রথম মক্কায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা ছিল স্বাধীন এবং অনন্য। প্রথমাবস্থায় বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধের নির্দেশ না পাওয়া গেলেও কুরআনের সূরা 'রাদের' নিম্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আরব ভূমিতে দারুল হরবের সীমা সংকুচিত হচ্ছিল এবং ইসলাম দিন দিন প্রভাব বিস্তার করেছিল।

او لم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها ـ و الله یحکم لا معقب لحکمه ـ و هو سریع الحساب ـ

---

৯. ৪ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
১০. ৫ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ তারা কি দেখতে পায় না যে, আমরা চতুর্দিক থেকে তাদের রাজ্য সংকুচিত করে এনেছি--হুকুম একমাত্র আল্লাহ্‌রই--কেউ তাঁর হিসাব গ্রহণকারী নাই--তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

উপমহাদেশে কুরআন শরীফের সর্বপ্রথম ফারসী তরজমা করেন মালিকুল্‌উলামা শেহাবুদ্দীন হিন্‌দী দৌলতাবাদী (৮৪৯ হিঃ মৃত্যু)। তিনি 'বাহরে মাওয়াজ' নামে তাফসীর সংকলন করেন। আরজাদুল উলুম ৮৯৩ পৃষ্ঠায় তাঁর সম্পর্কে লিখিত আছে। 'বাহরে মাওয়াজে' তাফসীর প্রসংগে প্রত্যেকটি বিষয়ে পৃথক পৃথক শিরোনামায় বিশ্লেষণ করেছেন; অর্থাৎ প্রথমে শিরোনামার নিচে আয়াত, তারপর তরজমা শিরোনামা, তার নিচে ফারসী তরজমা, তারপর পঠন, শানে নযূল। এভাবে প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক শিরোনামা দিয়ে সংকলন করেছেন। সুতরাং এ তফসীরের বৈশিষ্ট্য এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা রয়েছে। তফসীরখানা মুদ্রিত হয়েছে। মালিকুল উলামা কর্তৃক 'কাফিয়ার' টীকা এবং মীর সৈয়দ শরাব কৃত ফারসী তরজমা দেখে মওলানা জামী প্রেরণা লাভ করেন এবং শর্‌হে মুল্লা জামী নামক কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। মালিকুল উলামা কর্তৃক লিখিত 'কাফিয়া' গ্রন্থের মনোরম হরফে লিখিত পাড়ুলিপি পাঞ্জাব ইউনিভারসিটির লাইব্রেরীতে মওজুদ আছে। যা-ই হোক, তিনি কুরআন শরীফের সর্বপ্রথম ফারসী তরজমা করেছিলেন। কুরআনের আলংকারিক বৈশিষ্ট্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। দ্বিতীয় তরজমা ছিল, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ দেহলবীর। কুরআনের জীবনদর্শনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শাহ সাহেব বলেন যে, যদিও অনেকে এ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন, তবু তদ্দবারা এর তাৎপর্য লাঘব হয় না। দারুল হর্‌ব সংকুচিত হওয়ার অর্থ এই যে, আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তখন ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। আসলাম, গেফার, জোহাইনা, মযীনা। এছাড়া ইয়েমনের কোন কোন গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। হিজরতের পূর্বেই এ সব ঘটনা ঘটেছিল।

মোটকথা, শাহ সাহেবের মতে মক্কায়ই ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যদিও তা শান্তিপূর্ণ নীতির ভিত্তিতে প্রচলিত ছিল।

শাহ সাহেব সংস্কার–বিপ্লব আরম্ভ করেছিলেন মক্কায় ইসলামী আন্দোলনের আদর্শকে সামনে রেখেই। তিনি তাসাউফের বাইয়াতকে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অন্য কথায় তাসাউফের বাইয়াত গ্রহণের অর্থ তাঁর নিকট ছিল রাজনৈতিক মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ। এ কারণেই রাজনীতিতে তাসাউফ দর্শনকে তিনি এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কথা হলো এই যে, প্রকৃত যোগ্যতার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র অস্ত্রের সাহায্যে কেউ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। অস্ত্র বলে হয়তো হুকুমত উচ্ছেদ করা যেতে পারে; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত নতুন সরকার টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। শান্তি এবং নিরুপদ্রবতার মধ্যেই কেবল এ ধরনের লোকবল গঠন করা সহজ হতে পারে। আন্দোলনের কর্মসূচী পেশ, তা লোককে বুঝান এবং তাদের মত গঠন করার জন্য শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীর আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন হয়। শাহ সাহেব তাঁর আন্দোলন শুরু করার সময়ে এ নীতিই অনুসরণ করেছিলেন এবং তাতে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তারপর তাঁর স্থলাভিষিক্ত মওলানা আবদুল আযীয পরিকল্পিত হুকুমত পরিচালনার জন্য লোক সংগঠন করেছিলেন।

শাহ সাহেবের এ সংস্কার আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবন করার মতো হুঁশিয়ার লোক তখন ছিল। তারা এ নতুন আন্দোলনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিল এবং শোরগোল শুরু করেছিল। এ শ্রেণীর লোকেরা শাহ্ সহেবের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করেছিল। এমন কি একদিন ফতেহপুর মসজিদ থেকে বের হবার সময় শাহ সাহেব তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন।[১১]

---

১১. শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি––যিনি দীর্ঘ এগারো বছর কাল সাধনার পরে কুরআন শরীফের ফারসী তরজমা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তফসীরের কথা যখন প্রকাশিত হলো, তখন দেশে বিপুল বিরুদ্ধতা দেখা দিল। গোঁড়া আলিমগণ মনে করেছিলেন যে, তাঁদের রুযি–রুটির ইমারত বুঝি বা চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে গেল। জনসাধারণকে অতপর আয়ত্তে রাখা সম্ভব হবে না; তারা কথায় কথায় প্রতিবাদ করবে। সুতরাং তারা শাহ সাহেবের প্রতি কুফরী ফতোয়া দেওয়া ছাড়াও তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের প্ররোচনায় কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী তাঁর প্রতি হামলার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এ সব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শাহ সাহেবের মনে কখনো কোন সন্দেহ পর্যন্ত উদয় হয়নি। একদিন তিনি ফতেহপুর মসজিদে আসরের নামায

শাহ সাহেব তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বহু সংখ্যক গ্রন্থের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে সব তখন দিল্লীতে সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম ফারসী ভাষায়ই লিখিত হয়েছিল। এ সব গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতিগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। আন্দোলনের গোটা আদর্শ কোথাও এক পুস্তকে আলোচনা করেন নি, বরং বিভিন্ন পুস্তকে বিক্ষিপ্তভাবে তা ছড়িয়ে রেখেছিলেন। ভ্রান্ত ধারণার ফলে অযোগ্য লোকেরা যাতে এর কদর্থ বিস্তার না করতে পারে, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

পড়ছিলেন। নামায শেষ করে সালাম ফিরাবার সাথে সাথেই মসজিদের দরজায় শোরগোল শুনতে পেলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী শাহ সাহেবকে আক্রমণ করার উদ্যোগ করছে। শাহ সাহেবের সাথে ছিল অল্প কয়েকজন অনুচর। আক্রমণকারীরা ছিল সংখ্যায় অনেক। শাহ সাহেব খারীবাউলী দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে দরজাও তারা ঘিরে ফেলেছিল। শাহ সাহেবের হাতে ছিল একখানা মাত্র ছড়ি। অগত্যা তিনি আক্রমণোদ্যত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা তাঁকে কেন হত্যা করতে চায়? তারা বললো––আপনি কুরআন শরীফের তরজমা করে জনসাধারণের কাছে আমাদের মর্যাদাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। এটা চললে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কোন মূল্যই থাকবে না। আপনি শুধু আমাদের মর্যাদার হানি করেন নি, বরং আমাদের পরবর্তী বংশধরদেরও সর্বনাশ করেছেন। শাহ সাহেব উত্তরে বললেন––আল্লাহ্র সার্বজনীন রহমতের দান কতিপয় লোকের জন্য এবং তাদের বংশাবলীর জন্য কি করে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে? কিছু সময় এভাবে বাদ–প্রতিবাদ চললো। ইত্যবসরে শাহ সাহেবের সংগিগণ তলোয়ার শানিত করে নিলেন। তলোয়ার দেখে আলিমগণ কর্তৃক আমদানীকৃত দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে গেল। শাহ সাহেব নিরাপদে গৃহে ফিরে এলেন। (হায়াতে ওয়ালী––৩২১ পৃঃ)

প্রকাশ থাকে যে, হায়াতে ওয়ালী'র লেখক এই বর্ণনা মিরযা হায়রাত দেহলবী থেকে গ্রহণ করেছেন। আসল ব্যাপার সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তা এই যে, জনসাধারণ কুরআনের তফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হোক্, শিয়া মতাবলম্বী শাসনকর্তারা তা চাইতেন না। 'আমীরুর রওয়ায়াত' গ্রন্থে আছে যে, দিল্লীতে তখন নজফ আলী খাঁর কর্তৃত্ব ছিলো। সে শাহ সাহেবের হাতের কব্জি অকর্মণ্য করে দিয়েছিলো, যাতে তিনি কোন পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখতে না পারেন। নজফ আলী খান মিরযা মাযহার জানে জানাঁকেও হত্যা করিয়েছিলেন এবং শাহ্ আবদুল আযীয ও শাহ্ রফীউদ্দীনকে তার এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল।

শাহ্ সাহেব কর্তৃক পরিকল্পিত আন্দোলনের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে হলে 'উম্মতে মোহাম্মদীয়ার' ভিতরে শাহ্ সাহেবের প্রকৃত স্থান কি ছিল, সে বিষয়টি মনে রেখেই বিচার করতে হবে। তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা এবং বিপুল প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তি। নবুয়তের আদর্শে তাঁর আহবান ছিল বিশ্ব মানবের প্রতি, প্রকাশ্যত যদিও তাঁর আহবান নিজ জাতির প্রতিই সীমাবদ্ধ বলে বনে হয়।

যদিও তাঁর গ্রন্থগুলি দিল্লীর তৎকালীন রাষ্টভাষায়ই রচিত হয়েছিল এবং তাতে একদিকে যেমন দিল্লীর অভিজাত মধ্যবিত্ত, ইহুদী, খৃস্টান, আরব ও আজমের প্রতিও সমভাবেই লক্ষ্য করা হয়েছিল, অন্যদিকে গ্রীক, ইরান এবং ভারতের আর্য সমাজের প্রতিও সমভাবেই লক্ষ্য করা হয়েছিল।

প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, শাহ্ সাহেব গোটা মানব সমাজকেই তাঁর সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর প্রণীত 'বদূরে বাযেগা' নামক গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'আমি ইরতেফাকাত বা সমাজ–ব্যবস্থার আদর্শ এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করেছি। এ আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি সেখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য সাধারণভাবে এক একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, সেখানে দৃষ্টান্তকে যেন বাস্তব মনে করা না হয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার উদ্দেশ্য অনুরূপ বা তার কাছাকাছি অন্য কোন কিছুও বুঝানো হতে পারে। আমার মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজ–ব্যবস্থার যে নীতি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি সবাই যাতে তার আওতায় আসতে পারে। এ কথা সত্য যে, সব জাতি এবং সব দেশের সমাজ–ব্যবস্থা এক হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেক জাতিরই আলাদা সমাজ–ব্যবস্থা এবং আলাদা সংস্কৃতি রয়েছে। সবাই মোটামুটি একটা সাধারণ সত্য মেনে নিক–প্রয়োজন এতটুকু। বাহ্যিক আচার–অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা থাকতে পারে। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সমাজ–ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য। এ হচ্ছে মানব জীবনের প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ হলো পরীক্ষা–নিরীক্ষা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান। এর মাধ্যমে তার সত্যিকার চরিত্র বিকাশ ঘটে।'

শাহ্ সাহেব তাঁর 'বদূরে বাযেগার' তৃতীয় উক্তিতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'জানা আবশ্যক

যে, সমাজ–ব্যবস্থার উপর সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে এবং দয়া, মায়া, ইবাদত, বন্দেগী এবং সজ্জীবন যাপন প্রভৃতি ধর্মীয় অনুভূতি মানব প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই বিরাজমান রয়েছে। এগুলি বিভিন্নরূপে আমরা দেখতে পাই। তা সত্ত্বেও এগুলি মৌলিকভাবে অভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বিবাহের কথা ধরা যাক। যেমন, বিবাহের বেলা যারা শুধু ঢোল–বাদ্য এবং গান–বাজনার উপর নির্ভর করেছে তারাও এক হিসাবে কর্তব্য পালন করেছে, আর যারা ইজাব–কবূলকে অপরিহার্য বলে মনে করেছে তারাও বিবাহের দায়িত্ব পালন করেছে। কেননা, বিবাহের আসল উদ্দেশ্য হলো কোন নারীকে কোন পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যাতে অন্য পুরুষ সেখানে প্রবেশ করতে না পায়। উপরোক্ত উভয় পন্থার মূল লক্ষ্যও তাই। আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য মানুষ তার মানবীয় সত্তা বর্জন করে আল্লাহ্‌র সত্তাতে নিজকে বিলীন করে দেয়। আবার দেহের পরিচর্যার সাথেও আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের পথ রয়েছে। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখেই সমাজ–ব্যবস্থা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের অন্যান্য প্রধান বিষয়ের স্বরূপ বিভিন্ন হতে পারে বলে উলেখ করেছি।'

'মিল্লাতে হানীফ' বা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি সমাজ–ব্যবস্থা এবং ধর্ম–ব্যবস্থার অনেকগুলি উদাহরণ উল্লেখ করেছি। সে উদাহরণগুলিকেই যথার্থ বলে ভ্রান্ত ধারণার যেন সৃষ্টি না হয়। উদাহরণগুলি শুধু উদাহরণ হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সমাজ–ব্যবস্থা এবং ধর্ম ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিই সে ব্যাপারে সব নয়। এ বিষয়ে আসল কথা হচ্ছে এই যে, কোন মজহাবী সম্প্রদায়ই মূল সত্যকে অস্বীকার করে না। হ্যাঁ, এ কথা অবশ্য ঠিক যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিধানগুলি মেনে নেয় না। মৌলিক প্রশ্নে কোন বিরোধ নেই, বিরোধ হচ্ছে এই নিয়ে যে, একই সত্যকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক এক সম্প্রদায় পেশ করেছে।

উপরোক্ত উক্তিসমূহ দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, শাহ্ সাহেবের গ্রন্থাবলীতে যে সব মূল নীতি আলোচিত হয়েছে, সেগুলিই হচ্ছে তাঁর দর্শনের ভিত্তি এবং তাঁর আহবান ছিল সার্বজনীন মানবতার প্রতি। এ প্রসংগে তিনি শরীয়তের যে সব সমস্যা সমাধানের (মাস'আলা) উল্লেখ করেছেন, সেগুলি তাঁর

মূলনীতি উপলব্ধির জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে তাঁর সাধারণ নীতি সীমাবদ্ধ মনে করা যায় না। শাহ্ সাহেব কর্তৃক বর্ণিত সাধারণ নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল নিরপেক্ষ জাতির জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন। আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের এই সূত্র মহাগ্রন্থ কুরআনে যথার্থ রূপ পেয়েছে।

মওলানা মুহম্মদ ইসমাঈল শহীদ প্রণীত 'আল্–আবকাত' থেকে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে বিষয়টি সাধারণের কাছে অধিকতর স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। তিনি আল্লাহ্র দেওয়া কামালিয়তের আলোচনায় 'সিদ্দীক' এবং 'হাকীম' সম্পর্কে লিখেছেন, 'এ শ্রেণীর লোককে যদি তওরাত অনুসারীদের বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে তাঁরা ঠিক তওরাত অনুযায়ীই বিচার করতে সক্ষম। আবার ইঞ্জিল বা কুরআনের অনুসারীদের জন্য বিচারক পদে নিযুক্ত করলে তাঁরা ইঞ্জিল ও কুরআন অনুযায়ী ফয়সালা করতে পারবেন। মোট কথা, যে–কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রজ্ঞাশীল কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা খৃষ্টান পাদ্রী, গ্রীক দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, অগ্নি–উপাসক ইরানী অথবা ভারতীয় যোগী–সন্ন্যাসী হতে পারেন। এটা তাঁদের বাহ্যিক পরিচয় মাত্র। এঁদের মধ্যে অদৃশ্য শক্তির সংগে সম্পর্ক বিশিষ্ট লোক থাকেন। এঁদের সংগে হাজীরাতুল কুদ্সের নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী যোগাযোগ থাকে। তাঁদের ধর্মানুভূতির উৎস সেখান থেকেই প্রবাহিত হয়। সে সত্য ধর্মের সাথে পরবর্তীকালে ভ্রান্ত মত ও পথ এবং বিভিন্ন আচার–অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ ঘটে। এর ফলে ধর্ম বিকৃত হয়–নানা ভুল ব্যাখ্যা এবং কদর্থ দ্বারা তা কন্টকিত হয়। তার ফলে অদৃশ্য জগৎ থেকে যে প্রকৃত অনুভূতি অবতীর্ণ হয় জ্ঞান তা হুবহু ধারণ করতে সমর্থ হয় না। তা ছাড়া পরবর্তী লোকেরা স্ব স্ব ধর্মের প্রবর্তকদের ধর্ম এবং শিক্ষার এমন সব ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন, যেগুলি মূল প্রবর্তকের উদ্দেশ্য–বহির্ভূত ছিল। সত্যসন্ধ ব্যক্তি ধর্মকে কুসংস্কার এবং কৃত্রিমতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপন চেতনালোকে তার যথার্থ রূপ দেখতে পান ; কেননা, তাঁরা জাগ্রত আত্মার অধিকারী। গোটা মানব জাতির সম্বন্ধে আদর্শরূপে উপস্থিত করার জন্য এই সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তিগণ স্বধর্মাবলম্বিগণকে স্ব–উপলব্ধ সত্যের প্রতি আহবান করেন।

তাঁদের গ্রন্থাবলী মনোযোগের সংগে পাঠ করলে এ সত্যই ধরা পড়ে যে, তাঁরা তাঁদের সমাজের প্রতিটি লোককে সমস্ত দুনিয়ার সাধারণ মানুষের শিক্ষকরূপে প্রস্তুত করেছেন।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র যুগে দিল্লী ছিল এমন একটি কেন্দ্র, যেখানে দুনিয়ার সকল ধর্ম এবং চিন্তাধারার সমাবেশ ছিল। সে দিক থেকে সে-দিনের দিল্লী এমন চিন্তাধারার ধারক ছিল যে, তা সমগ্র উপমহাদেশ তথা সমগ্র বিশ্ব-মানবের শিক্ষা ও মুক্তির বাহন হতে পারত। উপমহাদেশের কেন্দ্রভূমি দিল্লীতে বিশ্বজনীন চিন্তাধারার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরও বহু পূর্বে সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের আমলে। তিনি ছিলেন খাজা বখ্তিয়ারের আধ্যাত্মিক শিষ্য (মৃত্যু ৬৩৩ হিঃ)। তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে এবং জিয়াউদ্দীন আল্‌বেরুনী ও তাবকাতে নাসেরীতে কাযী মিনহাজুদ্দীন উল্লেখ করেছেন; 'সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ যখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন, তখন চেংগিস খাঁর নিষ্ঠুর উৎপীড়নের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য দীর্ঘকাল আপন আপন অঞ্চলের শাসক, বড় বড় আমীর-উমারা এবং বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি রাজধানীতে এসে দিল্লীর সম্রাটের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে সম্রাট আলতামাশের দরবারে এমন সব গুণীজ্ঞানীর সমাবেশ ঘটেছিল সমস্ত দুনিয়ায় যার তুলনা ছিল না। সে দরবারের তুলনা হতে পারত একমাত্র সুলতান মাহমুদ গজনী এবং সুলতান মনসুরের দরবারের সাথে। রাজধানীতে জ্ঞানীগুণী, আমীর-উমারা এবং প্রধান ব্যক্তিদের সমবেত করার চেষ্টা সম্রাট আলতামাশের প্রথম থেকেই ছিল। এই উদ্দেশ্যে সম্রাট দু'কোটি টাকা বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ রেখেছিলেন। দিল্লীতে তখন চারদিক থেকে লোক এসে একত্রিত হলো। সম্রাট আলতামাশের ঔদার্যে দিল্লী সারা দুনিয়ার গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের তীর্থে পরিণত হলো। পরবর্তী সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের (মৃত্যু ৬৮৬ হিঃ) যুগে মাওরাউন্নাহার, খোরাসান, ইরাক, আজারবাইজান, পারস্য, রোম এবং সিরিয়া প্রভৃতি দেশের রাজা-বাদশাহ্ ও শাহ্যাদারা চেংগিসের বাহিনীর হাতে তাড়া খেয়ে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের আশ্রয়ে এসে সসম্মানে জীবনযাপন করছিলেন। এ সব বিদেশী মেহ্মানের জন্য তাঁদের নামে ১৫টা নতুন উপনিবেশ আবাদ করা

হয়েছিল। তারিখে ফেরেশতায় সে সব উপনিবেশের নাম উল্লেখ আছে। এ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্রাট বলবনের অতুল্য রাজধানীতে এসে সমবেত হয়েছিলেন। এ কারণে বিজ্ঞ লোকেরা সুলতান মাহ্মুদ গজনীর দরবার থেকেও সুলতান বলবনের দরবারকে প্রাধান্য দিতেন।

উপমহাদেশের আলেকজান্ডার সম্রাট আলাউদ্দীন খালজীর (মৃত্যু ৭১৬ হিঃ) যুগে আমীর খসরু তাঁর অমর কবিতায় দিল্লীর চিত্র নিম্নরূপ অংকন করেছেন।

خوشا هندوستان و رونق دین ـ شریعت را کما عز و تمکین

ز علم با عمل دهلی بخارا ـ زشاهان گشته اسلام آشکا را

مسلمانان به نعمانی روش خاص ـ زدل هر چار آئیس را به اخلاص

نه کین با شافعی نی مهر بازید ـ جماعت را و سنت را بجان صید

তরজমা ঃ

হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা ধর্ম–গৌরবে উদ্ভাসিত,
শরীয়ত তাদের কাছে পেয়েছে পূর্ণ মর্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা,
দিল্লী এবং বোখারার বৈশিষ্ট্য, বিদ্যা ও তার আমলের বৈশিষ্ট্য
তাদের বাদশাদের কল্যাণে ইসলাম স্বরূপে উদ্ভাসিত।
এখানের মুসলমানদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে নো'মানীর সাথে,
তা' সত্ত্বেও চারটি মযহাবের প্রতি রয়েছে তাদের অকৃত্রিম অন্তর।
শাফেয়ীর প্রতি নাই তাদের কোন বিদ্বেষ এবং বায়জিদের প্রেমেও তারা নয় অন্ধ।
সুন্নত অল্ জমাতের প্রতি তারা অন্তরের সহিত আকৃষ্ট।

দিল্লীতে মুসলিম সভ্যতার জৌলুশ যখন নিঃশেষ প্রায়, সে সময়ও শাহ্ আবদুল আযীযের কবিতায় তাঁর গৌরব–গাঁথা নিম্নরূপ ফুটে উঠেছে ঃ

يا من يسال عن دهلی و رفعتها ـ علی البلاد و ما حازته مت شرف

ان البلاد اماء و هی سيدة ـ و انها درة و كلها كالصدف

بلاد الورى عزآ مرتبة الحجاز غير القدس النحف

سكانها حبور حلقا خلقا عجب لا

بها مدرس لو طاف البصير بها لم تفتح عينه الاعلى الا لصحف

كم مسجد زخرفت فيها منارته لو قابلته الشمس الضحو تنكسف

لا عز و ان زانت الدنيا بزينتها كم من اب قد علا بن ذى شرف

و ماء جون جرى من تحتها فحكى انهار خلد جرت فى اسفل العرف

''দিল্লীর মাহাত্ম্য এবং গৌরবের কথা জানতে চাও, শোন, অন্যান্য নগরী হচ্ছে বাঁদীর তুল্য এবং দিল্লী হচ্ছে নগরের মধ্যে সম্রাজ্ঞী। সম্মান এবং মর্যাদা যে দিক দিয়েই বিচার কর, দিল্লী হচ্ছে মুকুটসদৃশ।

অবশ্য হেজায, বায়তুল্ মুকাদ্দস্ এবং
নজফে আশরাফের কথা আলাদা।

দিল্লীর অধিবাসীদের রূপ, সৌন্দর্য, চরিত্র এবং
রীতিনীতি বিশ্বের মধ্যে তুলনাহীন।

যেদিকেই যাও না কেন দেখতে পাবে বিদ্যালয়
এবং অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যস্ততা।

গৌরবময় তার মসজিদ, তার সুউচ্চ মীনারগুলির
চাকচিক্যের সম্মুখে দ্বিপ্রহরের সূর্যও লজ্জায় ম্রিয়মাণ।

দিল্লীর রূপ ও সজ্জায় যদি সারা দুনিয়া আলোকিত
হয়ে ওঠে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

সন্তান যদি হয় গুণবান এবং যোগ্য তা'তে পিতা-পিতামহের
গৌরব বৃদ্ধিই পায়।

দিল্লীর পাদপ্রান্তে যমুনা এমনভাবে প্রবাহিত যেন কোন বেহেশতের
নদী বয়ে চলেছে তার প্রাসাদরাজির নিচ দিয়ে।

১৮৫৭ সাল।

উপমহাদেশের রাজধানী দিল্লীর গৌরব অস্তমিত হয়ে পড়েছিল। তখনও এমন সব অনন্যসাধারণ প্রতিভা বেঁচে ছিলেন, যাঁদের কল্যাণে আলীগড়ে জ্ঞানের মশাল জ্বলে উঠেছিল এবং দেওবন্দে ইসলামী জ্ঞানচর্চার নতুন যুগ সৃষ্টি হয়েছিল। স্যার সৈয়দ, নজীর আহমদ, যাকাউল্লাহ্ উর্দু সাহিত্যে এবং গালেব, হালী, দাগ প্রমুখ উর্দু কাব্যে অতীত দিল্লীর জ্ঞানগরিমারই স্মৃতি বহন করছিলেন। তাঁদের কল্যাণে সেই ভস্মীভূত শস্যক্ষেত আবার সবুজ সোনার ফসল ফলাবার সুযোগ পেয়েছিল।

এতে সন্দেহ নেই যে, সম্রাট মুহম্মদ শাহের আমলে শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়ের কারণে দিল্লীর রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক চেতনা তখনও রাহু–কবলিত হয়নি। দিল্লীতে তখনও যে বিদগ্ধ সমাজ বিদ্যমান ছিল ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁদেরকে লক্ষ্য করেই তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন এবং তাঁদেরকেই সংস্কার আন্দোলনের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি যে দিল্লীর শিক্ষিত সমাজকে অনেকটা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার দু'টি প্রমাণ ইতিহাসে বিদ্যমান।

মির্‌যা মুহম্মদ মায্‌হার জানেজানাঁ বলেছেন, 'হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দেস (রহ.) একটি নতুন পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। তত্ত্ব–দর্শন এবং জ্ঞানের নিগূঢ় বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টিভংগি নিজস্ব। তিনি একাধারে যেমন দার্শনিক জ্ঞানের অধিকারী, তেমনি তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানেরও বাহক। তাঁর মধ্যে ব্যবহারিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান দুই–ই বিদ্যমান। তাঁর ন্যায় একজন তত্ত্বজ্ঞানী সূফী কর্তৃক এমন নতুন জ্ঞানের আলোচনা অতীতে খুব কম হয়েছে।[১২]

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সংস্কার আন্দোলনের স্বীকৃতির দ্বিতীয় প্রমাণ সুলতান মুহম্মদ শাহের দরবারের সিদ্ধান্ত। সুলতান মুহম্মদ শাহ্ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিক্ষাকেন্দ্রকে[১৩] পুরাতন দিল্লীর সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে দেখে সুখী হতে পারেননি। সেজন্য তিনি শাহ্‌জাহানাবাদের একটি গোটা মহল্লাই তাঁর

---

১২. কালেমাতে তৈয়্যেবাত।
১৩. ৬নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সেখান থেকেই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক প্রচারিত আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। শাহ্ সাহেবের পরে ইমাম আবদুল আযীয এবং তাঁর পরে ইমাম মুহম্মদ ইসহাক এই মাদ্রাসা থেকেই আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। দিল্লীর মসনদের সংস্কারই ছিল সে আন্দোলনের লক্ষ্য। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের পরে এই মাদ্রাসার আদর্শেই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেওবন্দের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শাহ্ সাহেব তাঁর আন্দোলনের পরিকল্পনা রচনার সাথে সাথে তাঁর অনুবর্তীদের দ্বারা আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেছিলেন। তাঁরা শিক্ষা এবং দীক্ষার মারফতে এক দিকে আলিম এবং সূফীদের মধ্যে, অপর দিকে আমীর–উমারা এবং শাহী দরবারের অন্যান্য বিশিষ্ট লোকের মধ্যে আন্দোলন বিস্তার করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন। যাঁরা একাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মওলানা মুহম্মদ আশেক ফুলহাতী,[১৪] মওলবী নূরুল্লাহ্ বুড্‌ডানবী এবং মওলানা মুহম্মদ আমীন কাশ্মীরী উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় পরিষদের শাখাও প্রতিষ্ঠিত করিয়েছিলেন। নযীরাবাদের মাদ্রাসা,[১৫] রায় বেরেলীতে শাহ্ ইলমুল্লাহ্‌র দায়েরা[১৬] এ–শ্রেণীর শাখাকেন্দ্র। সিন্ধুর থাড্‌ডায় মোল্লা মুহম্মদ মুঈনের মাদ্রাসাও[১৭] তার শাখা ছিল। বিখ্যাত সূফী শাহ্ আবদুল লতীফ ভাট্টাইর[১৮] সাথে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

১১৪৪ হিজরীতে শাহ্ সাহেব মক্কা শরীফে যে ইলহামী স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি সে স্বপ্নযোগে জ্ঞাত হয়েছিলেন যে, বিজাতীয়দের দ্বারা মুসলিম–নগরী অধিকৃত হয়েছে। তিনি স্বপ্নযোগে আরো জানতে পেরেছিলেন যে, মারাঠাগণ কর্তৃক দিল্লীর লালকেল্লা বিজিত হয়েছে। তিনি যে আল্লাহ্‌র এক বিশেষ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য একজন যুগ–প্রবর্তক, তাও তিনি স্বপ্নে অবগত হয়েছিলেন। ত্রিশ বছর পরে ১১৭৪ হিজরী

---

১৪. ৭ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
১৫. ৮ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
১৬. ৯ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
১৭. ১০ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
১৮. ১১ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সনে পানিপথের লড়াইর[১] ভিতর দিয়ে এ স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছিল। নওয়াব নজীবুদ্দওলাহ্ ছিলেন শাহ্ সাহেবের অন্যতম ভক্ত। শাহ্ সাহেবের পরামর্শক্রমে তিনি ও তাঁর অনুচরবর্গ আহমদ শাহ্ আবদালীকে ডেকে এনেছিলেন। এভাবে দিল্লীর মসনদকে নিষ্কন্টক করে শাহ্ সাহেব তাঁর পরিকল্পনার এক অংশ কার্যে পরিণত করেছিলেন। পানিপথের ময়দানে আহ্মদ শাহ্ আবদালীর বিজয় দিল্লীর রাজনৈতিক আকাশকে মারাঠাদের ক্রমবর্ধমান বিপদের ঘনঘটা থেকে মুক্ত করেছিল। এ ঘটনার ঠিক দু'বছর পরে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শাহ্ ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ ইন্তিকাল করেছিলেন।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র গ্রন্থাবলী পাঠ করলে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভংগির সাথে পরিচিত হতে পারবেন। তাঁর গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের দ্বারা সহজেই যে সমস্ত চিন্তাধারার সাথে আমরা পরিচিত হতে পারি, তার মধ্য থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করবো ঃ

১ মহাগ্রন্থ কুরআন একটি বৈপ্লবিক আহ্বান এনেছে। সে আহ্বান আন্তর্জাতিক। বিশ্ব-মানবতার ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত। যে-কোন যুগে এবং যে-কোন সমাজ কুরআনের এ বৈপ্লবিক নীতি অনুসরণ করলে, তার পরিণামে ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনের ন্যায় নবজাগরণের সূচনা অবশ্যম্ভাবী এবং তা ঘটবে কুরআনের অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই। সে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ যুগের কথা অবান্তর। সাধারণের দৃষ্টি থেকে কুরআনের এ অলৌকিক শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে খৃষ্টান জগৎ চিরদিনই চেষ্টিত ছিল। মিসরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং লেখক জরজি যীন্দান পরিষ্কার লিখেছেন যে, হযরত আবূ বকর এবং হযরত ওমরের খিলাফত ছিল একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। অর্থাৎ অতীতে ইসলাম যে যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছিল তার মূলে কুরআনের শিক্ষার কোন প্রভাব ছিল না। ঘটনাক্রমে একই সময় কিছু সংখ্যক লোকের আবির্ভাব হওয়ার ফলেই ইসলাম এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। চিরদিনই যে এমন ঘটবে, এ ধারণা ভ্রান্ত। এসব মত প্রচার

---

১১. ১২ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ছাড়াও কুরআনের সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক প্রভাব নস্যাৎ করার জন্য আরো ষড়যন্ত্র বিস্তার করা হয়ে থাকে।

বর্তমান যুগে 'সীরাত' সম্মেলনগুলিও এ ধরনের স্বপ্নবিলাস এবং মোহমাত্র। জনসাধারণকে তার দ্বারা আবিষ্ট করা হচ্ছে। কেউ একথা উপলব্ধি' করুন কি না করুন, 'সীরাত' আন্দোলন পরিচালকগণের উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণের মস্তিষ্কে এ খেয়াল বদ্ধমূল করা যে, ইসলামের সমস্ত শক্তির উৎস কুরআন ছাড়া শুধু মাত্র নবী করীম (স.)–এর অসাধারণ ব্যক্তিত্বেই নিহিত। ভবিষ্যতে যদি তেমন কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, তবেই ইসলামের পুনঃজাগরণ সম্ভব হতে পারে। এ কারণেই মুসলমানদের একদল ইমাম মেহ্‌দীর প্রতীক্ষায় আছে।

২. কুরআনের শিক্ষার প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগ্রত হয়েছিল, তা হযরত রসূলে করীম (স.) থেকে শুরু করে হযরত ওসমান (রা.)–এর যুগের বিপ্লব পর্যন্ত যথাযথভাবে অব্যাহত ছিল। কুরআনের কর্মনীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে সার্বজনীন আন্দোলন বোঝা আবশ্যক।

হযরত রসূলে করীম (সা) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে গিয়েছিলেন। মদীনায় ইসলামী আন্দোলনে একটি রাষ্ট্রীয় রূপ পায় এবং সরকার গড়ে ওঠে। হযরত (সা)–এর পরলোকগমনের পরে হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের যুগে মদীনাই ছিল ইসলামের প্রাণকেন্দ্র এবং উৎসভূমি। পরে মুসলমানদের মধ্যে গৃহ–বিবাদ শুরু হওয়ার ফলে হযরত আলী (রা.) মদীনার পরিবর্তে কুফায় তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং তার পরে উমাইয়া খলীফারা দামেস্কে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এসত্ত্বেও ইসলামের শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র মদীনায়ই থেকে গিয়েছিল। এ কারণেই কুরআনকে কেন্দ্র করে যে খিলাফত গড়ে উঠেছিল, তার বুনিয়াদ, সূচনা এবং শিক্ষার আদর্শ মদীনাবাসীদের নিকটই রক্ষিত ছিল। ইমাম মালিক পরবর্তীকালে তা–ই তাঁর মুয়াত্তায় সংগৃহীত করেছেন। ফিকাহ্‌ এবং হাদীসের সব গ্রন্থের তুলনায় তাই মুয়াত্তাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।[২০]

---

২০. মদীনাতে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার শুরু হয়েছিল। হযরত ওসমান (রা.)–এর শাহাদৎ পর্যন্ত শিক্ষার এই ধারা অব্যাহত ছিল। এব্যাপারে মক্কা মুয়াযৃযমা, বসরা, কুফা

৩. কুরআনে বর্ণিত আয়াত ঃ

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون –

আল্লাহ্ই হেদায়াত এবং সত্য দীনসহ রসূল প্রেরণ করেছিলেন যেন সব ধর্মের উপর সে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদিও মুশরিকগণের নিকট তা অবাঞ্ছিত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আয়াতে যে দাবি করা হয়েছে তা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই সার্থক হয়েছে। কুরআনের এ দাবি ভবিষ্যতের একটা স্বপ্ন মাত্র, এ ধারণা ভ্রান্ত এবং সেজন্য কোন নবী বা ওলীর আগমনের প্রতীক্ষা অর্থহীন।

শিয়া সম্প্রদায় আহ্লে বাইতের নামে অমূলক প্রচার দ্বারা মুসলমানদের ধারণাকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। শাহ্ সাহেব তাঁর গ্রন্থাবলীতে সে বিষয় আলোচনা করেছেন।

৪. শাহ্ সাহেব চারটি মৌলিক শিক্ষাকে ঐহিক ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তির অবলম্বন বলে সাব্যস্ত করেছেন ঃ

(১) তাহারাত–পবিত্রতা, (২) মহান প্রতিপালক আল্লাহ্র সমীপে বিনয় ও ভীতি, (৩) সংযম, (৪) আদালত বা ন্যায়নিষ্ঠা।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠাই হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু।

শ্রমজীবীদের উপর থেকে অত্যধিক চাপ রহিত করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন ব্যতীত সমাজে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যের শোষণ ব্যবস্থা[২১] সভ্য দুনিয়ার এই বৃহৎ অংশকে অর্থনৈতিক শোষণ দ্বারা জর্জরিত করে তুলেছিল। ফলে, সর্বত্র

কিংবা বাগদাদ কোন স্থানই মদীনার সমকক্ষতা দাবি করতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইমাম মালিক (র) কর্তৃক সংকলিত 'মুয়াত্তা'কে পবিত্র কুরআনের পরেই ইসলামী শিক্ষা ঐতিহ্যের প্রথম স্তরের ধারক বলে গণ্য করে থাকি। ইমাম বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসের প্রতি আমরা এ বিষয়ে কৃতজ্ঞ যে, তাঁরা 'মুয়াত্তা'র উপরোক্ত মর্যাদাকে বহাল রেখেছেন এবং তাঁরা পরবর্তী যুগে 'মুয়াত্তা'কে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ বলে প্রমাণিত করেছেন।

২১. ১৫ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নৈতিক অধঃপতন নেমে এসেছিল। ইসলামের সবচেয়ে প্রধান লক্ষ্য ছিল রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নিপীড়িত জগৎকে মুক্তি দেওয়া।

কুরআনের এই বিপ্লবী আহ্বানকে যে-কোন মুসলিম সমাজ ফিরিয়ে আনতে চাইলে তার কর্তব্য হবে রসূলে করীম (স.)-এর সাথে যে কোরেশ প্রধানগণ সর্বপ্রথম হিজরত করার সম্মান অর্জন করেছিলেন, তাঁদের আদর্শ, তাঁদের জীবন-যাপন প্রণালী এবং চরিত্র গ্রহণ করা।

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সেই বিপ্লবী চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য শাহ্ সাহেব আরবী ভাষা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলিমদের চরিত্রকে আদর্শ বলে স্থির করেছেন।[২২]

শ্রমজীবীদের প্রতি অত্যধিক চাপ রোধ করা ব্যতীত কোন সমাজ-জীবনে ভারসাম্য সৃষ্টি হতে পারে না। শাহ্ সাহেবের এ উক্তির তাৎপর্য আমি ততক্ষণ বুঝতে পারি নি, যতক্ষণ ইউরোপ গিয়ে সোস্যালিজম্ সম্পর্কে গবেষণা না করেছি। যাঁরা আমাকে এ বিষয় বুঝতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন সবাই মার্কস্‌পন্থী।[২৩]

কার্লমার্কস ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আমার সে বন্ধুবর্গ কার্লমার্কসের প্রতি এতটা আনুরক্তি দেখাতেন যে, তা আমার নিকট অনেক সময় পীড়াদায়ক হতো। মার্কসের প্রতি তাঁদের ভক্তির কারণ ছিল, তাঁর অর্থনৈতিক

---

২২. আরব জাতির অনুসরণ এক কথা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের আরব মুসলিমদের অনুসরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ইনকিলাব সৃষ্টি করার জন্য ইনকিলাবের আদর্শ সম্মুখে রাখা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম মুহাজির শ্রেণী মক্কার প্রধান ব্যক্তিরাই ছিলেন। তাঁরা কুরআনের বিপ্লবী আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য নিজেদের সে প্রাধান্য বিসর্জন দিয়েছিলেন। স্বদেশ এবং ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কুরআনের সংস্কার নীতি অনুধাবন করার জন্য মুহাজিরগণের এই চরিত্রই প্রধান আলেখ্য। নিজ দেশ এবং গৃহের মমতা পরিত্যাগ করতে না পারা পর্যন্ত কুরআনের বিপ্লব অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

২৩. কার্লমার্কস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাজতান্ত্রিক ম্যানিফেস্টো ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচী পেশ করেন। শাহ্ সাহেব তাঁর ১০২ বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন অর্থাৎ মার্কসের সাম্যবাদ প্রচারের ৮৫ বছর পূর্বে।

মতবাদ, একথা তাঁরা নিজেরাই বলতেন। আমি দেখে বিস্মিত হয়েছি যে, কার্লমার্কসের বহু পূর্বে শাহ্ সাহেবের গ্রন্থে এ ধরনের বিপ্লবী পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। শাহ্ সাহেব ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং কার্লমার্কস ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

সিরাজুল হিন্দ ইমাম আবদুল আযীয (১১৭৬ হিঃ–১২৩৯ হিঃ)

হাকীমুল্ হিন্দ ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ যখন গতায়ু হন, ইমাম আবদুল আযীয তখন ১৭ বছরের যুবক মাত্র। তাঁর পাঠ্যাবস্থা তখনও শেষ হয়নি। শাহ্ সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদ মওলানা আবদুল আযীযকে ইমাম মেনে নেবার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে তাঁকে শাহ্ সাহেবের সংস্কারমূলক আন্দোলনের মূলনীতিগুলি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলো। মওলানা মুহম্মদ আশেক এবং মওলানা মুহম্মদ আমীন তাঁকে হাদীস এবং সংস্কার আন্দোলনের বিষয় শিক্ষা দান করেছিলেন। মওলানা আবদুল আযীযের শ্বশুর মওলানা সূরুল্লাহ্ তাঁকে ফিকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। এভাবে ইমাম আবদুল আযীযকে শাহ্ সাহেবের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। উপরোক্ত মওলানা মুহাম্মদ আশেক, খাজা মুহম্মদ আমীন কাশ্মীরী এবং মওলানা মুহম্মদ নূরুল্লাহ্ ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র আদর্শে গঠিত এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত উচ্চ দরজার আলিম ছিলেন। তাঁদের দ্বারাই শাহ্ সাহেবের চিন্তাধারা রক্ষিত এবং প্রচারিত হয়েছিল। এঁদের সাথে সাথে শাহ্ সাহেবের ছাত্র ও শিষ্যদের আরও একটি দল গড়ে উঠেছিল। তাঁর বংশধররাও তার মধ্যে শামিল ছিলেন। শাহ্ আবদুল আযীয এই উভয় দলেরই সর্বসম্মত ইমাম ছিলেন। শাহ্ সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্রদের হাতে যে পরিমাণ লোক শিক্ষিত হয়েছিলেন, ইমাম আবদুল আযীযের ছাত্রদের হাতে তার চেয়ে বহুগুণ লোক আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছিলেন।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র যুগে দিল্লীতে মুসলিম রাজত্বের তবু কিছুটা প্রাণ অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু শাহ্ আবদুল আযীযের যুগে মুসলিম সম্রাটদের প্রাণশক্তি বলতে কিছুই বাকি ছিল না।

খাস দিল্লীতে তো তখন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিল। শাহ্ সাহেব কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলন এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে ইংরেজগণ অজ্ঞ ছিল না। অবশ্য এটা শাহ্ আবদুল আযীযেরই বিচক্ষণতার ফল যে, তিনি অতি সতর্কতার সাথে এই আন্দোলন–ভিত্তিক দর্শন বিদগ্ধ লোকজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তখনকার আলিম সমাজ সাধারণভাবে যে বিষয়গুলি শিখতেন, ইমাম আবদুল আযীযও সে সমস্ত শিক্ষা করেছিলেন। তিনি তখনকার পাঠ্যপুস্তকে যে সমস্ত বিষয় ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শনের বিরোধী দেখতে পেয়েছিলেন, সেগুলির সাবধানে সমালোচনা করতেন। পরে খুব সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় শাহ্ সাহেবের উক্তি এবং যুক্তি শুনিয়ে দিতেন। শাহ্ সাহেব নিজে বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করার জন্য যে পদ্ধতি অনুরসণ করতেন তিনিও সেই পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীদের বোধগম্য করে তুলতেন। অবশ্য সেখানে তিনি শাহ্ সাহেবের বা নিজের নাম যোগ করতেন না। এরূপে তিনি সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণকেও শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র বিশিষ্ট মতবাদের সংগে পরিচিত করে তুলতে সক্ষম হন। তাঁর রচিত 'তুহ্ফায়েইস্না আশারিয়া' এবং 'তফসীর–ই–আযীযী'তে এর বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি নিজ পরিবারভুক্ত লোকদের এবং যাঁরা বিশেষভাবে এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, তাঁদেরকে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

দীর্ঘ ষাট বছরকাল ইমাম আবদুল আযীয এ প্রণালীতে কাজ করেছিলেন। ফলে, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র জ্ঞান, গবেষণা ও দর্শন লোকের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল। সে সময়ে যদি সুচতুর ইংরেজ জাতি উপমহাদেশের মৃত্তিকায় দৃঢ়ভাবে শিকড় না গেড়ে ফেলতো, তাহলে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র সংস্কার আন্দোলনই শক্তি দখল করতে সমর্থ হতো। ইংরেজদের প্রাধান্য শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনের পথে শুধু অন্তরায় হয়েই দাঁড়িয়েছিল না, বরং তাদের চক্রান্তে সে আন্দোলনের রূপকে এমনভাবে বিকৃত করে তুলে ধরা হলো যে, জনসাধারণ তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো। অবশ্য খাঁটি জ্ঞানানুসন্ধিৎসুরা তাদের বিরুদ্ধ–প্রচারে কোনরূপ প্রভাবিত হননি।

শাহ্ আবদুল আযীয একদিকে যেমন শাহ্ সাহেবের শিক্ষা ও দর্শন প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন, অন্যদিকে তাঁর সংস্কার আন্দোলনকে এই উপমহাদেশে

বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য জীবনপণ করেছিলেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্কে ইল্হাম যোগে জ্ঞাত করান হয়েছিল যে, তাঁকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা পূর্ণ হতে দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রয়োজন হবে।[২৪] এই প্রতিশ্রুত কাজ পূর্ণ করাই আবদুল আযীযের উদ্দেশ্য ছিল। শাহ আবদুল আযীযের সাথে তাঁর ভাই মওলানা শাহ্ রফিউদ্দীন এবং শাহ্ আবদুল কাদির বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। ব্যবহারিক জ্ঞান পর্যালোচনার ক্ষেত্রে শাহ্ রফিউদ্দীন প্রয়োজন মিটাতেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে শাহ্ আবদুল কাদির বিশেষ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। কুরআন–হাদীস প্রভৃতি শ্রুত জ্ঞানে শাহ্ আবদুল আযীয অনন্যসাধারণ ছিলেন। এভাবে ব্যবহারিক, শ্রুত এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাহায্যে একটি পূর্ণাংগ সমিতি গঠনের চেষ্টা চলছিল। ইমাম আবদুল আযীয যখন এ সাধনায় নিয়োজিত, সে সময় তিনি স্বপ্নযোগে[২৫] বিপ্লব আন্দোলনের ইমাম আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.) কর্তৃক জ্ঞাত হন যে, ফকীহ্ এবং সূফীগণের পন্থা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত নয়। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক অনুসৃত পন্থা প্রাথমিক যুগের অনুরূপ। তিনি স্বপ্নযোগে এক আধ্যাত্মিক প্রেরণা অনুভব করেন এবং তা জাগ্রত অবস্থায় অব্যাহত থাকে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী তাঁকে স্বপ্নযোগে পোশতু ভাষা শিক্ষা করার নির্দেশ দেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে শাহ্ আবদুল আযীযই ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র নীতিতে সর্বপ্রথম একটি কওমী সরকারের বুনিয়াদ পত্তন করেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দিল্লীর উচ্চতর সমাজকে তাঁর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং শাহী দরবারের আমীর–উমারার সাথে মেলামেশার সুযোগে রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও অনেকখানি অর্জন করেছিলেন। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, নওয়াব

---

২৪. দীর্ঘ প্রতীক্ষার তাৎপর্য বোঝার জন্য শাহ্ সাহেবের পরবর্তী বংশাবলীর কার্যকলাপের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ 'খায়রে কাসীর' গ্রন্থে (পৃঃ ১১৩) উল্লেখ করেছেন যে, উপমহাদেশীয় মুসলমানদের হাত থেকে রাজত্ব পরিচালনের দক্ষতা আফগান জাতির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। এতদ্বারা তিনি আফগানদের সামরিক শক্তি এবং শৌর্যবীর্যের দিকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ সামরিক শৌর্য যাদের লুপ্ত হয়েছে তাদের উন্নতি সম্ভব নয়।
২৫. ১৬ নং পরিশিষ্ট দ্রঃ।

নজীবুদ্‌দওলাহ্ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্যতম অনুগত ভক্ত ছিলেন। শাহ্ সাহেবের পরামর্শক্রমে তিনি এবং তাঁর অনুচরবর্গ মিলে আহ্‌মদ শাহ্ আব্‌দালীকে কান্দাহার থেকে আহ্বান করে এনেছিলেন। শাহ্ সাহেব এ ব্যাপারে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিও প্রয়োগ করেছিলেন। নওয়াব নজীবুদ্‌দওলাহ্ এ উপলক্ষে মধ্যস্থতার কাজ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের মূল ছিল এখানে যে, দিল্লীর সম্রাটের দরবার এমন নিস্তেজ এবং অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল যে, পানিপথের বিজয়কে কাজে লাগানোর এবং উপমহাদেশে ইসলামী হুকুমতের কেন্দ্রকে বিশৃংখলা এবং পতনের হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোন যোগ্য নেতৃত্ব অবশিষ্ট ছিল না। কাজের মধ্যে এ হয়েছিল যে, কেউ কেউ বিভিন্ন প্রদেশের কর্তৃত্ব হস্তগত করেছিলেন। সে কয়টি ক্ষুদ্র রাজ্য ছাড়া উপমহাদেশের অপরাংশে কেবল নামেমাত্র মুসলিম রাজত্ব কায়েম ছিল।

একথা সত্য যে, আহ্‌মদ শাহ্ আবদালীর অভিযানের ফলে মারাঠাদের শক্তি চুরমার হয়ে গিয়েছিল এবং আকবর ও আলমগীরের মসনদ দখলের সাধ মিটে গিয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগে ইংরেজদের প্রভাব দিন দিন বাড়তে লাগলো। তারা বাংলা এবং মাদ্রাজ দখল করে উপমহাদেশের উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। ১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর বকসারের যুদ্ধে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম ইংরেজদের হাতে হেরে গেলেন এবং একটি চুক্তির মাধ্যমে সব ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে তুলে দিলেন। লালকেল্লা এবং দিল্লীর আশপাশের কিছু পরিমাণ এলাকাই শুধু সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীর হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হলেও আসলে সম্রাটের নামে ইংরেজরাই দেশ শাসন করছিল। মুসলমানদের জন্য বিশেষ এবং উপমহাদেশের অন্য প্রজাদের জন্য সাধারণ সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। যেমন, সরকারী ভাষা ফারসীই রাখা হলো এবং মুসলমানদের বিচারের ক্ষমতা কাযীর হাতে এবং হিন্দুদের বিচার–আচার পন্ডিতদের হাতে ন্যস্ত করা হলো। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্ আলমের মৃত্যুর পর সম্রাট দ্বিতীয় আকবর সিংহাসনে আসীন হন। ইংরেজগণ এবার সম্রাটের স্বাধীনতা আরও খর্ব করে ফেললো। তাঁর কর্তৃত্ব শুধু লালকেল্লা এবং দিল্লী নগরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। অবশিষ্ট দেশ

সবই কোম্পানী নিজ অধিকারে নিয়ে গেল। এভাবে দিল্লী থেকে শুরু করে কলকাতা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ পরোক্ষভাবে ইংরেজদেরই অধিকারে চলে গিয়েছিল। দিল্লীর উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলি অনেক পূর্বেই কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমকালেই বাদশাহ্ নাদির শাহ্[২৬] কাবুল, কান্দাহার এবং ঠাড্ডা পারস্য সাম্রাজ্যের শামিল করে নিয়েছিলেন। এর পূর্বে মীর আবিসের[২৭] পরবর্তী কান্দাহারের আফগান শাসনকর্তারা মুহম্মদ শাহ্‌কে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিলেন।

নাদির শাহের পরে আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী[২৮] কাশ্মীর, লাহোর এবং মুলতান প্রদেশ দিল্লীর কর্তৃত্ব থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ছয়টি প্রদেশ এভাবে পূর্বেই দিল্লীর অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কান্দাহারের এই আফগান হুকুমতকে[২৯] আমরা উপমহাদেশীয় হুকুমত বলেই গণ্য করি। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজ্যের ন্যায়ই এর অবস্থা মনে করা যেতে পারে।

১১৭৬ হিজরীর কাছাকাছি আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী পাঞ্জাব দখল করেছিলেন। অবশ্য তা খুব দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ শাহের দৌহিত্র যামান শাহ্ উপমহাদেশ আক্রমণ করেছিলেন এবং লাহোর দখল করেছিলেন। অতপর তিনি দিল্লী অভিযানের প্রস্তুতিতে লেগেছিলেন, কিন্তু ইংরেজদের কূট চালে সে অভিযান পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। তাদের ষড়যন্ত্রের ফলে ইরান কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রান্ত হলো। বাধ্য হয়ে শাহ্ যামানকে লুধিয়ানার পথে কাবুল ফিরে যেতে হল। এই ব্যতিব্যস্ততার ভিতরে তিনি রণজিত সিংহকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করে গেলেন। রণজিত সিংহ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব, মুলতান, কাশ্মীর এবং পেশওয়ার অধিকার করে এক স্বাধীন শিখ সাম্রাজ্যের পত্তন করেন এবং ইংরেজদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

মোট কথা, ইমাম আবদুল আযীযের যুগে একদিকে দিল্লী থেকে কলকাতা পর্যন্ত ইংরেজদের পরোক্ষ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে

---

২৬. ১৭ নং পরিশিষ্ট দ্রঃ।
২৭. ১৮ নং পরিশিষ্ট দ্রঃ।
২৮. ১৯ নং পরিশিষ্ট দ্রঃ।
২৯. ২০ নং পরিশিষ্ট দ্রঃ।

মারঠা এবং পাঞ্জাবে শিখরা প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাদের মুকাবিলায় লক্ষ্ণৌ, হায়দরাবাদ এবং মহীশূরের মুসলিম রাজ্যগুলি দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতো।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন আমাদের ধারণা এই যে, শাহ্ আবদুল আযীযের সম্মুখেও সে কর্মসূচীই ছিল। অর্থাৎ মারাঠাদের প্রভাব খর্ব করার জন্য শাহ্ সাহেব নওয়াব নজীবুদ্দওলাহ্র মধ্যস্থতায় আহ্মদ শাহ্ আবদালীকে আহ্বান করেছিলেন। পরে যখন পাঞ্জাবে শিখ কর্তৃত্ব এবং দিল্লীতে ইংরেজ প্রভুত্ব কায়েম হলো, তখন শাহ্ আবদুল আযীয কাবুল এবং কান্দাহারের শক্তি দিল্লীতে আহ্বান করে আনার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, যদি কাবুল–কান্দাহারের আমীরগণ অনুপযুক্ত প্রমাণিত হন, তবে জনসাধারণের মধ্য থেকে যে উপযুক্ত প্রমাণিত হয় তারই অধিনায়কত্ব মেনে নেওয়া হবে। এ জন্য প্রয়োজন ছিল কাবুল এবং কান্দাহারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার। তখনকার দিনে মুসলিম সমাজের মধ্যে কেবল আফগানরাই যুদ্ধের উপযোগী ছিল। তারা একাধারে ময়দানের যোদ্ধা এবং পৌরুষ ও বীরত্বেরও অধিকারী ছিল।

শাহ্ আবদুল আযীয দেখতে পেয়েছিলেন যে, এই দুর্ধর্ষ আফগানদেরকে সংগঠিত এবং সুশিক্ষিত করে তুলতে পারলে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী তৈয়ার হতে পারে।

ইমাম আবদুল আযীযের চারদিকে এই পরিবেশ বিরাজ করছিল। এর ভিতর দিয়েই তাঁকে নিজ লক্ষ্যের জন্য পথের সন্ধান করতে হয়েছিল। এজন্য তিনি যে বিচক্ষণতা এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তাঁর বিশেষ যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সর্বপ্রথম যে কর্মসূচী নিয়েছিলেন তা ছিল ইসলামী আকীদা এবং আখলাক সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা এবং কুসংস্কার প্রচলিত হয়ে পড়েছিল তার সংস্কার সাধন করা। কার্যত তাঁর অর্থ ছিল শাহ্ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে লোককে আকৃষ্ট করা এবং বিরুদ্ধাচারীদের অনুপ্রবেশ থেকে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখা। ইমাম আবদুল আযীযের এ ছিল কর্মপন্থার প্রথম

ধাপ। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ব্যাপক আন্দোলনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেছিলেন ; এ পরিষদের সদস্য ছিলেন শাহ্ ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং মওলানা আবদুল হাই। শাহ্ ইসহাককে তিনি নিজের স্থানে নিযুক্ত করেছিলেন। এই নবগঠিত পরিষদের আমীর ছিলেন শাহ্ মুহম্মদ ইসহাক। মওলানা সৈয়দ আহমদ ছিলেন সংগ্রাম বিভাগের আহবায়ক এবং আমীর। এই সংগ্রামী পরিষদের সাহায্যে শাহ্ আবদুল আযীয দিল্লীর মসনদকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ পরিষদ ছিল একটি অস্থায়ী সরকারের ন্যায়। তবে দিল্লী প্রকাশ্যত এ কাজের উপযুক্ত স্থান ছিল না, এজন্যই এ পরিষদকে অগত্যা আফগানিস্তানের এলাকায় স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। আফগানদের কাছে একজন সৈয়দের নেতৃত্ব দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃত হওয়ার ভরসা ছিল। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই মওলানা সৈয়দ আহ্মদকে আমীর এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদ এবং মওলানা আবদুল হাইকে উযীররূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

ইমাম আবদুল আযীযের সুদীর্ঘ ষাট বছরব্যাপী আন্দোলন ও কর্মপরিচালনার এ হলো একটি মোটামুটি চিত্র। তিনি কিভাবে ক্রমান্বয়ে এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, এবার সে বিবরণ শুনুন।

ইমাম আবদুল আযীয সর্বপ্রথম ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, উপমহাদেশে মুসলিম অধিকৃত এলাকায় যদিও নামেমাত্র দিল্লীর সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু কার্যত সে সব এলাকা দারুল হরবের অন্তর্গত। ইমাম আবদুল আযীযের মতে শুধু নামেমাত্র অধিকার কোন দেশকে দারুল ইসলাম করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।[৩০] সুতরাং উপমহাদেশে যে বিপুল মুসলিম শক্তি বিদ্যমান তাদের সামনে দু'টি পথ খোলা রয়েছে। হয় শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা নতুবা ইসলামী রাজ্যে হিজরত করে যাওয়া।[৩১] দারুল হরবে

---

৩০. তফসীরে আযীযী প্রথম খন্ড মুজতাযায়ী প্রেসে মুদ্রিত পৃঃ ১৭ এবং ১৮৫–উক্ত ফতোয়ার বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৩১. হিজরত সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে, উপমহাদেশীয় মুসলমানরা কোনরূপই হিজরত করতে পারে না। কেননা অধিকাংশ মুসলমান এখানে হিন্দু থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অবশ্য

অবস্থিত প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি এটা হচ্ছে মযহাবী কর্তব্য–ফরয। অন্য কথায় ইসলামী হুকুমত যদি অনৈসলামিক প্রবল শক্তির মোকাবিলা করতে সমর্থ না হয়, তখন ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্ব সর্বসাধারণ মুসলমানের উপর বর্তায়। মুসলিম সমাজ এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে সে ঔদাসীন্য হবে অবৈধ--হারাম।

ইসলামী হুকুমত এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক মুসলমানকে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সম্মিলিত শক্তিও গড়ে তুলতে হবে।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ দিল্লীর বিদগ্ধ সমাজকে তাঁর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করে তুলেছিলেন। ইমাম আবদুল আযীয মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সে চিন্তাধারা এবং শিক্ষা প্রসার করে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। এই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় হুকুমতের বুনিয়াদ। ইমাম আবদুল আযীয তাঁর অভীষ্ট কার্যে সফলকাম হয়েছিলেন এবং এ কারণেই তিনি সিরাজুল হিন্দ বলে আখ্যাত হয়েছিলেন।

ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অতীতে আরও ঘটেছিল। ইমাম আবদুল আযীয দ্বারা আর একবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটে। হিজরী দ্বিতীয় শতকের

ধর্মপ্রচারক এবং আধ্যাত্মিক ওস্তাদ শ্রেণীর মুসলমানরা বাইরে থেকে এসেছেন। এ ছাড়া যদিও অনেক বাদশাহও বাহির থেকে উপমহাদেশে এসেছিলেন এবং তাঁদের বহু উত্তরাধিকারী রয়েছে, কিন্তু তাঁদের সে বাদশাহীও নাই। উপরোক্ত তিনটি শ্রেণী অর্থাৎ ওস্তাদ, ধর্মপ্রচারক এবং বাদশাহ্ এঁরা অবশ্য হিন্দু থেকে মুসলমান হন নাই, তবে তাঁরা বহুকাল পূর্বে নিজ দেশ থেকে এখানে এসেছিলেন। কাজেই স্বদেশে এখন আর তাঁদের কোন পরিচয় নেই। এখান থেকে কোন সৈয়দজাদা মক্কা শরীফে গেলে তাঁকে একজন সাধারণ ভারত উপমহাদেশীয়দের ন্যায় গণ্য করা হয়। তুর্কীদের তুর্কীস্তানে এবং আফগানদের আফগানিস্তানে এই একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের সম্মুখে এ ঘটনা ঘটতে দেখছি যে, সম্ভ্রান্ত আফগান পরিবারের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হিন্দুস্তানী কাবুলে গিয়ে জাতীয় সরকারের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও সাধারণ একজন ভারত উপমহাদেশীয়ের ন্যায় গণ্য হয়েছে ; এবং অপদস্থ হয়ে ফিরতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং উপমহাদেশের কোন মুসলমানই হিজরত করে যেতে পারে, একথা আমরা মেনে নিতে পারি না। তার কাজ হবে দারুল হরবে থেকেই তাকে দারুল ইসলামে পরিণত করার চেষ্টা করা।

প্রথম দিকে ইরানী মুসলমানদের সাহায্যে বনু আব্বাসীয়রা উমাইয়া খিলাফতকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় ইমাম আবূ হানীফা (র.) আল্লাহ্-দত্ত প্রজ্ঞার বলে ইরাকের ফিকাহ্‌কে[৩২] উচ্চ যুক্তি এবং দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও গবেষণা যদি সে অবস্থায়ই থেকে যেত এবং চর্চা ও আলোচনা না হতো, তা'হলে একমাত্র উচ্চ শিক্ষিতেরা ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর গভীরে প্রবেশ করতে পারতো না। বহু ফকীহ ইমামের বেলায় এরূপ ঘটেছে। অর্থাৎ তাঁদের চিন্তা ও গবেষণা সাধারণ শ্রেণী পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। কাজেই সে সবের স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটেছে। ইমাম আবূ হানীফার ফিকাহ্ গবেষণা ও চিন্তাধারার[৩৩] সেই পরিণতিই ঘটতো যদি তা অনুধাবন করার উপায় আল্লাহ্ আরব মুসলিমদের জন্য না করে দিতেন। ইমাম আবূ হানীফার শিষ্যদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ছিলেন এক প্রতিভাশালী আরব সন্তান। তিনি ইমাম মুহম্মদকে নিজ সংগী করে নিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে চেষ্টা করে তাঁদের ওস্তাদ ইমাম আবূ হানীফার ফিকাহ্ দর্শনকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৪] ওঁদের চেষ্টার ফলেই হানাফী ফিকাহ্ দর্শন আজ পর্যন্ত টিকে রয়েছে।

৩২. ইরাকে বসবাসকারী ইমাম, সাহাবা এবং তাবাইগণ যে ফিকাহ্ সুসংবদ্ধ করেছিলেন ইরাকের ফিকাহ্ বলতে তাই বোঝান হয়েছে।

৩৩. ২১ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৪. যে কোন আন্দোলন বা মতবাদ সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজে দৃঢ়মূল হওয়ার পর তা সুরক্ষিত ও স্থায়ী হয়, এবং কখনও ধ্বংস হয় না। সমাজের নিম্ন শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুসরণ করে থাকে। উচ্চ শ্রেণী যা বলেন মধ্যবিত্তের স্তরে তাই কার্যকরীভাবে রূপায়িত হয়। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' এ অবস্থাকে 'রসুম' বা আলামত বলে উল্লেখ করেছেন। জাতীয় জীবনে কোন সত্য বা জ্ঞান যতক্ষণ দৃঢ়ভাবে অনুপ্রবেশ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্য বা জ্ঞান দ্বারা জাতির কোন উপকার হয় না। কুরআন একেই মা'রুফ বলে ব্যাখ্যা করেছে।

আমাদের মধ্যে বিচক্ষণ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ উচ্চ চিন্তা ও গবেষণাকে সহসা আয়ত্ত করে ফেলেন; কিন্তু তা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে পৌছে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। এর কারণ উচ্চ চিন্তাকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার উপযোগী শিক্ষা তাঁদের নেই। তাঁদের সমস্ত সাধনা ও গবেষণা তাঁদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এমন কি তাঁদের পরবর্তী বংশধরেরাও তাঁদের মত ও পথের সমর্থন করে না। সত্য এই যে, মুজাদ্দিদে আল্ফে সানীর পরে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ অন্যতম প্রধান মুজাদ্দিদ। তাঁর অনুসরণকারীদের একটি শ্রেণীর মধ্যে তিনি তাঁর

আল্লাহ্‌র কুদরতে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আবূ ইউসূফের ঘটনার অবিকল আর একটি ঘটনা দিল্লীর ইতিহাসে পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। ইমাম আবদুল আযীয তাঁর পিতা ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের ফিকাহ, তাসাউফ দর্শন এবং রাজনৈতিক মতামত যদি সাধারণ শ্রেণী পর্যন্ত না পৌঁছাতেন, তবে আজ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে চেনা সহজসাধ্য হতো না এবং উপমহাদেশের মুসলিমরা এ অপূর্ব সম্পদ থেকে চিরদিনের জন্যই বঞ্চিত থেকে যেত।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারার সংগে শিক্ষিত সমাজকে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে শাহ্ আবদুল আযীয সর্বাগ্রে গ্রন্থ রচনার কাজ শুরু করেছিলেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত তফসীর-ই-ফত্হুর রহমান সাধারণের বোধগম্য করার উদ্দেশ্যে শাহ্ আবদুল আযীয তফসীর-ই-আযীযী প্রণয়ন করেন। তফসীরে ফতহুল্ আযীয অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য তফসীর। কিন্তু 'ফতহুর রহমান' বোঝার উদ্দেশ্য নিয়ে লোকে এ তফসীরখানা পাঠ করে না। এ কারণেই শাহ্ আবদুল আযীয কর্তৃক কুরআন অনুধাবন করার জন্য তৎকৃত 'ফওযুল কবীরে' যে নীতি নির্দেশ করেছেন, তদনুসারে কুরআন অনুধাবন করার চেষ্টার প্রায় বিলোপ ঘটেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শাহ্ সাহেব 'হুরূফে মুকাত্তায়াত'-এর যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা বোঝা খুবই কঠিন। কিন্তু তফসীর-ই- ফতহুল আযীযে আলিফ, লাম, মীম-এর ব্যাখ্যা পাঠে তা বোধগম্য করা সহজ হয়ে পড়ে। তফসীর-ই-ফতহুল আযীযে এমন অনেক কথার উল্লেখ রয়েছে যেগুলি

শিক্ষা বিস্তার করে গিয়েছিলেন। এঁরাই শাহ্ সাহেবের শিক্ষা-দীক্ষা সাধারণ স্তরে পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য মনে করেছেন। আমাদের আহ্‌লে হাদীস ভ্রাতারা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার জটিল উক্তিগুলির উদ্ধৃতি পেশ করেন; কিন্তু তাঁরা চিন্তা করে দেখেন না উপমহাদেশের সাধারণ স্তরের লোকেরা এই সূক্ষ্ম চিন্তাধারা অনায়াসে গ্রহণ করতে সক্ষম কিনা। মূলত সূক্ষ্ম জ্ঞান ও চিন্তা গ্রহণের পক্ষে আরব বোধশক্তি অনুকূল। আহ্‌লে হাদীসরা বিরাট শ্রম স্বীকারে ছোট ছোট মসজিদ অবশ্য গড়েছেন এবং তাঁরা এই বলে নিজেদের সান্ত্বনা দেন যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী বলে তাঁদের আন্দোলন সার্থক হচ্ছে না। তাঁদের উচিত, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দর্শন পাঠ করা। এর পরে তাঁরা উপমহাদেশের হানফী মযহাব অবলম্বী মধ্যবিত্ত সমাজকে উত্ত্যক্ত করা আপনা থেকেই ছেড়ে দিবেন। এ হচ্ছে ইমাম আবদুল আযীযের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যতদিন তাঁর অনুসরণকারীরা তা মেনে চলবেন, ততদিন তাঁদের সফলতা নিশ্চিত।

সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় এবং সেগুলির প্রতি সমর্থনও তাদের রয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, তাঁর বহু কথাই হাদীস শাস্ত্রীয় পরীক্ষায় প্রমাণিত বলে উত্তীর্ণ হয় না। কিন্তু হাদীসের সত্যাসত্য বিচারের বিতন্ডায় যোগ দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর অবতারণা করেন নি। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তাধারা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। অপ্রামাণ্য যে সমস্ত হাদীসের উল্লেখ তিনি 'ফতহুল আযীযে' করেছেন, সেগুলি তিনি রসূলুল্লাহ্র উক্তি বলে প্রমাণ করতে চান নি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যে সব হাদীস জনসাধারণ স্বীকার করে নিয়েছে সেগুলো বিধৃত করা।

শিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর এবং তাঁদের খিলাফতের প্রতি যেসব অভিযোগ করা হয়েছিল, সেগুলির প্রতিবাদে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইযালাতুল খিফা' প্রণয়ন করেন। শাহ্ আবদুল আযীয তাঁর ভূমিকাস্বরূপ 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া' লিখেছিলেন। ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁরা কুরআনের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধারের জন্য ইমাম মাহদীর আবির্ভাব অপরিহার্য বলে প্রচার করে বেড়াতো। তারা ইমাম মাহ্দীর আগমন ব্যাপারে অদ্ভুত সব কাহিনী সৃষ্টি করেছিল। শিয়াদের এই প্রচারের ফলে মুসলমানরা কুরআনের ব্যাপক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এ দিকে 'ইসনা আশারিয়া' দল ইমাম আবদুল আযীযের যুগে উত্তর ভারতে তাদের ঘাঁটি[৩৫] প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের প্রচারের সংক্রমণ থেকে মুসলিম জনসাধারণকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই ইমাম আবদুল আযীয 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া' লিখেছিলেন। 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া' লোকেরা লুফে নিয়েছিল এবং খুব আগ্রহ সহকারে পাঠও করেছিল। কিন্তু সে পুস্তকের মাধ্যমে লোকে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ কৃত 'ইযালাতুল্ খিফা' বুঝতে চেষ্টা করেনি; সুতরাং তুহফা লেখার আসল যে উদ্দেশ্য ছিল তা পুরোপুরি সফল হয়নি।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইউরোপের খৃষ্টান জাতিগুলি যারা এখন পুরোপুরি জড়বাদী হয়ে পড়েছে, তারা কুরআনকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও তার জ্ঞান ও

---

৩৫. ২২ নং পরিশিষ্ট দ্রঃ।

শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুসলমানদের বেলায় দেখা যাচ্ছে তার বিপরীত অর্থাৎ তারা কুরআনের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখা সত্ত্বেও ইহুদীদের ন্যায় শুধু শব্দের আবৃত্তিকেই যথেষ্ট মনে করে থাকে। এ কারণেই মুসলমানদের সামনে কুরআন–ভিত্তিক কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ছিল না। তারা শিয়াদের ন্যায় কোন বড় নেতার আবির্ভাবের পথ চেয়ে বসেছিল। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিক্ষা এবং নীতি মুসলমানদের এই ব্যাধির মূলোৎপাটন করেছিল।

ইসলামী শিক্ষার জন্য তিনি ইমাম মালেককৃত 'মুয়াত্তা'র প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর অসীয়তনামায় উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াজিদ বিন্ ইয়াহিয়ার সূত্রে বর্ণিত 'মুয়াত্তা' অবশ্যই পাঠ করা চাই এবং সে বিষয় যেন অবহেলা না করা হয়। এটিই হচ্ছে হাদীসের মূলগ্রন্থ এবং ভিত্তি। হাদীসের এ গ্রন্থ পাঠের পরেই কুরআন পাঠ করা উচিত। তাঁর মতে তরজমা এবং ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মন নিয়ে কুরআন পাঠ করা উচিত। বাক্য প্রকরণ এবং আয়াতের শানে নযূলগুলির প্রতিও লক্ষ্য করা কর্তব্য। এভাবে কুরআন পাঠ সমাপ্তির পরে তফসীর–ই–জালাইন পাঠ করা কর্তব্য। কুরআন শিক্ষার এ নীতি খুবই ফলপ্রসূ।

মোট কথা, ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইমাম মালেক কর্তৃক সংকলিত মুয়াত্তার গুরুত্ব অত্যধিক। তিনি সেই গ্রন্থ নিজ রুচিমতো সুসংবদ্ধও করেছিলেন। তিনি তার নাম করেছিলেন 'আল মুসতাবী মিনাল্ মুয়াত্তা'। হাদীস এবং ফিকাহ শিক্ষার জন্য ইমাম আবদুল আযীয তাঁর পিতার নিকট এ কিতাব পাঠ করেছিলেন।

তাঁদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য কুরআন পাঠের পরে এ পুস্তকখানিকে বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এভাবে তিনি সমকালীন আলিমদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক সংকলিত 'আল্ মুস্তাবী' মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে হানফী ফিকাহ্ দর্শনে সহজেই ব্যুৎপত্তি[৩৬] অর্জন করা সম্ভবপর হয়। মুয়াত্তা এভাবে অধ্যয়ন করার সুফল দেখা গিয়েছিল। আমি বিদেশ ভ্রমণকালে

---

৩৬. ব্যুৎপত্তি অর্থে যোগনির্ভর 'মুজতাহিদ' যেমন ইবনুল হুমান প্রভৃতি।

ইসলামী দেশসমূহে শায়খুল হিন্দ এবং তাঁর ওস্তাদদের চেয়ে ইসলামী জ্ঞানে অধিকতর অভিজ্ঞ লোক বড়ো দেখতে পাই নি। আমি হরমের আলিমদেরকে শাহ্ সাহেব কৃত 'আল মুসতাবী' শিক্ষা দিয়েছি। তাঁরা তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছিলেন। সেখানকার মুদ্রণালয়ে এ গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন এবং তাঁদের মাদ্রাসার পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেছিলেন। স্মরণীয় যে, হযরত মওলানা শায়খুল হিন্দ বহু দিন পূর্বে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ কৃত গ্রন্থাবলী দেওবন্দ মাদ্রাসার সর্বোচ্চ মানে পাঠ্য করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, আজো তা কার্যে পরিণত হয়নি।

শিক্ষা সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর বংশধরদের জন্য কোরেশদের ভাষা এবং কোরেশীয় পারিবারিক এবং সামাজিক আচার–আকিদাকে শিক্ষণীয় বিষয় বলে নির্ধারিত করেছিলেন। এ প্রসংগে তিনি তাঁর অসীয়তনামায় উল্লেখ করেছেন– 'আমরা স্বদেশ–হারা। আমাদের পিতা–পিতামহ বাইরে থেকে এখানে এসে বসবাস করেছেন। আমাদের জন্য আরব পরিচয় এবং আরবী ভাষাই গৌরবের বস্তু। কেননা, এ দুটো জিনিসই আমাদেরকে হযরত (সা)–এর সান্নিধ্যে পৌঁছায়। প্রাথমিক যুগের আরব মুসলিমদের বিশিষ্ট চরিত্র এবং রীতিনীতি গ্রহণ এবং উপমহাদেশীয় অমুসলিমদের আচার–অনুষ্ঠান বর্জন দ্বারাই কেবল এ মহান সৌভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব। বস্তুত হযরত (সা)–এর উদ্দেশ্যও ছিল তাই।'

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগায় রোম এবং পারস্য সম্রাটদের বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)–র নীতি এবং আদর্শই সে বিলাসিতা ও অনাচার উচ্ছেদ করেছিল। এজন্যই তিনি তাঁর বংশধরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, কুরআনের বিপ্লব পুনর্বার আনয়নের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সংগী–সাথীদের জীবনযাত্রা প্রণালী এবং তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম আবদুল আযীয তাঁর পিতা মরহুমের উপদেশ অনুযায়ী তৎকালীন পুঁজিবাদী এবং স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদী অভিশাপের মুখোশ এমনভাবে খুলে ধরেন যে, সমাজের উচ্চস্তরে যাঁরা সৎপ্রকৃতির ছিলেন, তাঁরা অনায়াসে তার কুফল

সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছিলেন। জাহাংগীর এবং শাহ্‌জাহানের সমৃদ্ধির কাল থেকে চলে–আসা বিলাসিতা এবং অনাচার থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য ইমাম আবদুল আযীয কর্তৃক শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত তরুণ দল উঠেপড়ে লেগেছিল। অবশ্য তখন রাজত্ব এবং সমৃদ্ধি কোনটাই অবশিষ্ট ছিল না। চারদিকে অভাব ও দারিদ্র্য। ফলে, অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মনোবল ভেংগে গিয়েছিল।[৩৭] এ সময় শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ যুবক শ্রেণী অদম্য উৎসাহে কাজে নেমেছিলেন। নতুন চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত পরিবারগুলির মহিলারাও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাদের ত্যাগের ফলেই হাজার হাজার মুজাহিদ দশ বছর ধরে শুধু রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন, তবু তাঁরা কোন কারূন ও ফেরাউনের সামনে মাথা নত করেন নি।[৩৮] তখন ধনীশ্রেণীর অবস্থা ছিল শোচনীয়। এ সমাজের দুশ্চরিত্র যুবকগণ নারীর পিছনে সমস্ত ধন উজাড় করে দিত। পরবর্তীকালে সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে বিলাস ও ঐশ্বর্যের

---

৩৭. জীবিকার চিন্তায় লোক সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকলে তাদের মস্তিষ্ক কখনো উচ্চ চিন্তা গবেষণার জন্য অবকাশ পায় না। এতে মনোবল আপনা আপনি ভেংগে পড়ে। সুতরাং সমাজের আর্থিক সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা উন্নতির পথ রুদ্ধ দেখতে পায়। তারা সমাজ পরিত্যাগও করতে পারে না এবং তাদের চিন্তা থেকে মুহূর্তের জন্যও তারা মুক্তি পায় না।

৩৮. শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আন্দোলনের প্রচারকগণ মসজিদে মসজিদে প্রচার করে বেড়াতেন। ভক্ত পরিবারের মহিলারা তাঁদের অলংকার এ উদ্দেশ্যে দান করে দিতেন। এ সম্পর্কে 'সাওয়ানেহে আহমদিয়া'য় মাদ্রাজের খানে আলমের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। আমি একান্ত রিক্তহস্তে দিল্লীতে পৌঁছি। মওলানা শায়খুল হিন্দের নির্দেশে রিক্তহস্তে আন্দোলনের কাজে যোগদান করি। ঢাকার সভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের নিকট থেকে আমার কাছে সাহায্যের জন্য টাকা আসতো। তার পরে নওয়াব সুলতান জাহাঁ বেগম কর্তৃক মাসিক দুশ টাকা সাহায্য লাভ করে দিল্লীতে স্থায়ী হয়ে বসার সুযোগ লাভ করি। তারও পূর্বে আমি ১৩১০ সনে সিন্ধুতে যখন মওলানা শায়খুল হিন্দের নির্দেশে কাজ শুরু করি, তখন পীর সহিবুল ইসলামের পরিবারের মহিলারা তাঁদের সোনার হার পর্যন্ত দান করেছিলেন। সে ছাড়া কাবুল হিজরতের সময় শায়খ আবদুর রহীম সিন্ধীর স্ত্রী এবং তাঁর কন্যারা তাঁদের সোনার হারগুলি পাঠিয়ে দিয়ে আমার পথ খরচের সংস্থান করেছিলেন। এবং কোয়েটা পর্যন্ত পৌঁছে নগদ টাকা আমার হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন।

কোলে প্রতিপালিত অভিজাত পরিবারের নওজোয়ানেরাও সিন্ধুর পথে কাবুল এবং কান্দাহার হয়ে পেশওয়ার পৌছেছিলেন। দুর্গম পর্বত ও অরণ্য পথে জিহাদ করতে এবং শহীদ হতে তাঁরা প্রস্তুত হয়েছিলেন, তার পশ্চাতে ছিল ইমাম আবদুল আযীযের শিক্ষা এবং সংগঠন।

সে সব শিক্ষিত নওজোয়ানের মধ্যে মওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী ছিলেন অন্যতম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১২০৫ হিজরীতে। তিনি মরহুম ফতেহ্ আলী সাহেবের পুত্র এবং রফীউদ্দীন হোসাইন খান সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন বিহার প্রদেশের নেজাম এবং রইস। মাতামহের খুবই আদরের ছিলেন তিনি। রেশমী জড়োয়া অথবা ঢাকাই জামদানী সদাসর্বদা ব্যবহার করতেন। আতর প্রভৃতি নানা সুগন্ধি লাগাতেন। সোনার আংটি এবং সল্লা ধারণ করতেন। লক্ষ্ণৌর সৌখিন বিলাসী যুবকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এই সৌখিন বিলাসী নওজোয়ান যখন মওলানা সৈয়দ আহ্মদ শহীদের দরবারে হাজির হলেন তখন রসূলুল্লাহ্‌র সাহাবী মাস্‌আব বিন্ ওমাইরের মতোই সহসা তাঁর ভিতর আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। লক্ষ্ণৌর সে বিলাসপ্রিয় সৌখিন যুবককে আর তাঁর ভিতরে খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি হয়ে উঠলেন এক কষ্টসহিষ্ণু পরিশ্রমী যুবক এবং শাহ্ সৈয়দ আহদম শহীদের দরবারের একজন সাধারণ খাদেম। সৈয়দ আহমদ শহীদের কাছে যাঁরা হাদীস শিক্ষা করতেন, তাঁরা জংগল থেকে কাঠ কুড়িয়ে মাথায় বহন্ করে আনতেন। নিজ হাতে খানা পাকাতেন এবং মাটি ছানার কাজ[৩১] করতেন।

আন্দোলন কার্যকরী করার জন্য ইমাম আবদুল আযীয এ সব দীক্ষিত যুবকদের দ্বারা একটি কেন্দ্রীয় পরিষদও গঠন করেছিলেন এবং তাঁর তিন ভ্রাতা মওলানা রফীউদ্দীন, মওলানা আবদুল কাদির এবং মওলানা আবদুল গনীকে প্রথমেই এই পরিষদভুক্ত করেছিলেন। সবার কনিষ্ঠ মওলানা আবদুল গনী আগেই মারা গিয়েছিলেন। এজন্য দিল্লীতে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করতে পারেন নি। দিল্লীর অধিবাসীরা ইমাম আবদুল আযীয এবং তাঁর দুই ভাইকে উদ্দেশ করেই ‘হযরাতে সালাসাহ’ বা হযরতত্রয় বলতেন। এভাবে গঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের

---

৩১. সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ--পৃঃ ৪১৫।

জোয়ানদের দ্বারা আর একটি পরিষদ গঠিত হয়েছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষক তিন-চার জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা ছিলেন মওলানা ইসমাঈল শহীদ, মওলানা আবদুল গনীর পুত্র মওলানা আবদুল হাই দেহলবী, মওলানা নূরুল্লাহ্‌র পৌত্র মওলানা আবদুল আযীযের জামাতা মওলানা মুহম্মদ ইসহাক এবং মওলানা আবদুল আযীযের পৌত্র মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব দেহবলী (মৃত্যু ১২৮২ হিঃ)। তিনি ছিলেন মওলানা মহম্মদ ইসহাকের ভাই। মওলানা সৈয়দ আহমদ শহীদ এই দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। বিশিষ্টদের সংগঠন এভাবে তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ইমাম আবদুল আযীয জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন ব্যাপক করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতি সপ্তাহে দুটি জনসভায় বক্তৃতা করতেন। জীবনের শেষ অবধি তিনি এ কাজ করে গেছেন। প্রতি সপ্তাহের মংগলবার এবং জুমার দিন দিল্লীর কুচাচিলান মাদ্রাসায় ওয়ায মহফিলের অনুষ্ঠান হতো। সভায় সম্ভ্রান্ত, বিশিষ্ট এবং সাধারণ লোক সকলেই দলে দলে যোগদান করতো। মওলানার বর্ণনাভংগী ছিল এমন চমৎকার যে, দলমত নির্বিশেষে সকলেই সভা থেকে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরতো। কেউ মনঃক্ষুন্ন হয়ে ফিরতো না। এ মহফিল অনুষ্ঠানের নিয়মও এমন নিষ্ঠার সাথে তিনি পালন করতেন যে, গুরুতর রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও মহফিলের নির্দিষ্ট তারিখে তাঁকে শয্যা থেকে তুলে দিতে বলতেন এবং ওয়ায শুরু করার সংগে সংগে সাহায্যকারীদের দূরে সরে থাকার নির্দেশ দিতেন। তিনি স্বচ্ছন্দে ওয়ায করে যেতেন। রোগজনিত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও দৃঢ়তা এবং স্থিরতার কোন অভাব দেখা যেতো না তাঁর মধ্যে।

ইমাম আবদুল আযীযের এই নিয়মিত বক্তৃতায় জনসাধারণের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তারা সজাগ হয়। বক্তৃতার মাধ্যমে জনমতকে কিভাবে সংগঠিত করা যায়, বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা তা দেখতে পায়। এভাবে শিক্ষা এবং দীক্ষা গ্রহণ করার পর বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা উপমহাদেশের সর্বত্র এই আন্দোলনের মর্মকথা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েন। সে যুগেরই একজন বিশিষ্ট আলিম[৪০] সারা উপমহাদেশ ভ্রমণ করেও এমন একজন আলিমের সাক্ষাৎ পাননি, যিনি ইমাম আবদুল আযীযের শিষ্য ছিলেন না।

---

৪০. ইনি উপমহাদেশের বাইরের আলিম ছিলেন। নাম স্মরণ নাই। (মওলানা নূরুল হক উলূবী)

ওয়ায এবং বক্তৃতার এই সাধারণ ব্যবস্থার সংগে সংগে ইমাম আবদুল আযীয কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় উভয় পরিষদের সদস্যগণ তাঁরই নির্ধারিত নীতি এবং আদর্শের ভিত্তিতে উচ্চ এবং সাধারণ শ্রেণীকে সচেতন এবং সংগঠিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেছিলেন। বিশিষ্ট লোকদের জন্য মওলানা রফীউদ্দীন 'আসরারুল মুহাব্বত'[৪১] এবং 'তাকমীলুল্ আযহান' প্রণয়ন করেছিলেন। এছাড়াও ছোট ছোট অনেক পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। সেগুলি মূলত সবই ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাধারার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল। তিনি 'হামালাতুল্ আরশ' নামে একখানা উন্নত ধরনের এবং তথ্যপূর্ণ রিসালা রচনা করেছিলেন। ইমাম আবদুল আযীয সে রিসালাখানা পুরোপুরিই তার তফসীরে উদ্ধৃত করেছিলেন। সূরা-ই-নূরের ব্যাখ্যায় মওলানা রফীউদ্দীন সাহেবের একখানা রিসালা আছে--যার তুলনা নেই।

ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের দর্শনের সূক্ষ্ম রহস্য শিক্ষিতগণের কাছে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে শাহ্ ইসমাঈল শহীদ 'আবকাত' নামে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সে পুস্তকে তিনি প্রসংগক্রমে শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনুল্ আরাবী (মৃত্যু ৬৩৮ হিঃ) এবং ইমাম রব্বানী শায়খ আহমদ সারহিন্দীর (মৃত্যু ১০৪৪ হিঃ) গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শাহ্ সাহেবের দর্শনের সাথে তুলনা করেছেন এবং তাঁর গবেষণার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। মওলানা রফীউদ্দীন জনসাধারণের জন্য কুরআনের হিন্দী[৪২] তরজমাও করেছিলেন। তারই ফলে দিল্লীর জনসাধারণ ইমাম আবদুল আযীযের বক্তৃতা অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাছাড়া মওলানা শাহ আবদুল কাদিরও কুরআনের পারিভাষিক তরজমা করেছিলেন। 'তফসীর-ই-মুজেহুল কুরআনে' তাঁর ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত অনুসন্ধিৎসু আলিমদের জন্য বিশেষ সহায়ক। মওলানা আবদুল হাই সাহেব 'লুগাতুল্ কুরআন' লিখেছিলেন। মওলানা ইসমাঈল শহীদ আরবীতে লিখিত 'ইশরাক' নামক কিতাবের তরজমা করেছিলেন 'তাক্‌ভিয়াতুল্ ঈমান'[৪৩] নাম

---

৪১. ২৩ নং পরিশিষ্ট দ্রঃ।

৪২. তখন উর্দু ভাষার উর্দু নামকরণ হয়নি। সে ভাষা তখন হিন্দী নামেই পরিচিত ছিল।

৪৩. অর্থাৎ তখনো উপমহাদেশের মুসলমানরা শির্‌ক বেদআতের প্রভাবমুক্ত ছিল। প্রাচীন উপমহাদেশের ধর্মীয় মতামত হানফী দর্শনের অনেকটা কাছাকাছি ছিল। সরল প্রকৃতির যে

দিয়ে। এই গ্রন্থ পাঁচশ বছর পূর্বে লেখা হলে উপমহাদেশের মুসলমানরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুসলমানদের তুলনায় অনেক দূর অগ্রসর হতে পারতো। এ ছাড়া মওলানা মুহম্মদ ইসহাক 'মিশকাতে হাদীস' গ্রন্থের তরজমা হিন্দীতে করেছিলেন।

ইমাম আবদুল আযীযের জ্ঞান ও গবেষণা উপমহাদেশ অতিক্রম করে হিজায ভূমিতে এবং সেখান থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত পৌছেছিল। সম্ভবত শায়খ খালেদ কুর্দীর[৪৪] মধ্যস্থতায় তা সম্ভব হয়েছিল। শায়খ খালেদ কুর্দী মওলানা গোলাম আলীর সান্নিধ্যে থেকে তরীকার 'সুলক' সমাপ্ত করেছিলেন এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদের মধ্যস্থতায় মওলানা আবদুল আযীযের সাথে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ অর্জন করেছিলেন। শায়খ খালেদ কুর্দীর একটি বিখ্যাত কসিদায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খোরাসানের আলিমদের দরবারে হাজির হয়েছিলেন, কিন্তু প্রাণে শান্তি খুঁজে পেলেন না। সেখান থেকে তিনি দিল্লীতে শায়খ গোলাম আলীর সান্নিধ্যে চলে আসতে ইচ্ছা করলেন। খোরাসানী আলিমরা তাতে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের নিষেধ অমান্য করেই দিল্লীতে চলে এসেছিলেন; সে কবিতারই দু'টি পংক্তি এই ঃ

بدهای ظلمت کفر بست گفتند   بدل گفتم
بظلمت روا گر در جستجوی اب حیوانی

কোন উপমহাদেশীয় এ দর্শনের সংস্পর্শে আসলে তারা ইসলামের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যেতো। বাগদাদ থেকে যখন ইসলামী শিক্ষা খুরাসানে বিস্তার লাভ করেছিল তখন তারা 'তশবীহ' এবং 'তজসীম'-এর বিতর্কে এমনভাবে ফেঁসে গিয়েছিল যে, ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে তারা পিছিয়ে থাকল। উপমহাদেশীয়রা পূর্ব থেকে 'তজল্লী-ই-ইলাহীর' দর্শন সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। হানফী দর্শনেও জ্ঞান ও মারেফতে এই 'তজল্লী-ই-ইলাহীর' সাহায্যেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে অথচ খুরাসানী আলিমরা তজল্লী-ই-ইলাহীর বিষয় বুঝতে না পেরে ইসলামকে অনেক পশ্চাতে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তজল্লী-ই-ইলাহীর কোন একটা ব্যাখ্যা না করে দেওয়া পর্যন্ত কুরআন তাদের রুচির সাথে খাপ খায় না। সুফিয়ায়ে কেরাম এই জটিলতা দূর করার জন্য নিঃসন্দেহে চেষ্টা করেছেন ; কিন্তু তাঁরা বর্ণনাকুশলী ছিলেন না বলে আলিমরা তাঁদের কাছ থেকে বেশী উপকৃত হতে পারেন নি। তাঁরা অবশ্য হালপ্রাপ্ত বটেন। যে কেউ তাঁদের সংস্রবে গমন করে, সেই তাঁদের রঙ্গে অনুরঞ্জিত হয়।

শাহ্ ইসমাঈল শহীদ প্রসঙ্গে 'আত্ তাহমীদ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে--'আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি শাহ্ সাহেব কৃত 'তাক্ভিয়াতুল ঈমান' পাঠ করেছিলাম। শির্ক্ উচ্ছেদের ব্যাপারে এই কিতাব আমার বড় অবলম্বন ছিল, বরং এক হিসাবে এই কিতাবই আমার ইসলাম গ্রহণের

'তারা বল্লো দিল্লী কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, আমি মনে মনে বল্লাম, আব্ হায়াতের অনুসন্ধানে সেই অন্ধকারেই প্রবেশ কর।'

খালেদ কুর্দীর আধ্যাত্মিক ওস্তাদ শায়খ গোলাম আলীও ইমাম আবদুল আযীযের শাগরেদ ছিলেন। ইস্তাম্বুলের আলিম সমাজ মওলানা আবদুল আযীযকে এই মর্মে আমন্ত্রণ[৪৫] জানিয়েছিলেন যে, তিনি আস্তানায় তশরীফ নিলে সেখানকার আলিম সমাজ তাঁর নেতৃত্বের অধীনে কাজ করবেন। কিন্তু ইমাম আবদুল আযীয উপমহাদেশে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও যাওয়া পছন্দ করেননি।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা এবং আন্দোলনকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য যে জমাত গঠন করেছিলেন, তার একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। সে বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে ইমাম আবদুল আযীয এবং তাঁর সহচরদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত। আন্দোলন সম্পর্কে আরবীতে খুব কমই লেখা হয়েছে। 'ফারসী'[৪৬] এবং হিন্দীতেই সে সব গ্রন্থের বেশীর ভাগ লিখিত হয়েছে। আরবী ছিল মুসলিম জাহানের সাধারণ ভাষা; অথচ আন্দোলনের পুস্তকাবলী সে ভাষায় লিখিত না হওয়ার ফলে আরব ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশে তার বেশী প্রচার হতে পারে নি।

এ প্রসঙ্গে এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ এবং ইমাম আবদুল আযীযের যুগে বহির্বিশ্বে যে সমস্ত ইসলামী আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল– ইরানে বাবী আন্দোলন, নজদে ওহাবী আন্দোলন এবং ইয়ামনে যায়েদী আন্দোলন–সেগুলির প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ভূমিকা এবং কর্মসূচী ছিল। এর কোনটির সাথেই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনের যোগাযোগ ছিল না এবং

উপলক্ষ। মোট কথা, শাহ ইসমাঈল শহীদ সাহেব একাধারে আমার ইমাম এবং ওস্তাদ। তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা রয়েছে। সে শ্রদ্ধা কেবল নিজ মযহাবের ইমামদের প্রতিই প্রযোজ্য।'

৪৪. ২৪ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৫. আমন্ত্রণের বর্ণনাটি দেওবন্দের শায়খগণের মধ্যে মৌখিকভাবে ক্রমপরম্পরায় চলে এসেছে। বলা হয় যে, মওলানা রহমতুল্লাহ্ মুহাজির মক্কীর ইস্তাম্বুলের সাথে যোগাযোগ ছিল, তাকে আমন্ত্রণের বেলায় তাদের উক্তি ছিল 'আমরা আপনার জুতা বহন করাকে গৌরব বলে মনে করবো।'

৪৬. ভারতীয় ফারসীতে ; ইরানী ফারসীতে নয়।

কর্মপন্থারও মিল ছিল না। বিশেষ করে বাবী আন্দোলনের সাথে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনের কোনরূপ সাদৃশ্য অথবা যোগাযোগ কল্পনাই করা যায় না। কেননা বাবী আন্দোলন ছিল ইরানী শিয়াদের আন্দোলন। তার বিপরীত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনের মূলনীতি ও আদর্শ ছিল সমাজের উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোককে শিয়াদের ভ্রান্ত মতামতের প্রভাব থেকে রক্ষা করা। অবশ্য নজদের আন্দোলনের কোন কোন বিষয়ের সঙ্গে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনের সাদৃশ্য ছিল। স্থূলদর্শীরা এ-জন্যই এ দুটোকে অভিন্ন বলে মনে করে থাকেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার (মৃত্যু ৭২৮ হিঃ) অনুসারীদের মধ্যে মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহাব নজদী[৪৭] ১১১৫ হিজরীতে আরবের নজ্দ্ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তওহীদের বাণী প্রচার করেছিলেন। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ও ঠিক তেমনি তওহীদ প্রচার করেছিলেন। উভয়ের কাছেই ইবনে তাইমিয়ার মর্যাদা সমানভাবে স্বীকৃত

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ হিজায ভ্রমণকালে শায়খ ইবরাহীম কুর্দী মদনীর কুতুবখানায় শায়খুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়ার গ্রন্থাবলী পাঠ করে অবশ্যই অনেক কিছু জানতে পেরেছিলেন। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ কৃত 'ইযালাতুল খিফায়' এমন কতকগুলি মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ আছে[৪৮] যেগুলি নিঃসন্দেহে ইমাম

---

৪৭. ২৫ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৮. হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফত পূর্ববর্তীকালে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র মতে, সাহাবাদের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না। অবশ্য যে সামান্য মতভেদের কথা উল্লেখ আছে তা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর মতভেদ হয়েছে, এমন কখনো ঘটে নি। তাঁরা কোন বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে উঠতেন না। এ বিষয় শাহ সাহেব 'ইযালাতুল খিফায়' খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি খুবই বুনিয়াদী এবং তত্ত্বপূর্ণ। শায়খুল ইসলাম তাঁর মিনহাজে এ বিষয় খুব কমই লিখেছেন ; তবু তাঁর স্বীকৃতি না দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্কে মর্যাদা দানের কারণ এই নয় যে, তিনি অনেক মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। আসল কথা এই যে, তিনি ছিলেন সমস্ত কৃত্রিমতার উর্ধ্বে। সহজেই তিনি প্রাচীন আলিমদের মতামত অনুধাবন করতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই তিনি শায়খ-ই আকবর মুহিউদ্দীন ইবনুল্ আরবী এবং শায়খুল্ ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার দর্শন সমানভাবে গ্রহণ করতেন।

ইব্নে তাইমিয়া প্রণীত 'মিন্হাজুস্ সুন্নাহ' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আসল কথা এই যে, হিজাযে অবস্থানকালে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ শাহ আবূ তাহির থেকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য গ্রহণ করেন।

শাহ্ আবূ তাহির বাগ্দাদ, সিরিয়া, মিসর এবং মক্কা-মদীনা পরিভ্রমণ করেছেন এবং আল-কাশ্শানীর সংস্রব লাভ করেছিলেন। তাঁর জবানীতে তিনি হাদীস্ও রিওয়ায়েত করেছেন। শেখ আবূ তাহির ফারসী, কুর্দী, তুর্কী এবং আরবী ভাষা সমানে বলতে পারতেন। তাঁর মজলিসের জাঁকজমক এবং প্রাণচাঞ্চল্য ছিল অতুলনীয়। তিনি দার্শনিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার চাইতে আধ্যাত্মিক সূফীদের প্রজ্ঞাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন। তিনি মনে করতেন যে, দার্শনিকরা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম, কিন্তু সত্য উপলব্ধি থেকে তারা বঞ্চিত। তাঁর মৃত্যু তারিখ ঃ

انا على فراقك ابراهيم لمحزو نون

এই আরবী বাক্যের সংখ্যা সংকেতের দ্বারা জানা যায়। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর ওস্তাদ শায়খ আবূ তাহিরের নিকট থেকে যে শিক্ষা পান কতকটা তার ফলে এবং শায়খ ইবরাহীমের আনুগত্য লক্ষ্য করে শায়খুল ইসলাম ইব্নে তাইমিয়ার শায়খ-ই-আকবর মুহীউদ্দীন ইবনে আরবীর প্রতি সমান শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তাঁদের উভয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করতেন। তিনি তাঁদের সংগে ইমাম রব্বানী শায়খ আহমদ সারহিন্দীকেও শামিল করতেন। ইমাম রব্বানী শায়খ আহমদ সারহিন্দীর কোন কোন বর্ণনায় বেশ দুর্বোধ্যতা বিদ্যমান। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর বক্তব্যের মর্ম অনুধাবন করা যায়।

একটু পূর্বেই আমি লিখেছি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আরবের নজদী আন্দোলনের সাথে শাহ্ সাহেবের আন্দোলনের সাদৃশ্য ছিল। শাহ্ ইসমাঈল শহীদের 'তাক্ভিয়াতুল ঈমান' তার একটি দৃষ্টান্ত। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগা' থেকেই এ গ্রন্থের উপাদান গৃহীত; কিন্তু কোন কোন স্থানে আবদুল ওহ্হাব নজদীর 'আত্ তাওহীদ' গ্রন্থের অনুরূপ কথাই লিখিত হয়েছে। এ উপকরণের উপর নির্ভর করেই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রবর্তিত

আন্দোলনের বিরোধী দল উভয় আন্দোলনকে অভিন্ন প্রমাণ করার জন্য অতি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ চিন্তাধারার মূলনীতি এবং সূচনার দিকটা পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়, উভয়ের আন্দোলন ঠিক এক নয়। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র চিন্তাধারা এবং দর্শন আবর্তিত হচ্ছে 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ'কে কেন্দ্র করে। তবে তাঁর এ দর্শন ইমাম রব্বানী শায়খ আহমদ সারহিন্দীর 'ওয়াহদাতুশ্ শহুদে'র সাথে সামঞ্জস্যশীল। অপর পক্ষে রয়েছেন শায়খুল ইসলাম ইব্নে তাইমিয়া। তিনি 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' সমর্থনকারীদের যে কতটা বিরোধী তা দুনিয়ার অজানা নেই। সুতরাং দুটি আন্দোলনের মূলনীতিতে এতটা পরস্পর-বিরুদ্ধতা থাকার পর কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য সাদৃশ্যের কারণে তা অভিন্ন বলা যায় না।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং নজদী আন্দোলনের মধ্যে বৈশাদৃশ্যের[৪৯] আর একটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন। মওলানা ইসমাঈল শহীদ 'তাকভিয়াতুল ঈমান'-এ তাওয়াস্সুল্ ফিদ্দোয়া (কারো মাধ্যমে প্রার্থনা জানান) বৈধ বলে স্বীকার করেছেন এবং লঘু শিরক্কারীকে কাফের বলে স্বীকার করেন নি–যদিও তিনি তাকে ক্ষমার যোগ্য বলে মনে করেন না। তাক্ভিয়াতুল ঈমানের এ দুটো মৌলিক বিষয় আবদুল ওহ্হাব নজদীকৃত 'আত্ তাওহীদের' বিপরীত। শাহ ইসমাঈল শহীদের উপরোক্ত মতের অনুসারীদেরকে ওহাবীরা ক্ষমার যোগ্য বলে মনে করেন না। এ অবস্থায় উভয় আন্দোলনকে এক মনে করা, স্থূলভাবে দেখা এবং তলিয়ে না দেখারই পরিণাম।

আরবে আর একটি আন্দোলন দেখা দিয়েছিল ইয়ামনে। এ আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন ইমাম শওকানী[৫০] নামে এক সুপন্ডিত মুহাদ্দিস। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র মতবাদের অনুসারী কোন কোন দল ইমাম শওকানীর অনুসরণ করে থাকেন। তাঁদের মতে সুন্নাহ্র প্রতি আনুগত্যের আহ্বানে ইমাম শওকানীও ওয়ালীউল্লাহ্র সহধর্মী। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল এই যে, শওকানী যায়েদী মতবাদের সমর্থক। যদিও তিনি হানফী মযহাবের কোন কোন মাস্আলায়

৪৯. ২৬ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৫০. ২৭ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

একমত, কিন্তু তিনি ইজমা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট মত পোষণ করেন না।[৫১] কাজী শওকানীর গ্রন্থ 'ইরশাদুল্ ফহুল' এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদের 'অসূলে ফিক্হ্' মিলিয়ে পাঠ করলে এ–দুয়ের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। এভাবে সমালোচনার পর শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনকে আরবের নজ্দ অথবা ইয়ামনী আন্দোলনের সাথে যোগ করা এবং এসব আন্দোলনকে একই পর্যায়ভুক্ত করা কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। অবশ্য ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনের পথ প্রদর্শকের মর্যাদা একমাত্র ইমাম রব্বানী[৫২] সারহিন্দীই দাবি করতে পারেন। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁকে পথ পরিষ্কারক বলে মেনে নিয়েছেন। ইমাম রব্বানী যে কাজ শুরু করেছিলেন, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ তাকেই পূর্ণতা দান করেন।

মোট কথা, ইমাম আবদুল আযীয এবং তাঁর কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্য ও সহচরবৃন্দের শিক্ষায়, প্রচারে, চিন্তাধারায় এবং কর্মপ্রচেষ্টায় আন্দোলন যখন জাতির কাছে বেশ পরিচিত হয়ে উঠলো, তখন থেকে আবদুল আযীয এমন একজন যুবকের কথা ভাবছিলেন স্বাভাবিকভাবে যার সৈনিক বৃত্তিতে প্রবণতা রয়েছে। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ পূর্ণতায় পৌছানোর জন্য তাঁর এ ধরনের একজন সহযোগীর প্রয়োজন হয়েছিল। এ ছিল আল্লাহ্রই একান্ত অনুগ্রহ যে,ঠিক তেমনি দিনে রায় বেরেলীর সৈয়দ শাহ ইলমুল্লাহ্র খান্দানের নওজোয়ান সৈয়দ আহ্মদ[৫৩] শাহ আবদুল আযীযের আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিতে এগিয়ে আসেন। শাহ আবদুল আযীয এই নবাগত যুবককে তাঁর উদ্দেশ্য

---

৫১. ইজমার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের খিলাফত। হযরত ওসমান কর্তৃক প্রস্তাবিত কুরআনও ইজমার ভিত্তিতে স্বীকৃত এবং গৃহীত। এ যুগে আমরা ইজমার স্থলে কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নেই। আজ যাকে কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়, সে যুগে ইজমার দ্বারা সেই উদ্দেশ্যই সাধিত হতো। ইজমা কিংবা কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্তকে দলীল বলে মেনে নেওয়া ব্যতীত কোন রাজনৈতিক আন্দোলন কার্যকরী হতে পারে না। ইজমার এই আইনগত মূল্য শিয়ারা মেনে নেয়নি কিন্তু আহ্লে সুন্নাহ্র সরাসরি ভিত্তিই হচ্ছে ইজমা। একটু চিন্তা করে দেখলে এ দু'টো মতের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

৫২. ২৮ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫৩. ২৯ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সাধনের পক্ষে উপযুক্ত মনে করলেন এবং এ কাজের যোগ্য করে তোলার জন্য তাঁকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া হলো।

সৈয়দ শাহ ইল্‌মুল্লাহ ছিলেন বাদশাহ আলমগীরের সমকালীন একজন প্রসিদ্ধ আল্লাহ্‌পন্থী আলিম এবং আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁর দুই পুত্র--সৈয়দ মুহম্মদ যিয়া এবং শাহ আবূ সাঈদ। ইনি ছিলেন শাহ সৈয়দ আহমদের পিতামহ এবং ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র খলীফা। শাহ ইলমুল্লাহ রায়বেরেলী দায়রায় বসবাস করতেন। আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সৈয়দ আহমদ শহীদ ১২০১ হিজরীতে এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল সৈয়দ মুহম্মদ ইরফান। আরবীর প্রাথমিক পাঠ্য গ্রন্থগুলি সৈয়দ আহমদ মওলানা মুহম্মদ ইসহাক এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদের কাছে পাঠ করেছিলেন। তিনি কুরআনের তরজমা এবং হাদীস শ্রবণ করতেন মওলানা মুহম্মদ ইসহাকের নিকট থেকে এবং তাঁরই কাছে তরীকার সুলুকও সম্পন্ন করেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ সম্পর্কে সার সৈয়দ আহমদ দেহলবী তাঁর লিখিত 'আসারে সানাদীদ' পুস্তকে লিখেছেন যে, সৈয়দ আহমদ বেরেলবী প্রথমে ইল্‌ম শিক্ষার উদ্দেশ্যে শাহজাহানাবাদ হয়ে আকবরাবাদ মসজিদে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় মসজিদের অতিথি–অভ্যাগতদের এবং বিশেষ করে মওলানা শাহ আবদুল কাদির সাহেবের কাছে যে সব তরীকত শিক্ষার্থী দরবেশ প্রকৃতির লোক আসতেন, তাঁদের সেবায় খুব আন্তরিকভাবে নিয়োজিত থাকতেন। আধ্যাত্মিক সাধনা যখন তাঁর চরিত্রে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল তখন মুখ থেকে এমন সব উক্তি শোনা যেত যা একজন জাতি সংস্কারকের পক্ষেই শোভা পায়। ইমাম আবদুল আযীয তা শুনে বলতেন ঃ উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য তাঁর চরিত্র গড়ে উঠছে।[৫৪]

---

৫৪. শাহ আবদুল আযীয কথাটা আরবীতেই বলেছিলেন যে,

تلك خيالات تربى بها الطفال الطريقة

অর্থাৎ এভাবেই তরীকতে ছাত্রদের গড়ে তোলা হয়ে থাকে। কথাটার মর্ম উপলব্ধির জন্য একটি নজীর দিচ্ছি। কুস্তিগীর তার ছাত্রকে শিক্ষা দেবার কালে মাঝে মাঝে নিজে পরাস্ত হয়ে পড়ে যায়। ছাত্র মনে করে যে, সে তার ওস্তাদকে হারিয়ে দিয়েছে; আসল উদ্দেশ্য থাকে প্রকৃত শিক্ষাদান। সৈয়দ আহমদের দৃষ্টান্ত কতকটা এ ধরনের। তাঁর মুখ থেকে অনেক বড়ো বড়ো

১২২৫ হিজরী মোতাবেক ১৮১১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শহীদকে সামরিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে টঙ্কের ওলী আমীর খানের সৈন্য বাহিনীতে প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখানে ছয় বছরের অধিককাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১২৩১ হিজরী অর্থাৎ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নওয়াব আমীর খান ইংরেজের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর সৈয়দ আহমদ ইমাম আবদুল আযীযের কাছে ফিরে আসেন।[৫৫]

ইমাম আবদুল আযীযের বিশিষ্ট সঙ্গী–সাথী ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিক্ষা যাঁদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধরে যাদের শিক্ষা এবং দীক্ষা চলেছিল, তাঁদের কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সৈয়দ আহমদ শহীদ অবশ্য প্রথমে এঁদের সাথে ছিলেন না, তিনি পরে এসে যুক্ত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ একাধারে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বংশের দিক থেকে সৈয়দ খান্দানের সন্তান ছিলেন। এসব যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবদুল আযীয তাঁকে পরিকল্পিত জিহাদের নেতৃত্ব দানের উপযোগী বিবেচনা করেছিলেন। সেই সঙ্গে শিক্ষা–দীক্ষায় উপযুক্ত পরামর্শদাতাও নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জিহাদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট পরিষদের হাতেই ছিল। যদিও সৈয়দ আহমদই মূলে সামরিকপ্রধান ছিলেন। জিহাদের কার্যপ্রণালী কিভাবে স্থির করা হয়েছিল, শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রণীত 'বদূরে বাযেগাহ' পাঠ করলে তা থেকে অনেকখানি জানা যায়।

ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ সুষ্ঠু সমাজ গঠনের[৫৬] জন্য পাঁচটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন– ১. কাযা (বিচার); ২. শহরিয়ত (বা নগর–

কথা প্রকাশ পেত। তিনি ভবিষ্যতে এক বিরাট কর্মভার গ্রহণ করবেন, এ ছিল তারই পরীক্ষা। সৈয়দ সাহেব সম্পর্কে তাঁর জীবনীতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি তাঁর পরিবারস্থ কাউকে বলেছিলেন,'যদি কেউ বলে যে, সৈয়দ আহমদ নিহত হয়েছে তাহলেও, তোমরা যতক্ষণ দেশ থেকে কুফরীর উচ্ছেদ, আফগান–আরব এবং তুর্কীদের অমুক অমুক ত্রুটিগুলির অবসান ঘটেছে না দেখ, ততক্ষণে সে কথা বিশ্বাস করো না।' তাঁর দীক্ষা সম্বন্ধে শাহ আবদুল আযীযের বিশেষ উক্তির এইগুলি ছিল প্রমাণ অর্থাৎ বিরাট কিছু করার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হওয়া।

৫৫. সৈয়দ আহমদ শহীদ ইমাম আবদুল আযীযকে লিখলেন, 'অধম কদম মোবারকে হাযির হবার দরখাস্ত পেশ করছে। এখানে সামরিক বাহিনী দরহম বরহম হয়ে গিয়েছে। নওয়াব ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেছে। এখন আর এখানে থাকার কোন সার্থকতা নেই।'

৫৬. ৩০ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

প্রধানত্ব); ৩. নেকাবত (শাসন বিভাগ); ৪. জিহাদ (সামরিক বিভাগ) ; ৫. তাবৃশীর (তথ্য বিভাগ)।

এর প্রত্যকটি বিষয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। এই পাঁচটি বিভাগের পরিচালকদের সঙ্গে একজন দক্ষ এবং একজন যোগ্যতাসম্পন্ন নেতার প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ইমাম হবার যোগ্য। অবশ্য এ ধরেনের যোগ্যতা খুব সহজলভ্য নয়। প্রায়শ দেখা যায় যে, দুই বা তিনটি বিভাগের দায়িত্ব এক ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে; অন্যান্য কাজের জন্য ভিন্ন লোকের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্র–গঠন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে[৫৭] এসব কাজ চালানোর জন্য সামাজিক প্রথা অনুসারে কোন না কোন পন্থা অবলম্বিত হয়। যার হাতে যে কাজের দায়িত্ব থাকে, সে–ই কোন রকম করে তা চালিয়ে যায়। রাষ্ট্র পরিচালনের তৃতীয় পন্থা হলো সমাজের সুধী ব্যক্তিদের সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা। সোজা কথায় এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ইমাম হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সহজপ্রাপ্য নয়। এ অভাবের ক্ষেত্রে সরকার গঠনের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি পন্থার যে–কোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে–

১. কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি পরিষদের সরকার।

২. সমাজ যদি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণী তাদের শ্রেণীগত নিয়ম–কানুন মেনে চলবে। তাদের প্রধানদের আনুগত্য মেনে নেবে। অর্থাৎ তখন সরকার গঠনের কোন প্রয়োজনই হবে না। এতে তাদের এমন কোন বিরোধের মোকাবিলা করতে হবে না, যে জন্য পরে তারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করতে বাধ্য হয়।

৩. তৃতীয় পন্থা হলো বুদ্ধিজীবী অথবা জনসাধারণ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত পরিষদ অর্থাৎ পার্লামেন্ট।

প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, ইমাম আবদুল আযীযের যুগে উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতিতে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। তিনি তাঁর পরবর্তীকালে

---

৫৭. অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র (মদীনায়ে নাফেসাহ) বলতে সুগঠিত সরকারহীন রাষ্ট্রকেই বোঝায়। বর্তমানের পরিভাষায় এরূপ সমাজকে সোসাইটি বলা হয়। এনারকিস্টরা সরকার স্বীকার করে না। তাদের মতে সমাজই সভ্যতার শেষ ধাপ। 'মদীনায়ে তাম্মাহ্' অর্থে তিনি সুগঠিত রাষ্ট্রকেই বুঝিয়েছেন।

কাজ চালানোর জন্য নিজেদের লোকদের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী দায়িত্বশীল লোকের অভাব দেখতে পেয়েছিলেন। এ কারণে তিনি দু'টি বোর্ড গঠন করেছিলেন।

সামরিক বাহিনীর কাজের জন্য সৈয়দ আহমদকে আমীর এবং মওলানা আবদুল হাই ও মওলানা শাহ ইসমাঈল শহীদকে উযীর নিযুক্ত করেছিলেন। ইমাম আবদুল আযীয তাঁর অনুবর্তিগণকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'সৈয়দ আহমদ, মওলানা আবদুল হাই এবং ইসমাঈল শহীদ--এ তিনজন যে ব্যাপারে একমত হবেন, তা আমারই নির্দেশ বলে সবাই যেন মেনে নেয়।[৫৮] ইমাম আবদুল আযীয মওলানা মুহম্মদ ইসহাককে সব কাজে সঙ্গে রেখে সবাইকে একথা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর নির্দেশ এবং মওলানা মুহম্মদ ইসহাকের নির্দেশের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বস্তুত ইমাম আবদুল আযীযের এই সিদ্ধান্ত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র সাংগঠনিক মূলনীতির অনুরূপই ছিল।[৫৯] এই ছিল কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে শাহ আবদুল আযীয সুদীর্ঘকাল ধরে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র জমাত সংগঠন করেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ এভাবে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর ১২২১ হিজরীতে শাহ আবদুল আযীয সর্বপ্রথম শাহ সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর পরিষদের সদস্য মওলানা আবদুল হাই এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদকে তরীকতের বাইয়াত গ্রহণের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন। ১২৩৬ হিজরীতে এই পরিষদ জিহাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য দ্বিতীয়বার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। এর পরে তাঁকে পূর্ণ কাফেলাসহ হজ্জে গমনের নির্দেশ দেওয়া হয় যাতে করে সাংগঠনিক ব্যাপারে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

---

৫৮. ইমাম আবদুল আযীয কর্তৃক গঠিত বোর্ডের তাৎপর্য সম্পর্কে পরে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় সৈয়দ আহমদ শহীদকে সর্বময় ইমাম হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এ কাজ তাঁদের দ্বারা হয়েছিল, যাঁরা ইমাম আবদুল আযীযের শিক্ষার বাইরে ছিলেন। পরিণামে পরাজয়ের মধ্যে এই নীতি পরিবর্তনের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

৫৯. শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক এই বিশেষ ব্যবস্থার ফলে পরে মওলানা মুহাম্মদ ইসহাকের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে কোন দ্বিধা হয়নি। 'সাওয়ানেহে আহমদিয়ার' লেখক শাহ ইসহাকের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে দেখিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম জাহানের কোন আলিমই মওলানা আবদুল আযীয পর্যন্ত তাঁদের যোগসূত্র শাহ ইসহাককে বাদ দিয়ে স্থাপন করেন নি।

সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং তাঁর সহকর্মীদের এই সফরের গুরত্ব যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত আন্দোলনের একটি মূলনীতি সম্মুখে রাখা প্রয়োজন।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র দৃষ্টিতে সার্বভৌম ইসলামী হুকুমতের সূচনা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (স.)–র জীবনকে কেন্দ্র করেই এবং তাঁর প্রচারক এবং আহ্বায়করাই ছিলেন সে হুকুমতের আমীর বা প্রধান। ওয়ালীউল্লাহ–আন্দোলনের সংগঠক এবং আহ্বায়কদেরও ঠিক সেই বৈশিষ্ট্যই ছিল। ইমাম আবদুল আযীয সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আমীর সৈয়দ আহমদ, মওলানা ইসমাঈল শহীদ এবং মওলানা আবদুল হাইকে আহ্বায়করূপে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন। অন্য কথায় রাজনৈতিক দল সংগঠনের পর ওয়ালীউল্লাহ্র জমাত এবার সরকার প্রতিষ্ঠা এবং জিহাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

১২৩৯ হিজরীতে এই কাফেলা হজ্জ থেকে যখন ফিরলেন, ইমাম আবদুল আযীয তখন পরলোকে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মওলানা মুহম্মদ ইসহাককে তাঁর মাদ্রাসার কর্তৃত্ব প্রদান করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান।

ইমাম মুহম্মদ ইসহাক
(১২৩৯–১২৬২ হিজরী)

ইমাম আবদুল আযীয-(র.) ১২৩৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি তাঁর মাদ্রাসার দায়িত্বভার মওলানা মুহম্মদ ইস্‌হাকের উপর অর্পণ করেছিলেন। ওয়ালীউল্লাহ্–আন্দোলনের এটা ছিল প্রচলিত নিয়ম। সৈয়দ আহমদ শহীদের কাফেলা হজ্জ থেকে ফিরে এসে শাহ মুহম্মদ ইসহাককে জমাতের ইমাম মেনে নিয়েছিলেন। তখন জমাতের কোন অধিবেশন মাদ্রাসার অভ্যন্তরে বসলে সভাপতিত্ব করতেন শাহ মুহম্মদ ইসহাক এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ মজলিসে আসন গ্রহণ করতেন। আবার যখন মাদ্রাসার বাইরে কোথাও জমাতের অধিবেশন বসতো, তখন শাহ সৈয়দ আহমদ সভাপতিত্ব করতেন এবং শাহ মুহম্মদ ইসহাক মজলিসে উপবেশন করতেন।[১]

---

১. এ বর্ণনার ভিত্তি হচ্ছে 'আমীরুর্ রওয়ায়াত'। আমীরুর্ রওয়ায়াত এবং আরওয়াহে সালাসা প্রণয়ন করেছিলেন আমীর শাহ খান সাহেব। তিনি মওলানা কাসেম সাহেবের বিশিষ্ট খাদেম ছিলেন। এ গ্রন্থ তাঁর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে রচিত । খান সাহেবের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ঘটনার মূল এবং প্রথম বর্ণনাকারীর নামধাম তাঁর স্মরণ থাকতো। তিনি আলীগড়ে বাস করতেন। তিনি বহু সুধী এবং বিশিষ্ট লোকের সাহচর্যে কাটিয়েছিলেন। সন–তারিখসহ ওয়ালীউল্লাহ্–আন্দোলনের বিশিষ্ট আলিম এবং দেওবন্দের প্রধান আলিমবৃন্দের জীবন–কাহিনী এবং তৎসংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী তিনি বর্ণনা করতেন। তাঁর বৈঠকে এ সব আলোচনা কদাচিৎ বাদ পড়তো। মওলানা মরহুম আশরাফ আলী থানবী মওলবী হাবীব আহমদ কীরানুবীকে দিয়ে সে সব মৌখিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সেগুলি 'আমীরুর রওয়ায়াত' নামে প্রকাশিত হয়। পরে দেওবন্দের ছাত্র মওলানা তাইয়্যিব সাহেব কর্তৃক সংগৃহীত বিভিন্ন ঘটনার বিবরণী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং আশরাফ আলী থানবীর মলফুযাতের সঙ্গে একত্রে মুদ্রিত হয়। এই সংকলনের নাম আরওয়াহে সালাসা। তাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাঈল এবং মওলানা আবদুল হাই সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রয়েছে। আমিরুর রওয়ায়াতের বর্ণনা দ্বারা পরিষ্কার জানা যায় যে, জমাতের কোন কেন্দ্র থেকে থাকলে তা শাহ আবদুল আযীযের মাদ্রাসাই ছিল। শাহ ইসহাক ছিলেন তাঁর প্রধান পরিচালক। সৈয়দ আহমদ সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং সে সময়টা ছিল সৈন্য সংগ্রহ করার, কাজেই মাদ্রাসার

এভাবে শাহ সাহেবের জমাতের মূলনীতি রক্ষা, জনবল এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রচারের কাজ ইমাম আবদুল আযীযের মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে চলতো। সামরিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৈয়দ আহমদ শহীদের দলের উপর ন্যস্ত ছিল।

সৈয়দ আহমদ সাহেব তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে দু'বছর এগারো মাস পরে ১২৩৯ হিজরীর শাবান মাসে হজ্জের সফর থেকে ফিরে আসেন। সে বছরই যিলহজ্জ মাস থেকে জিহাদের প্রস্তুতি শুরু হয়। মওলানা ইস্‌মাঈল শহীদ এবং মওলানা আবদুল হাই জিহাদের বাণী নিয়ে উপমহাদেশের নানাস্থানে সফর করতে থাকেন। দু'হাজারের মতো মুজাহিদ সংগৃহীত হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে তিন দলে বিভক্ত করে কুচকাওয়াজ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি কিছুকাল টঙ্কে অবস্থান করে প্রথমে আজমীর এবং পরে দিল্লী চলে যান। ১২৪১ হিজরীর প্রথম দিকে পেশওয়ার থেকে হাশ্‌ত্‌ নগর এবং সেখান থেকে খোশগী এসে অবস্থান করেন। সেখান থেকে পুনঃ নওশেরাহ চলে যান। অন্য যে দলটি তাঁদের পিছনে তৈরী হচ্ছিল, তাদেরকে তিনি লোক সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন।

মোট কথা, ১২৪১ হিজরীতে এ বাহিনী কাবুলে হিজরত করে এবং ১২ই জমাদিউল আখের ১২৪২ হিঃ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে আফগান উপজাতিগুলি হাভুয়ায়[২]

বাইরে তাঁর প্রাধান্য ছিল। দেওবন্দ, সাহারানপুর, পানিপথ, কর্ণাল এবং থানেশ্বর হয়ে তিনি মালীর কোটাল পৌছেন। সেখান থেকে মামদুট, বাহাওয়ালপুর, হায়দরাবাদ (সিন্ধ), শিকারপুর, জাগন, খানগড়, দর ঢাওড়, দররাবুলুন, পিশীন, কান্দাহার এবং কাবুলের পথে খায়বর হয়ে পেশওয়ার পৌছেন।

২. আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে হাভুয়ার সম্পর্ক গভীর । এই হাভুয়াতেই ১২৪২ হিজরীর ১২ই জমাদিউল আখের তারিখে ওয়ালীউল্লাহ-জমাতের সামরিকপ্রধানেরা অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। এই সরকারের আমীর ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ। মুসলমান সর্বসাধারণ তাঁর হাতে বয়েত হয়েছিলেন এবং তাঁকে আমীররূপে গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে এ তারিখ ছিল মোতাবেক ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি। এ জন্য আমাদের জাতীয় ঘটনার স্মৃতি হিসাবে ১০ই জানুয়ারি একটি দিবস উদ্‌যাপন করা যেতে পারে। স্যার জন ইলিয়ট লিখেছেন যে, হাভুয়া সিন্ধু নদীর তীরে প্রসিদ্ধ স্থান। এস্থান টঙ্কের পনর মাইল দূরে। লাহোর, পেশওয়ার প্রাচীন রাজপথে পেশওয়ার থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। হাভুয়া পূর্ব কান্দাহারের রাজধানী

সৈয়দ আহমদ শহীদকে আমীররূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ ঘটনার পরে এক বছরকাল মওলানা আবদুল হাই বেঁচেছিলেন। মওলানা আবদুল হাই–এর জীবিতাবস্থায় জমাতের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়নি। মওলানা আবদুল হাই–এর জীবিতকালে সৈয়দ আহমদ শহীদ তাঁর ব্যক্তিগত মতানুযায়ী[৩] কোন কাজ করতে পারতেন না–এ অধিকার তাঁর ছিল না। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের উপরই সরকারী কাজকর্ম চলতো।

১২৪৩ হিজরীর ৮ই শাবান (সোমবার) মওলানা আবদুল হাই ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে মুজাহিদ বাহিনীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। তা ছাড়া তাঁর তিরোধানের পর ওয়ালীউল্লাহ্–প্রবর্তিত আন্দোলনে মৌলিক পরিবর্তনও লক্ষিত হতে থাকে। এর পরিণাম হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। একদিন এ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল দিল্লীর ধ্বংস–প্রায় সুলতানাতের স্থলে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র বৈপ্লবিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার স্থাপন করা। এ উদ্দেশ্যের পটভূমিকায়ই শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ মারাঠাদের প্রভাব খর্ব করার জন্য আহমদ শাহ আবদালীকে আহ্বান করে এনেছিলেন। একই নীতি অনুযায়ী শাহ আবদুল আযীযও চেয়েছিলেন আফগানদের সহযোগিতায় পাঞ্জাব থেকে শিখদের বিদ্রোহী সরকার[৪] উচ্ছেদ করে, কাবুল এবং দিল্লীর মধ্যে সংযোগ সাধন করা। কেননা উপমহাদেশে মুসলিম হুকুমতের ভবিষ্যত এ ব্যবস্থার উপরই নির্ভরশীল ছিল। শাহ আবদুল আযীযের সমস্ত প্রচেষ্টা এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত ছিল। বস্তুতঃপক্ষে ওয়ালীউল্লাহ্–আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল উপমহাদেশের সঙ্গে। শাহ

ছিল। আবুল হিন্দ আল্‌বিরুনী বাইহাকীর মতে আলেকজান্ডার দি গ্রেট এ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রথমে এ স্থানের নাম ছিল ভান্ডা, পরে হাড়ুয়া নামে খ্যাত হয়েছে।

৩. সৈয়দ আহমদ শহীদ একদিন ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকাতে শরীক হয়েছিলেন। নামাযান্তে মওলানা আবদুল হাই তাঁকে কিছুটা ক্ষোভের সাথে বললেন, যাঁরা সুন্নতকে পুনর্জীবন দানের দাবিদার, তারা নিজেরাই দেখছি জমাতে যথাসময়ে হাজির হতে পারছে না। উত্তরে সৈয়দ সাহেব বললেন, মওলানা! আপনি ঠিকই বলেছেন। আশা করি ভবিষ্যতে এ ত্রুটি আর হবে না। এভাবে সতর্ক করে দেওয়া আপনার উপর ফরজ। তখন মওলানা আবদুল হাই বললেন, আপনার এ ওজর নিরর্থক। আপনার যথারীতি কাজ করে যাওয়া উচিত। নিত্য কেউ কাউকে সতর্ক করতে পারে না। ইমাম যদি হতে চান, তবে নিজেই অগ্রবর্তী হয়ে কাজ করুন।

৪. ৩১ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।

ওয়ালীউল্লাহ কর্তৃক প্রদর্শিত আদর্শের ভিত্তিতে উপমহাদেশের ভূমিতে সরকার প্রতিষ্ঠা করা আন্দোলনের বুনিয়াদী নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে কারণে দিল্লীই ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি। সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং তাঁর মুজাহিদীন দল এই কেন্দ্রেরই অধীন ছিলেন। মুজাহিদ এবং অর্থ তাঁদেরকে দিল্লী থেকেই সরবরাহ করা হতো। কিন্তু মওলানা আবদুল হাই সাহেবের ইন্তিকালের পরে অন্দোলনের এই মৌলিক দিকটিতে পরিবর্তন ঘটে। দিল্লী কেন্দ্রের বিরুদ্ধতা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠলো এবং সিন্ধুনদের অপর পারে যে সামরিক সরকার গঠিত হয়েছিল, তা একটি নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় মর্যাদা গ্রহণ করে দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো। এর অনিবার্য পরিণতি হলো এই যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ কর্তৃক পরিকল্পিত হুকুমতের রূপও পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং পরিষদের হুকুমতের স্থলে একনায়কত্ব বা ডিক্টেটরশীপ স্থান গ্রহণ করলো। সুতরাং সৈয়দ আহমদ শহীদ মুসলিম জাহানে আমীরুল্ মু'মিনীন এবং একজন সংস্কারক খলীফা বলে স্বীকৃত হলেন। তিনি অতপর দুনিয়ার একজন বড় আমীররূপে পরিচিত হয়েছিলেন। সুতরাং এই আমীরের প্রতি আনুগত্য আফগান সরদারদের মযহাবী কর্তব্য বলে গণ্য হলে বোখারা, তুরস্ক প্রভৃতি অন্যান্য মুসলিম রাজ্যও এ কর্তব্য এড়িয়ে যেতে পারে না। সংক্ষেপে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাঁকে আমীররূপে স্বীকৃতি দেওয়া। এর ফলে দিল্লীর কেন্দ্রীয় মর্যাদা বিলুপ্ত হতে লাগলো।[৫]

মূলনীতি পরিবর্তনের ফল দাঁড়ালো এই যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র জমাতের দৃষ্টিতে হানাফী ফিকহের যে গুরুত্ব ছিল, এর পরে আর তা থাকলো না। নজদী এবং ইয়ামনী মতবাদ অনুসারে যাঁরা চলতেন তাঁরা হানাফী ফিকহের অনুসরণ করা আদৌ প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন না। এ কারণে হানাফী মযহাবভুক্ত আফগান মুজাহিদদের সঙ্গে আকায়েদগত মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। আমীর-ই-মুজাহিদ আহমদ শহীদ যদিও বার বার একথা আফগান ওলামা এবং জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর বংশাবলী বরাবরই হানাফী মযহাব অনুসরণ করে আসৃছিলেন, কিন্তু তারা এ ব্যাপারে শাহ্

৫. এই পরিবর্তনের মধ্যে কোম্পানী সরকারের কূটনৈতিক চাল ছিল বলে মনে করার কারণ রয়েছে।

ওয়ালীউল্লাহ্র আলাদা বৈশিষ্ট্য মেনে নিতে রাজী ছিল না। সুতরাং দিন দিন বশৃঙ্খলা বেড়েই চল্লো।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনের যুগে হানাফী মযহাব অনুসরণ করা এবং না করার প্রশ্নটি খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এ প্রশ্নকে ভিত্তি করে এক দিকে আফগানদের মধ্যে অন্যদিকে উপমহাদেশের মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রচন্ড বিতর্ক শুরু হয় এবং নানা অপপ্রচার চলতে থাকে। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র পিতা হানাফী মযহাবের লোক ছিলেন। তিনি নিজেও হানাফী মযহাবের অনুসারী ছিলেন। ছাত্রদের তিনি হানাফী এবং শাফেয়ী উভয় মযহাবের কিতাবই দক্ষতার সাথে পড়াতেন। তিনি তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগায়' হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন দার্শনিকের দৃষ্টিভংগি থেকে। শাফেয়ী মত যে সমস্ত ক্ষেত্রে হাদীস ও দার্শনিক বিচারে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হতো, সে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি শাফেয়ী মযহাবকে অগ্রাধিকার দিতেন।

হানাফী আইনশাস্ত্র সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র নীতি খুবই সুস্পষ্ট। 'আন্ফাসুল্ আরেফীন' গ্রন্থে তিনি তাঁর ওয়ালিদ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ 'প্রকাশ থাকে যে, হযরত ওয়ালিদ সাহেব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হানাফী আইনশাস্ত্র অনুসরণ করতেন। হাদীস অথবা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তিতে কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য মযহাবকেও মেনে নিতেন। ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ—এর মধ্যে অন্যতম। তিনি তাঁর অন্য গ্রন্থ 'ফুয়ূযুল্ হারামাইন'—এ উল্লেখ করেছেন, 'আমি রসূলে করীম (সা.)—এর দিকে ফিরে তাকাই এবং অবহিত হতে চেষ্টা করি, রসূলে আকরাম (সা.)—এর আইনশাস্ত্র ভিত্তিক মযহাবগুলির মধ্যে কোন্টি সুন্নাহ্র সংগে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বুঝতে পারলাম হযরত (সা.)—এর কাছে সব মযহাবই সমান। তাঁর পবিত্র রূহ্ এ সবের উর্ধ্বে। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্র জীবনের দিকে লক্ষ্য করে হানাফী মযহাব সম্পর্কে আমি অতি চমৎকার একটি শিক্ষা লাভ করেছি, যা ইমাম বোখারী এবং তাঁর সংগিগণ কর্তৃক সংগৃহীত হাদীস এবং সেগুলির বিচার—বিশ্লেষণ থেকে অনেক সহজবোধ্য। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ

এবং ইমাম মুহাম্মদ এই তিনজনের উক্তির মধ্যে যেটি হাদীসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটিই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করাই হলো আমার সেই শিক্ষা। পরবর্তী পর্যায়ে কর্তব্য হলো হাদীসেও সমান অভিজ্ঞ এমন হানাফী আইনবিদের রায় মেনে নেয়া। এমনও হতে পারে যে, ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর সাথীদ্বয় কোন ব্যাপারে নির্বাক অথচ হাদীসে সে বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। তেমন ব্যাপারে হাদীসের সিদ্ধান্তই মানতে হবে। হানাফী মযহাবেরও এটাই নীতি।'

এ গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আর একটি বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ হলাম। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আমার দ্বারা বিশৃংখল মুসলমান সমাজ আবার সংহত হবে ; সুতরাং আমি সাধারণ বিষয়ে জাতীয় জীবনে বিতন্ডা ও বিরোধ সৃষ্টি করতে পারি না। জনতার বিরোধিতা করা আল্লাহ্‌র বিচার বিরোধিতা করা।[৬]

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রচার এবং তাঁর চিন্তা ও মতামত সম্পর্কে এ কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, তাঁর লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত সমাজ। বস্তুত সারা পৃথিবীর শিক্ষিত লোকের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য রয়েছে। উপমহাদেশের তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ যেমন তাঁর চিন্তা ও দর্শনকে গ্রহণ করেছিলেন, পৃথিবীর যে কোন দেশের শিক্ষিত লোকের জন্যও তা গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু তিনি উপমহাদেশেই তাঁর কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করেছিলেন। এ কারণেই তিনি হিজায ছেড়ে উপমহাদেশে ফিরে এসেছিলেন। এ দেশে হানাফী আইনশাস্ত্র অনুসরণ করা অনেকটা জরুরী ব্যাপার ছিল। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরে ইমাম আবদুল আযীয বিশেষভাবে দেশের সাধারণ শ্রেণীকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালাচ্ছিলেন। এই উপায়ে তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিক্ষা এবং চিন্তা সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

---

৬. মওলানা মুহম্মদ ফাখের ইলাহাবাদী এক সময় দিল্লীতে শাহ্ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। ঘটনাক্রমে এক মসজিদে তিনি নামায পড়েছিলেন এবং নামাযের মধ্যে 'রফে ইয়াদাইন' করেছিলেন। এতে জনতা ক্ষেপে যায়। পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করে। জনতা তাঁকে ধরে শাহ সাহেবের নিকট নিয়ে যায়। শাহ সাহেব জনতার কাছে খুব নম্রভাবে বললেন, হ্যাঁ। হাদীসে ঐ রীতিরও উল্লেখ আছে। এতে সবাই চুপ হয়ে গেল। পরে তিনি বললেন ঃ জনতাকে শুধু শুধু ক্ষেপানো জ্ঞানীর কাজ নয়।

কারণ, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ হানাফী এবং শাফেয়ী মতবাদের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করেন নি। শাহ্ আবদুল আযীয হানাফী মতবাদের বাইরে পদক্ষেপ করেন নি এবং তা শুধু জনসাধারণের খাতিরেই। তাঁর যে পরিবেশ ছিল তাতে উদার মত পরিত্যাগ না করলেও চল্‌তো। অসুবিধা ছিল জনসাধারণকে নিয়ে। সব দেশেই জনসাধারণের প্রশ্ন আলাদা। শাহ্ আবদুল আযীযের নীতি ছিল বিশেষভাবে জনসাধারণমুখী।

হানাফী আইনশাস্ত্র এবং প্রচলিত রীতির প্রতি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জমাতের নীতি ছিল উক্তরূপ। পরে শাহ্ ইসমাঈল সাহেব মওলানা আবদুল আযীযের কাছে যখন 'হুজ্জাতুল্লাহ্' পাঠ করেন, তখন তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহর্ আদর্শই অনুসরণ করেন। তিনি নিজে একটি অনুগত দল গড়ে তোলেন। এরা 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'ই অনুসরণ করতো। তারা শাফেয়ী–পন্থীদের ন্যায় 'রফে ইয়াদাইন' এবং 'আমীন বিজ্ জিহ্‌র'[৭] বলতে শুরু করেছিলেন। এতে দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে খুব চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কিন্তু শাহ ওয়ালীউল্লাহ্–জমাতের কোন লোক শাহ ইসমাঈল এবং তাঁর দলকে বাধা দিতে পারেন নি। পরে যখন আফগান এলাকায় হিজরতের সময় এল, তখন শাহ সৈয়দ আহমদ মওলানা ইসমাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মওলানা! আপনি 'রফে ইয়াদাইন' কেন করেন?" শাহ ইসমাঈল জওয়াব দিলেন, 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই।'

সৈয়দ আহমদ বললেন, "মওলানা ! আপনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে 'রফে ইয়াদাইন' করা ছেড়ে দিন।" এর পরে মওলানা ইসমাঈল শহীদ এবং তাঁর অনুবর্তীরা 'রফে ইয়াদাইন' করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৮] কিন্তু যাঁরা নজ্‌দ এবং ইয়ামনী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরা 'রফে ইয়াদাইন' এবং 'আমীন বিজ্ জিহ্‌র' পরিত্যাগ করলেন না। তাঁদের এথ আচরণ বন্ধ করার জন্য পীড়াপীড়ি করার ফলে খুব বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলো। আমীর সৈয়দ আহমদ শহীদ

---

৭. রফে ইয়াদাইন--নামাযের মধ্যে তাহরীমা ছেড়ে মাঝে মাঝে দুই হাত তোলা । আমীন বিজ্ জিহর--নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠের পরে উচ্চ শব্দে সবাই 'আমীন' বলা।

৮. আমীর শাহ খান মরহুম থেকে মৌখিকভাবে শ্রুত।

এসব লোকের চালকদেরকে যারা ইসমাঈল শহীদ এবং ইমাম শওকানী উভয়ের শাগরেদ এবং যায়েদী শিয়া ছিলেন, দল থেকে বের করে দিলেন। এ সত্ত্বেও বিরোধের ধোঁয়া জমতেই থাকলো।

ওয়ালীউল্লাহ–আন্দোলনের এ পর্যায়ে নজ্‌দ এবং ইয়ামনী আলিমদের উপমহাদেশীয় অনুসারী এবং ওয়ালীউল্লাহ–পন্থীদের মধ্যে যে বিরাট বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটা নীতিগত দিকও ছিল। এ বিরোধ ছিল মূলত বিপরীতমুখী প্রবণতার। বর্তমান পরিভাষায় যাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রবণতা বলা যায়। সম্প্রতি ইউরোপেও আন্দোলনের এক পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি নিয়ে দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। কোন কোন দেশের জাতীয় আন্দোলনের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিই শুধু থাকে, কিন্তু মূল লক্ষ্য থাকে জাতীয়। আবার কোন কোন আন্দোলন চলে আন্তর্জাতিক আদর্শকেই মূল লক্ষ্য স্থির করে। জনসাধারণ এ দুইয়ের পার্থক্য বুঝে না। উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দল কখনো এক সংগে কাজ করতে পারে না। প্রবল দল সর্বদা দুর্বল দলের ধ্বংস কামনা করে।[১] সুতরাং এ মনে করা অন্যায় হবে না যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জমাত ছিল একটি খাঁটি জাতীয় দল, তবে আন্তর্জাতিক দিকও তাঁরা বিচার–বিবেচনা করতেন না এমন নয়। পক্ষান্তরে নজদ–ইয়ামনী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত উপমহাদেশীয় মুসলমানদেরকে এমন একটি দল মনে করা যেতে পারে, আন্তর্জাতিক আদর্শই ছিল যার মূল লক্ষ্য। আফগান জাতি জাতীয় ভিত্তিতে কর্মপন্থা স্থির করতো। সুতরাং তারা ওয়ালীউল্লাহ–জমাতের উদারপন্থীদের

---

১. রুশ সাম্যবাদীদের মধ্যে ট্রটস্কির পার্টি ছিল আন্তর্জাতিক। ট্রটস্কি জাতিতে ইয়াহুদী ছিলেন। পক্ষান্তরে স্টালিনের ছিল খাঁটি জাতীয় দল। অবশ্য আন্তর্জাতিকতার দিকে তাদেরও ঝোঁক ছিল। স্টালিন ছিলেন খাঁটি রুশ। সুতরাং স্টালিনের হাতে যখন সুযোগ এলো তখন তিনি ট্রটস্কির দলের লোকদের যারা সাধারণত ইয়াহুদী ছিল হত্যা করালেন।

ইসলামও একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন। আরবীয়, তুর্কী, ইরানী এবং উপমহাদেশীয় এগুলি জাতীয় আন্দোলন। ইসলামে বিশ্বাসী একজন আরব কিংবা একজন উপমহাদেশীয়কে স্টালিনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আবার যে মুসলমান ইসলামী ঐক্য ব্যতীত আর কিছুতেই বিশ্বাসী নয়, যেমন নজদী বা ইয়ামনী আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত উপমহাদেশীয় মুসলমান, ট্রটস্কির সাথে তুলনা করা হতে পারে। কেননা তার কাছে ইসলামই একমাত্র বিবেচ্য। এ দু দলের মধ্যে মতবিরোধ হওয়া অনিবার্য ছিল।

সাথে মিলেমিশে কাজ করতে পারত, কিন্তু আন্তর্জাতিকতাকে যারা নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিল, তাদের সাথে মতের ঐক্য হওয়া সম্ভব ছিল না।

আফগানী এবং আরবের নজ্‌দ-ইয়ামনী আন্দোলনে বিশ্বাসী উপমহাদেশীয়দের মধ্যে আদর্শগত বিরোধত ছিলই, তা ছাড়াও ব্যবহারিক জীবনেও বহুবিধ অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। অবশ্য একথা সত্য যে, সম্ভ্রান্ত আফগানরা ভিন্ন গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা দূষণীয় বলে মনে করতো না।[১০] বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, যে সমস্ত উপমহাদেশীয় মুসলমান আফগান এলাকায় হিজরত করেছিলেন তাঁরা পরিবার-পরিজন সংগে করে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁরা আফগান এলাকায় যখন স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন, তখন আফগানদের সাথে তাঁদের বিয়েশাদীর সম্পর্ক শুরু হলো। পক্ষান্তরে আমীর শহীদের খিলাফতের উপমহাদেশীয় প্রচারকগণ তাঁদের শাসকসুলভ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আফগান বালিকাদেরকে বিয়েশাদী করা শুরু করেছিলেন।[১১] এটাই দোষের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক যারা শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত ছিল না এমন সব লোকেরাই এ ব্যাপারের জন্য দায়ী ছিল। তাঁদের ধর্মীয় গোঁড়ামি এত উগ্র ছিল যে, আকিদা এবং মতামতের প্রশ্নে আমীরের আনুগত্যকেও জরুরী মনে করতেন না।

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

অর্থাৎ 'যে কাজে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হয়, মানুষের আনুগত্যের জন্য এরূপ কাজ করতে নেই।' তারা এ-নীতি কার্যত প্রয়োগ শুরু করে দিয়েছিলেন।

---

১০. কাশাগারের সুলতান সোলাইমান শাহ কর্তৃক প্রেরিত একটি বালিকাকে সৈয়দ আহমদ শহীদ বিবাহ করেছিলেন। তার গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। শাহ সাহেবের শহীদ হওয়ার পরে তাঁর এই স্ত্রী টঙ্কে চলে এসেছিলেন।

১১. আফগান বালিকাদেরকে এভাবে প্রভাব খাটিয়ে বিয়েশাদীর কথা 'সীরতে সৈয়দ আহমদ' গ্রন্থে যেনতেনভাবে উল্লেখ আছে। উপমহাদেশের ন্যায় আফগানিস্তানে এবং সীমান্ত এলাকায় বিধবা বিবাহ অবৈধ মনে করা হতো। তাছাড়া বিয়ের ব্যাপারে নানা রকম বিধিনিষেধ ছিল। সৈয়দ সাহেব এসব কুপ্রথা উচ্ছেদের হুকুম দিয়েছিলেন। আফগানবাসীরা এবং আমীরগণ এতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বিরোধের এও একটা কারণ ছিল।

ইউরোপের নৈরাজ্যবাদীদের সাথে তাঁদের তুলনা করা যেতে পারে। তারাও বিপ্লবী দলের সাথে যোগ দিত, ফলে বিপ্লবীদলের মারাত্মক ক্ষতি হতো।

সত্য এই যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ যেদিন আন্দোলনের আমীর নিযুক্ত হলেন, সেদিন থেকেই দলে অভ্যন্তরীণ বিরোধের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো। আমি হলে আফগানদের 'আমীর' একজন আফগানকেই করে দিতাম এবং তাঁকে উমারা পরিষদের একজন সভ্য করে নেওয়া হতো। তাহলে উভয় জাতি সম্মিলিতভাবে জিহাদ করতো। পরস্পরের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ দেখা দিত না। এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সব বিরোধ মিটে যেত, কিন্তু তা হয়নি। সুতরাং সে বিরোধ সৈয়দ আহমদ শহীদের দলের পক্ষে সর্বনাশকর হয়ে দাঁড়ালো। কাবুল অবস্থানকালে আমি আফগানদের মধ্যে কাজ করেছি, তখন আমাকে শক্তি–সামর্থ্য যুগিয়েছেন আফগানী এবং উপমহাদেশীয় উভয় দেশের শিক্ষিত নওজোয়ানরা। আমীর শহীদের মুজাহিদ বাহিনীতে যে সমস্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তেমন বিরোধ সে সময়েও সৃষ্টি হতে দেখেছি। আমি সে সমস্ত বিরোধ বন্ধ করার জন্য বর্ণিত পন্থাই গ্রহণ করেছি, কোন আফগানের উপর কোন বাইরের লোককে নেতৃত্ব করতে দেইনি। অবশ্য আমরা তাদের সাহায্য করেছি এবং তাদের সংগে সহযোগিতাও করেছি। কিন্তু, কোনরূপ কর্তৃত্ব করতে অগ্রসর হইনি। এ নীতি গ্রহণের ফলে আমার কার্যকালে কোনরূপ গোলযোগ হয়নি–সবকিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে।[১২]

---

১২. আসল ব্যাপার এই যে, আফগানদের রুচি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন আমীরের নির্দেশই কার্যকর ছিল না। তেমন নির্দেশ তারা মানতো না।

শাহ্ সৈয়দ আহমদ শহীদের হাতে খিলাফতের দীক্ষা

১২৪২ হিজরীর ১২ই জমাদিয়স্‌সানী সৈয়দ আহমদ শহীদের হাতে নেতৃত্ব প্রদান করা হয় এবং খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। তাঁর নামে খোতবাও পাঠ করা হয়। এই ঘোষণার কিছু দিন পরে পেশওয়ারের সর্দারগণ সৈন্যবাহিনী এবং গোলাবারুদসহ নওশেরার নিকটে সারসাই নামক স্থানে শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদের কাছে উপস্থিত হয় এবং তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানায়। পেশওয়ারের উপজাতীয় সর্দারদের এবং উপমহাদেশীয় মুজাহিদদের মিলিত সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। তারা আমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের নির্দেশে জান কোরবান করার জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত হয়েছিল। পেশওয়ারের সর্দারদের অবস্থা ছিল এই যে, যদিও তাঁরা প্রকাশ্যে আমীরের সংগেই ছিলেন, কিন্তু সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বকে তাঁরা নিজেদের জন্য মৃত্যুতুল্য ভাবছিলেন। একারণে তাঁরা শিখদের সংগেও গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। সর্দারী টিকিয়ে রাখাই ছিল তাঁদের আসল কাম্য বস্তু। লড়াই শুরু হওয়ার প্রাক্কালে যখন উভয় দিকে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন হয়েছে, তখন শাহ ইসমাঈল আমীর সৈয়দ আহমদকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর তাঁবুতে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন, সৈয়দ সাহেব অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন এবং অবিরত বমি করছেন। বমির অবস্থা দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁকে বিষপান করানো হয়েছে।

এদিকে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পেশওয়ারের সর্দারদের যে বাহিনী পাহাড়ের উপর থেকে শিখদের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করছিল সেগুলি ছিল ফাঁকা আওয়াজ। সৈয়দ সাহেবকে অবশ্য লড়াইয়ের ময়দানে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি বিষ ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে একাধারে আটদিন পর্যন্ত বেঁহুশ অবস্থায় ছিলেন। সৈয়দ সাহেবকে বিষ প্রয়োগের বিষয়টি তদন্ত করার পর জানা গেল যে, ওয়ালী মুহম্মদ এবং নজর মুহম্মদ নামীয় দু'জন কাশ্মীরী শিয়া এ কাজ করেছিল। তাঁরা

ইয়ার মুহাম্মদ খান পেশওয়ারীর ভৃত্য ছিল। ইয়ার মুহম্মদ খান তাদেরকে সৈয়দ সাহেবের বাবুর্চির কাজে প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুহূর্তে খিচুড়ি এবং গুড়ের সংগে তারা বিষ মিশ্রিত করে সৈয়দ সাহেবকে খেতে দিয়েছিল। তাদের গ্রেফতার করা হয়; কিন্তু আমীর তাদের অব্যাহতি দিয়েছিলেন। আফগানদের এই বিশ্বাসঘাতকতার পরে সৈয়দ সাহেব জনসাধারণকে পক্ষে রাখার জন্য ব্যাপক প্রচার শুরু করেছিলেন। এরপরে তিনি তাঁর মুজাহিদ বাহিনীসহ বোনের, সোয়াত প্রভৃতি অঞ্চল সফর করেছিলেন।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একদিকে শিখদের সাথে যুদ্ধ এবং অন্যদিকে আফগানদের সাথে বিরোধ চালিয়ে যেতে হলো।

ডোগা নামক স্থানে সৈয়দ ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে শিখ সর্দার হরি সিং–এর বাহিনীর উপর অতর্কিতে হানা দেওয়া হয়েছিল, এতে তিন শত শিখ সৈন্য নিহত হয়। মুজাাহিদ শহীদ হয়েছিলেন মাত্র সাত জন। এরপরে শাগারীতে লড়াই হয়। মুজাহিদ বাহিনীর অধিকাংশ ডোঙ্গা রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। অবশিষ্ট যাঁরা সৈয়দ সাহেবের সাথে ছিলেন, তাঁরা যখন আহারে বসেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিরাট শিখ বাহিনী তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সৈয়দ সাহেব মাত্র বারোজন সিপাহী নিয়ে সে আক্রমণের মুকাবিলা করেছিলেন। তবু প্রায় এক শত শিখ নিহত হয়েছিল। বারোজন মুজাহিদ সবাই রক্ষা পেয়েছিলেন। সৈয়দ সাহেবের একটি আংগুল গুলি লেগে জখম হয়েছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পেশওয়ারের সর্দারদের বিদ্বেষভাব বেড়েই চলছিল। তারা একবার চার হাজার ফৌজ এবং দুটি কামান নিয়ে লুন্ডা নদী অতিক্রম করে উৎমানযাই পলায়ন করেছিল। সৈয়দ সাহেব তখন খার নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহী আফগানদের প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সৈয়দ সাহেব বাহরাম খান, জুমৃআ খান প্রমুখ এবং সেমা ও সোয়াতের সর্দারদের সাথে পরামর্শ করে পেশওয়ারের বিদ্রোহী সর্দারদের উপর দুই দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। ফলে, বিদ্রোহীদের পরাজয় হয়েছিল। এ ছাড়া খাবী খানও বিদ্রোহ করেছিল। শিখরা তাকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করে। হান্ডুয়ায় অতর্কিত আক্রমণে খাবী খান গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। এছাড়া আরও বহু ছোটখাট ঘটনা ঘটেছিল। খাবী খানের নিহত হওয়ার পর

তার ভাই আমীর খান ভিতরে ভিতরে পেশওয়ারের উপজাতীয় সর্দারদের সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তবে প্রকাশ্যে সে সৈয়দ সাহেবের সংগে থাকতো। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সর্দারদের অন্যতম ইয়ার মুহাম্মদ খান সুযোগ পেয়ে আমীর মুহম্মদ খানের এলাকায় সেনা সংগ্রহ করে এবং একদল সৈন্য, ছয়টি কামান এবং হস্তী ও উট সজ্জিত বাহিনী নিয়ে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১২৪৫ হিজরীর ১৫ই রবিউল আউয়াল (সোমবার) ইয়ার মুহম্মদ খানের বাহিনী সংগ্রামের উদ্দেশ্যে যীদাহ্ নামক স্থানে সমবেত হয়। মওলানা ইসমাঈল শহীদ এই বিদ্রোহী বাহিনীকে শায়েস্তা করার জন্য একদল সুশিক্ষিত মুজাহিদ নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালান। মুজাহিদ বাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীদের কামানগুলি দখল করে ফেলেন। গোলন্দাজদের বারুদাগারও তাঁদের আয়ত্তে আসে। ইয়ার মুহম্মদ খান তখন বন্দী সুন্দরী নারীদের নিয়ে মত্ত। সে আহত হয় এবং পেশওয়ার পৌছার পূর্বেই পথে প্রাণত্যাগ করে।

ইয়ার মুহম্মদ খানের মৃত্যুতে তার ভাই সুলতান মুহম্মদ খান প্রতিহিংসা নিবৃত্তির জন্য অন্ধপ্রায় হয়ে ওঠে। সে হান্ডুয়া দুর্গ দখল করে বসে। সৈয়দ সাহেব সে সময়ে তারবিলা নামক স্থানে শিখদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তথাপি তিনি সুলতান মুহম্মদ খানকে দমন করার জন্য হান্ডুয়া অভিমুখে ধাবমান হন। সংবাদ পেয়ে সুলতান মুহম্মদ খান সেখান থেকে দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করে। শিখেরা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো। তারা খাবী খানের ভাই আমীর খানের উসকানিতে হান্ডুয়া দখল করে বসলো। বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ সম্পর্কিত আফগানদের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য শরীয়ত বিগর্হিত প্রথা সম্পর্কিত বিষয়ে হুতী-মরদানের খান আহমদ খান সৈয়দ সাহেবের প্রতি নারায ছিল। সে পেশওয়ারের উপজাতীয় সর্দারদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে যুদ্ধের উসকানি দিতে লাগলো। তাদের বাহিনী মেহার পর্যন্ত অগ্রসর হলো। এদিকে সৈয়দ সাহেব শাহ ইসমাঈল এবং অন্য সংগীদের নিয়ে সসৈন্যে ময়দানে উপস্থিত হলেন। মাত্র কয়েক ঘন্টার যুদ্ধে উপজাতীয় সর্দারগণ পরাজিত হয় এবং তারা নিহত এবং আহত সৈন্যদের মাঠে ফেলে পলায়ন করে।

মেহার যুদ্ধে জয়লাভের পর পেশওয়ার অবরোধ করা আবশ্যক বলে বিবেচিত হলো। কারণ পেশওয়ারই ছিল বিদ্রোহীদের ঘাঁটি।

বিদ্রোহী সর্দারগণ আমীর শহীদের হাতে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলো। মুজাহিদ বাহিনী পেশওয়ার অধিকার করলো। ফলে, পেশওয়ারের প্রাদেশিক সরকার তাঁদের হাতে এসে গেলো। ইমাম আবদুল আযীয কর্তৃক শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত বিশিষ্ট আলিমগণকে সরকারের বিভিন্ন পদে বহাল করা হলো। তাঁরা সেখানে এমন একটি আদর্শ সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার কোন তুলনা হয় না। এ সরকার অদূর ভবিষ্যতে অনায়াসেই সিন্ধুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিপ্লবের ক্ষেত্ররূপে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু পরাজিত আফগান সর্দারগণ সৈয়দ সাহেবের কাছে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে এবং তাদের অধিকার পুনঃ প্রার্থনা করে। সৈয়দ সাহেব এ প্রস্তাবে রাযী হন।

কিন্তু সৈয়দ সাহেবের মুজাহিদ বাহিনী ছোট–বড়ো সকলেই একবাক্যে এ সিদ্ধান্ত ভুল মনে করেছিলেন। মওলানা ইসমাঈল শহীদ বিচক্ষণ হিন্দুস্তানী এবং সৈয়দ সাহেবের অনুগত আফগানগণ এরূপ ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিরুদ্ধে জোর মত প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু সৈয়দ সাহেব কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না।[১]

পেশওয়ারের সর্দাররা তাদের নেতৃত্ব পুনরায় হাতে ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই আফগানদের উত্তেজিত করে এমন ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললো যে, প্রত্যেকটি মহল্লার লোক একজোট হয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের মুজাহিদ এবং সর্দারদের

---

১. সাওয়ানেহে আহমদিয়ার লেখক সৈয়দ আহমদ শহীদের বিশেষ ভক্ত লোক। তিনিও এ ঘটনা লিখতে কুণ্ঠিত হননি। এ ব্যাপারে দলীয় মত যে, তাঁর বিরুদ্ধে সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। বাহরাম খান উপজাতীয় সর্দার ছিলেন। তিনি আমীর শহীদকে বলেন ঃ 'আপনি যদি হুকুমত চালাতে অসমর্থ হয়ে থাকেন, তবে তা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি আমার কওমের সাহায্যে সর্দারদের সাথে বুঝাপড়া করবো। এবং মুজাহিদ বাহিনীর যে–কোন সাহায্য আমার দ্বারা হতে পারে, সেজন্য প্রস্তুত থাকবো। বাহরাম খান ছিলেন সরল প্রকৃতির এবং তাঁর জনবলও ছিল। তা'ছাড়া তিনি আমীর শহীদের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। সাওয়ানেহে আহমদিয়ার লেখকের মতে সৈয়দ সাহেব তাঁর কথায়ও কর্ণপাত করেন নি। প্রথমত আফগানদের সাথে লড়াই করাই উচিত ছিল না। তারপর যখন লড়াই করে তাদের পরাজিত করা হলো, তখন পুনরায় তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভুল ছিল। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই এ ভুল করতে পারে না।

প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে হত্যা করলো। কাবুলে অবস্থানকালে আমি এ বিশৃংখলা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। এ বিদ্রোহের মূলে ছিল সেই আফগান যার কন্যাকে প্রভাব খাটিয়ে বিবাহ করা হয়েছিল। খটকের খানই ছিল এ বিদ্রোহের পুরোভাগে। কন্যার পিতার সাথে খটকের খানের সন্ধি হয়েছিল। ঘটনাটার মূলে ছিল এই যে, খটকের খানের সাথে কন্যার পিতা খেশগীর খানের পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা ছিল। কিন্তু যখন খেশগীর খানের কন্যাকে জনৈক হিন্দুস্তানী শরীয়তের বৈধতার দাবিতে জোরপূর্বক বিয়ে করলো তখন সে অগত্যা খটকের সাথে সন্ধি করলো। সে নিজের সব দাবি-দাওয়া প্রত্যাহার করে বললো, 'বিষয়টা আফগানদের ইজ্জতের প্রশ্ন। আমি আপনার সাথে সন্ধি করলাম। আপনি আমায় সাহায্য করুন।'

খটকের খান এ কথা শোনার পর তার কুমারী কন্যাকে লোকজনের সামনে আহবান করলেন এবং তার মাথার ওড়না টেনে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে তোমার কোন ইজ্জত নেই। যতদিন সেই আফগান কন্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হয়, ততদিন তোমার ইজ্জতের কোন মূল্যই নেই।' এরপর খটকের খান-কন্যা এই বিপ্লব শেষ না হওয়া পর্যন্ত খোলা মস্তকেই ছিল। প্রতি রাতে একদল লোক সাথে নিয়ে খান-কন্যা মহল্লায় মহল্লায় ঘুরে পশ্তু ভাষায় সেই আফগান কন্যার নামে নারী-পুরুষ সবাইকে উত্তেজিত করে তুলতো। এভাবে খান-কন্যা সমগ্র আফগান এলাকায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিল। তার পরিণাম হলো এই যে, আমীর সৈয়দ আহমদ কর্তৃক নির্দিষ্ট পদে নিযুক্ত প্রত্যেকটি মুজাহিদকে তারা এক রাতে হত্যা করে ফেললো। সেই সাথে বিপ্লবী সরকারেরও অবসান ঘটলো।[২]

---

২. পেশওয়ারের জনসাধারণ সর্দার সুলতান আহমদ খান প্রমুখের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতার প্রতি বিরক্ত ছিল। তারা সৈয়দ আহমদ সাহেবকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। পূর্ববর্তী যুদ্ধে পরাজয় এবং জনসাধারণের মনোভাব সুলতান মুহম্মদ খানের মনোবল ভেংগে দিয়েছিল। সুতরাং জনৈক মুহম্মদ উপজাতি সর্দারের মাধ্যমে সৈয়দ সাহেবের কাছে অনুতাপ করে ক্ষমার দরখাস্ত পেশ করলো। সৈয়দ সাহেব তাঁর জমাতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ দরখাস্ত মঞ্জুর করেছিলেন। এর পরে পেশওয়ারে গভর্নর নিযুক্তির প্রশ্ন উপস্থিত হলো। এ জন্য বাহরাম খান প্রমুখও দরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু সৈয়দ সাহেব তাঁদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সুলতান মুহম্মদ খানকেই

মুজাহিদ সরকারের মুফতী, কাযী, শাসনকর্তা এবং সামরিক প্রধান, মোট কথা, সে এলাকার গোটা জমাত নিহত হওয়ায় সৈয়দ সাহেব অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সামরিক কেন্দ্র কাশ্মীর এলাকায় স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত করলেন। কাশ্মীরের পথে বালাকোট ছিল একটি মঞ্জিল। শিখদের ভাবী কর্ণধার শের সিং এই বালাকোটে সৈয়দ আহমদ শহীদের মুজাহিদ বাহিনীর উপর আক্রমণ করলো। মুজাহিদ বাহিনী এখানে এমনভাবে বেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন যে, কোন সিপাই বা আমীর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাননি। অনুসন্ধানের পর প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, আমীর শহীদের খণ্ডিত মস্তক রঞ্জিত সিংকে দেখাবার জন্য লাহোর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাঁর মস্তকহীন লাশ ইসমাঈল শহীদের লাশের সাথে দাফন করা হয়েছিল।

শেখ মুহসিন তাঁর 'আলইয়ানী আলজনী' গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ ''আফগানদের হাতে মুজাহিদ বাহিনী ব্যাপকভাবে নিহত হওয়ায় তিনি এই অভিশপ্ত এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সংকল্প করেন। তখন উপস্থিত মুজাহিদ বাহিনীর লোকদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন, ''আমি এ স্থান থেকে হিজরত করার সিদ্ধান্ত করেছি। অবশ্য কোথায় যাব, তা এখনো স্থির করিনি। আমি আপনাদেরকে বিদায় দিচ্ছি, আপনারাও আমাকে বিদায় দিন।'' মুজাহিদরা বললেন, ''আমরা আপনার সাথেই রয়েছি।''

এরপর তিনি সবাইকে নিয়ে কাশ্মীরের পথে রওয়ানা হন। সময়টা ছিল ১২৪৬ হিজরীর রজব মাস। স্থানীয় অনুগতদের অনেকেই কয়েক মঞ্জিল পর্যন্ত

পেশওয়ারের শাসনকর্তার সনদ দান করলেন। মওলানা সৈয়দ মাযহার আলী প্রধান কাজী এবং তাঁর সহকর্মীরূপে আরও কয়েকজনকে রেখে এলেন। এবার সৈয়দ আহমদ সাহেবের এবং মুজাহিদ বাহিনীর অধিকারে সীমান্তের বিরাট এলাকা এসে গেল। এর পরই সুলতান মুহম্মদ খান বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রধান কাজী এবং ফায়জুল্লাহ খানকে হত্যা করিয়ে ফেললো। এই ফায়জুল্লাহ খানই কিন্তু সৈয়দ আহমদকে বলে সুলতান মাহমুদ খানের ক্ষমা মঞ্জুর করিয়েছিলেন। মুজাহিদ বাহিনী একদিন দেখতে পেলেন যে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় উঁচু গৃহের উপর মশাল জ্বলছে এবং জনসাধারণ উৎসব করছে। কারণ জিজ্ঞাসা করার পর তারা বললো যে, সরকারী ওশ্‌র আদায় করার প্রস্তুতি হচ্ছে। ফসল তোলা হলে কালই সরকারী ওশর দেওয়া হবে। কিন্তু কার্যত যা ঘটলো, তা হলো এই যে, সেই রাতেই এশার নামাযের সময়, মধ্যরাতে এবং শেষ রাতে তহশীলদার এবং বিপ্লবী সরকারের কর্মচারীকে হত্যা করা হলো।

অগ্রসর হয়ে সৈয়দ সাহেব এবং তাঁর সংগীদেরকে বিদায় জ্ঞাপন করেন। সৈয়দ সাহেব কাগান উপত্যকায় পৌছে সেখান থেকে চার শ মুজাহিদের একটি বাহিনী মওলানা শাহ্ ইসমাঈল এবং মওলানা খায়রুদ্দীনের নেতৃত্বে ডেরা ভুকর মংকে প্রেরণ করেন। সেখানে শিখ সর্দার শের সিং বিশ হাজার সৈন্য সাথে নিয়ে মালগুজারীর জন্য ঘাঁটি গেড়ে বসে ছিল। মুজাহিদ বাহিনী তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করলেন এবং তাতে সফলকাম হলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা মুজাহিদদের কাছেই মালগুজারী আদায় করলো। মুজাহিদদের পক্ষে এটা ছিল একটা অভাবিত সুযোগ। ডেরা থেকে অগ্রসর হয়ে শাহ্ ইসমাঈল বালাকোট অধিকার করেন। শের সিং তখন পেশওয়ারে গিয়েছিল। শিখদের প্রধান কেন্দ্র ছিল মুজাফ্‌ফরাবাদ। মওলানা ইসমাঈল শহীদ খায়রুদ্দীন, মোল্লা কুতুবুদ্দীন এবং মনসূর খান কান্দাহারীকে সৈন্যসহ মুজাফ্‌ফরাবাদ প্রেরণ করেন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর মুজফ্‌ফরাবাদ মুজাহিদ বাহিনীর কবলে এসেছিল। শের সিং যখন এ সংবাদ জানতে পারলো, তখন সে মুজাফ্‌ফরাবাদ এবং বালাকোটের মধ্যবর্তী গিড়হি হাবিবুল্লাহ নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলো। বালাকোট প্রাকৃতিক দিক থেকে সুরক্ষিত একটি সুর্গের ন্যায় ছিল। তার চারদিক উঁচু পাহাড়শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এক বিশ্বাসঘাতক মুসলমানের সহায়তায় দুর্গম গিরিসংকট অতিক্রম করে শের সিং এমন স্থানে উপস্থিত হলো, যেখানে মাত্র ৭০ জন মুজাহিদ পাহারায় নিযুক্ত ছিল। শিখ সৈন্যরা তাদের সবাইকে হত্যা করে একটি সুরক্ষিত স্থানে এসে স্থান গ্রহণ করলো। মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল মাত্র হাজার বারোশ। পাহাড়ের পাদদেশে মুজাহিদরা ছিলেন। শিখ সৈন্যরা পর্বতের উপর থেকে মুখোমুখি আক্রমণ করছিল। শিখদের বিপুল সৈন্য বাহিনী পর্বতের উপর থেকে অবিরাম গুলী বর্ষণ দ্বারা মুজাহিদদের কাবু করে ফেললো। এই চরম মুহূর্তে সৈয়দ সাহেব এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদ এবং বাহরাম খান সবাই শিখ সৈন্যদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং সবাই তাদের হাতে শাহাদাতের 'শরাবানতহুরা' পান করলেন। ১২৪৬ হিজরী, মোতাবেক ৬ই মে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে (শুক্রবার) জুমার নামাযের সময় এ ঘটনা ঘটে। সৈয়দ সাহেবের বয়স তখন ৪৬ বছর এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদের বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বছর।

انا لله و انا اليه راجعون –

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হাকীমুল হিন্দ ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তার একশ বছর পরে তাঁরই সুযোগ্য পৌত্র এবং তাঁর সহচরবৃন্দ এ তুমুল জিহাদে শাহাদত বরণ করে এ আন্দোলনকে অমর জীবন দান করে গেছেন।

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

'হৃদয় যাঁর সঞ্জীবিত হয়েছে প্রেমের সুধায় সে চির অমর;
(তুমি দেখিবে) ধরণীর পৃষ্ঠে স্মৃতি তাঁর চিরস্থায়ী।'

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে এ ঘটনা ঘটেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেড় শতাব্দী ধরে উপমহাদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু সে পর্যন্তও তারা সওদাগরের বেশেই নিজেদের ঢেকে রাখা প্রয়োজন মনে করেছিল। এ ঘটনার দুবছর পরে একদিন তারা সওদাগরের মুখোশ সহসা উন্মোচন কবে রাজদন্ডের মালিক বলে ঘোষণা করলো।[৩]

এ আন্দোলন সম্পর্কে মক্কা শরীফ অবস্থানকালে 'আল্ মুসাব্বী' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় কিছু আলোচনা করেছিলাম। মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া নিরর্থক হবে না। 'আল্ মুসাব্বীর' সে সংস্করণ মক্কা শরীফে মুদ্রিত হয়েছিল।

ইমাম আবদুল আযীযের আন্দোলন ব্যাপক হতে হতে ১২৪২ হিজরীতে উপমহাদেশ সীমান্তে আফগানিস্তানের পার্বত্য এলাকায় একটি সামরিক সরকারে পরিণত হয়েছিল। এই শরীয়তী রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ দেহ্লবী। মওলানা আবদুল হাই প্রধানমন্ত্রী। সামরিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে দায়িত্ব ছিল মওলানা ইসমাঈল শহীদের হাতে। এ ছাড়া আভ্যন্তরিক

---

৩. দু'বছর পর্যন্ত তারা আন্দোলনের পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষা করছিল। যখন তারা দেখলো যে, আন্দোলনের মৃত্যু ঘটেছে তখন তারা নিজেদেরকে রাজদন্ডের কর্তা বলে ঘোষণা করলো।

বিষয়ে অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহ, সৈন্য সরবরাহ প্রভৃতির কেন্দ্র ছিল দিল্লীতে। মওলানা মুহম্মদ ইসহাক ছিলেন এ সবের ভারপ্রাপ্ত। ১২৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৩১ খৃস্টাব্দের ৬ই মে কাশ্মীর সীমান্তের নিকটবর্তী আমীর তাঁর সংগীদেরসহ শহীদ হয়েছিলেন। আমাদের মতে সীমান্তের অপর পারে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ইমাম আবদুল আযীযের আন্দোলন। কোন কোন মহল থেকে সৈয়দ আহমদ সাহেবকে কাশ্‌ফ ও কেরামতের অধিকারী সাব্যস্ত করে তাঁকেই গোটা জমাতের ইমাম বলে প্রচার করা হয়েছে। প্রকৃত সত্যের সংগে এর কোন সংগতি নেই। এখানে কাশ্‌ফ ও কেরামতের প্রশ্নই ওঠে না। জমাতের প্রকৃত ইমাম ছিলেন মওলানা আবদুল আযীয। সৈয়দ আহমদ ছিলেন সে জমাতের সিপাহ্‌সালার। এতে সন্দেহ নেই যে, তিনি সামরিক প্রধানের কাজ যথোপযুক্তভাবে পরিচালনার যোগ্য ছিলেন। তাঁর ভুল হয়েছিল; আল্লাহ্ তাঁকে ক্ষমা করুন। আমরা তো বহুদিন থেকে শাহ আবদুল আযীযকেই মান্য করে আসছি এবং একথা কি সত্য নয় যে, সৈয়দ আহমদ সাহেবের বৈশিষ্ট্য অন্য-নিরপেক্ষ ছিল না। মওলানা আবদুল হাই এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদের তাতে অংশ ছিল। তাঁদেরকে সৈয়দ সাহেব সৃষ্টি করেন নাই। তাঁরা ইমাম আবদুল আযীযেরই হাতে শিক্ষাদীক্ষা-প্রাপ্ত ছিলেন। সৈয়দ সাহেবকে অর্থ সরবরাহ করতেন শাহ ইসহাক সাহেব।[৪]

---

৪. আন্দোলনের সংগঠন এবং শৃংখলার দায়িত্ব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মওলানা ইসহাক সাহেবের হাতেই ছিল। 'সাওয়ানেহে আহমদিয়া'র প্রণেতা সৈয়দ আহমদ শহীদ সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করে লেখার ফলে শাহ ইসহাকের পরিচয় লোপ পেয়েছে। এর মূল কারণ ছিল এই যে, মওলানা বেলায়েত আলী মওলানা ইসহাকের প্রতিদ্বন্দ্বী দল গঠন করেছিলেন। 'সাওয়ানেহে আহমদিয়া'র লেখক এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এ সত্ত্বেও তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে এমন কিছু প্রকাশ পেয়েছে, যা আমাদের দাবির পক্ষে যায়। মওলানা ইসহাক পুঞ্জতারে একখানি হুন্ডি প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তা পৌছায়নি। মওলানা ইসহাক তা উদ্ধারের জন্য আগ্রার হাই কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করেছিলেন। মোকদ্দমা মওলানা ইসহাক সাহেবের পক্ষে ডিক্রি হয়েছিল। (সংকলক) 'সাওয়ানেহে আহমদিয়া'র লেখক একথা প্রমাণের জন্য উল্লেখ করেছেন যে, এ আন্দোলন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ছিল না। এলাহাবাদের প্রধান রইসের মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরকে জিহাদের প্রস্তুতির সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। গভর্নর তার জওয়াবে বলেছিলেন যে, ইংরেজদের এলাকায় কোন বিশৃঙ্খলার আশংকা না থাকলে এ ধরনের

ইসহাক সাহেবকে সৈয়দ সাহেব গঠন করেন নি। এ সবই ইমাম আবদুল আযীযের কাজ ছিল। তারপর এ ব্যাপারে যে ভুল হয়েছিল, তার অনিবার্য পরিণাম ছিল পরাজয়। প্রথমাবস্থায় আমি এ সব ঘটনা পাঠ করে অশ্রু বিসর্জন করতাম এবং এই মনে করে যুগের প্রতি দোষারোপ করতাম যে, লোক ইসলাম থেকে বহু দূরে সরে গেছে।

পরে ইউরোপীয় বিপ্লবসমূহের ইতিহাস পাঠ করে আমার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে যায়। আমার এরূপ প্রতীতি জন্মেছে যে, বিপ্লবী আন্দোলন বার বার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার পরেই শুধু সাফল্য লাভ করে এবং লক্ষ্যে পৌছায়।[৫]

সারকথা এই যে, বালাকোটে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং ইমাম আবদুল আযীয় প্রবর্তিত আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। কৌশলী ইতিহাসকারগণ উক্ত আন্দোলনের এখানেই পরিসমাপ্তি টেনেছেন এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ ও আবদুল আযীযের প্রচেষ্টার এখানেই অবসান ঘটে বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।

আন্দোলনে বাধা দেওয়া হবে না। 'সাওয়ানেহে আহমদিয়া'য় এ ঘটনার উল্লেখ আছে। আমি এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট মনে করি। যদি টাকা প্রেরণের দায়িত্ব শাহ ইসহাকের হাতে না হতো, তবে তিনি হাই কোর্টে মামলা কিভাবে করতে পারেন এবং ডিক্রিই বা কিভাবে লাভ করলেন? আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মওলানা মাহবুব আলী মুজাহিদদের কেন্দ্র থেকে দিল্লীতে ফিরে এসে এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এরূপ প্রচার শুরু করলেন যে, এ জিহাদের আন্দোলন একেবারে নিরর্থক এবং ভুল পদক্ষেপ ইত্যাদি। 'সাওয়ানেহে আহমদিয়া'র প্রণেতা লিখেছেন যে, মওলানা মুহম্মদ ইসহাক এবং মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুবের হস্তক্ষেপে সে প্রচার বন্ধ হয়েছিল এবং সৈন্য সরবরাহ শুরু হয়েছিল।

৫. সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথমে ফরাসীতে শুরু হয় এবং তা ব্যর্থ হয়। পরে দ্বিতীয়বার শুরু হয়ে তাও ব্যর্থ হয়। পরে রাশিয়ায় তৃতীয়বার এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কার্লমার্কসের মূল আদর্শ এবং বর্তমানে লেনিনবাদের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও তা সফল হচ্ছে এবং এক বিরাট ভূ-খণ্ডে তাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুতরাং শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলনও ব্যর্থ হয় নি। এ আন্দোলন যে সজীব, তা শায়খুল হিন্দের সাহচর্যের ফলে উপলব্ধি করেছি এবং প্রচ্ছন্ন কর্মপন্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে।

এ আন্দোলনের ইতিহাস লেখক সৈয়দ আহমদ শহীদকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন এবং তাঁকেই এ আন্দোলনের হর্তাকর্তা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে আন্দোলনের সফলতার মূলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ বা ইমাম আবদুল আযীয কারো হাত ছিল না বা পেশওয়ারের সামরিক সরকারের সাথে দিল্লী থেকে মওলানা ইসহাকের নেতৃত্বে এবং কর্তৃত্বে যে অর্থ এবং মুজাহিদ সরবরাহ করা হতো, তারও কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সহজেই আমীর শহীদের শাহাদতের সাথে আন্দোলনের ছেদ টানা যেতে পারে।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রবর্তিত আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়

(এ পর্যায় আরম্ভ হয় ১২৪৬ হিজরীতে। মওলানা শাহ মুহম্মদ ইসহাক এর জনক। ১৩৩৯ হিজরীতে দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের মৃত্যুতে এর যবনিকাপাত হয়।)

বালাকোটের ঘটনার পরে সুদীর্ঘ এগারো বছর ধরে আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা করার পর শায়খ মুহম্মদ ইসহাক আন্দোলনের একটি পূর্ণাংগ কর্মসূচী তৈরি করেন। তাঁর এই কর্মসূচীতে দু'টি মূলনীতি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল–

১. হানাফী মযহাবের অনুসরণ।

২. তুর্কী সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

এতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং মওলানা আবদুল আযীযের আদর্শ এবং কর্মপন্থা যারা পুরোপুরি সমর্থন করেন না, আন্দোলনকে তাঁদের সম্পর্ক থেকে মুক্ত করা হয়। ফলে ইয়মনী এবং নজদী আন্দোলনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এ আন্দোলন অধিকাংশ উপমহাদেশীয় মুসলমানকে এর মধ্যে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

উপমহাদেশীয় মুসলমান সমাজের প্রভাবশালী খান্দানগুলিকেও এ আন্দোলনের সংগে যুক্ত করা সম্ভব হয়। আন্দোলনকে দৃঢ়মূল করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, আন্দোলনের যে সব নেতা হানাফী ফিক্হ এবং উপমহাদেশীয় আধ্যাত্মিক দর্শন পরিত্যাগ করার আহ্বান জানায় তারা আসলে শিয়া দলভুক্ত। অতপর যারা হানাফী ফিক্হ এবং তাসাউফ অস্বীকার করতো ওয়ালীউল্লাহ–পন্থী সাধারণ মুসলমান তাদেরকে ছোট রাফেজী বলতো। আন্দোলনকে অধিকতর সুষ্ঠু এবং জোরদার করার উদ্দেশ্যে মওলানা ইসহাক তুর্কী খিলাফতের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরী মনে করেছিলেন এবং

এ উদ্দেশ্যে তাঁর কর্মকেন্দ্র মক্কা শরীফে স্থানান্তরিত করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুবকে[১] সাথে নিয়েছিলেন। মওলানা মমলুক আলীর[২] নেতৃত্বে মওলানা কুতুবুদ্দীন দেহলবী[৩] মওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন[৪] কান্ধলবী এবং মওলানা আবদুল গনী প্রমুখ সমন্বয়ে গঠিত বোর্ডের দ্বারা আন্দোলনকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তোলার ব্যবস্থাও তিনি করেন। এ জমাত পরবর্তীকালে দেওবন্দ আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করে।

মোট কথা, ইমাম ওয়ালীউল্লাহ প্রবর্তিত আন্দোলনকে নতুন ছাঁচে ঢেলে দিল্লী মাদ্রাসারই আদর্শে দেওবন্দ মাদ্রাসা[৫] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ মাদ্রাসা পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিল, তার মূলে ছিল মওলানা মুহম্মদ ইসহাক সাহেবের নির্ভুল সিদ্ধান্ত।

দেওবন্দের আদর্শ এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি অনুধাবন করার জন্য একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আমি এ আলোচনায় যাঁদের কথা উল্লেখ করতে চাই, তাঁরা দিল্লীস্থ জমাতেরই অংশবিশেষ। মওলানা ইসহাক সাহেবের মক্কা শরীফ হিজরতের পরে তাঁর অনুসারিগণ তাঁকে আর্থিক সাহায্য দান এবং আন্দোলনের আদর্শ প্রচারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন। এই সংগঠনের দায়িত্ব দিল্লী কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ওস্তাদুল হিন্দ মওলানা মমলুক আলী সাহেবের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তাঁর পরে মওলানা ইসহাক এ পদে মওলানা ইমদাদুল্লাহ[৬] সাহেবকে নিযুক্ত করেন। মওলানা ইসহাক মক্কা শরীফে পৌঁছে সেখান থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁকে বহিষ্কারের জন্য ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে উসকানি দেওয়া হয়। এই কূটনৈতিক চাপ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য[৭] মওলানা মুহম্মদ

---

১. ৩২ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
২. ৩৩ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৩. ৩৪ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৪. ৩৫ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৫. ৩৬ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৬. ৩৭ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
৭. সৈয়দ সাহেব এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ ১২৩৮ হিঃ এবং ১২৩৯ হিঃ মোতাবেক ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এক বছরের কিছু অধিক কাল হিজাযে অবস্থান করেছিলেন। এর

ইসহাক শায়খুল হরমের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আশ্রিত হিসাবে হিজাযে থাকার অনুমতি লাভ করেন।

মওলানা মুহম্মদ ইসহাকের হিজাযে অবস্থানের শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত এ–ও ছিল যে, তাঁকে তুর্কী নেতৃবৃন্দের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হতে হবে। যাতে মওলানার সংগে তাদের কর্মগত যোগাযোগ রাখার অসুবিধা না হয় তজ্জন্য তাঁর অনুবর্তী দিল্লীস্থ কর্মীবৃন্দও এ শর্তের প্রতি সমর্থন জানালেন।

দিল্লীতে মুসলিম সম্রাটগণ ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত এ জমাতের লোকগণ নিজ নিজ বাসস্থানে থেকে কাজ করতেন। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীর উপর ইংরেজের সরাসরি কর্তৃত্ব কায়েম হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত লোকদের পক্ষে দেশে টিকে থাকা কোনক্রমেই আর সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁদের কর্মকেন্দ্র এমন স্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল আইনত যেখানে ইংরেজদের কর্তৃত্ব ছিল না।

১৮৫৭ সালে নিরপেক্ষতার প্রশ্নে দিল্লীর সম্রাটের সমর্থক এবং দিল্লীস্থ জমাতের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা উপলক্ষ করে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে এ আন্দোলন দিল্লীতে এককেন্দ্রিক না থেকে দেওবন্দ এবং আলীগড় এই দুই কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মওলানা কাসেম দিল্লী কলেজের আরবী বিভাগ দেওবন্দে স্থানান্তরিত করেন এবং স্যার সৈয়দ আহমদ

পূর্বে ১৮১৮ খৃস্টাব্দে হিজাযের উপর তুর্কী সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈয়দ আহমদ শহীদ নজদে নিজের লোক প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু নজদবাসীরা হিজাযে আসতে পারতো না সেজন্য পত্রবাহকের মাধ্যমে তাঁরা বলে পাঠায়, 'আমরা দোওয়া ব্যতীত আর কিছুই করতে পরি না।' এ ঘটনা আমি মক্কা শরীফে থাকাকালে নজদের নির্ভরযোগ্য আলিমদের কাছ থেকে জ্ঞাত হয়েছি। দিল্লী আন্দোলনকে যে সব ঐতিহাসিক নজদী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে দেখতে চান, তাঁদের মধ্যে যারা এ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন তাঁরা অজ্ঞতার শিকারে পরিণত হন এবং বিপক্ষীয়েরা এটিকে এ রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন।

বালাকোটের ঘটনার পরে আদর্শগত বিরোধ ছাড়াও রাজনৈতিক ব্যাপারেও তারা একমত হতে পারতো না। নজদী এবং ইয়মনী আন্দোলন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে এবং তুরস্ক গভর্নমেন্টের বিপক্ষে ছিল। মওলানা মুহম্মদ ইসহাক তুরস্কের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে ওয়াহাবী আন্দোলনের সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা আবশ্যক বিবেচনা করেছিলেন।

ইংরেজি বিভাগ আলীগড়ে নিয়ে গেলেন।[৮] বৃটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আন্দোলনের কাজ চালানো অসম্ভব ছিল। সেজন্য সরকারের চক্ষে বিশ্বাসভাজন হওয়া তাদের রাজনৈতিক আদর্শের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু দেওবন্দের কর্মকর্তারা যেহেতু মওলানা মুহম্মদ ইসহাক সাহেবের সময় থেকে তুর্কী খিলাফত রক্ষাকে তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ স্থির করেছিলেন, সেজন্য তাঁদের পক্ষে বৃটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্য তাঁরা বৃটিশ রাজনীতি থেকে নিরপেক্ষ থাকাই নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তবে এভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, তুরস্ক এবং বৃটিশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে দেওবন্দের জমাত বৃটিশের ব্যাপারে নিরপেক্ষতা চূড়ান্তভাবে বর্জন করবে।

শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসানকে আমি মশায়েখ চতুষ্টয় মওলানা ইমদাদুল্লাহ, মওলানা মুহম্মদ কাসেম,[৯] মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব দেওবন্দী এবং মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর[১০] স্থলাভিষিক্ত বলে বিশ্বাস করি। দীর্ঘ আঠারো বছর আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে কাটিয়েছি এবং তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ অনুধাবন করে তদনুসারে কাজ করার চেষ্টা করেছি। ফলে দেওবন্দের আদর্শ আমি যতটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি, তা–ই যথাসম্ভব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছি।

বালাকোটে আমীর–ই–শহীদ এবং তাঁর সহকর্মীদের শহীদ হয়ে যাওয়ার পরে একমাত্র মওলানা ইসহাক ব্যতীত দিল্লীর কেন্দ্রীয় জমায়াতের অন্য কোন সদস্যই অবশিষ্ট ছিলেন না। তিনি পরিস্থিতি বিচার–বিশ্লেষণ করে নিজ

---

৮. সার সৈয়দ আহমদ খান ওস্তাদুল হিন্দ মওলানা মমলুক আলী সাহেবের শাগরেদ ছিলেন। মওলানা মমলুক আলী সাহেব শায়খ রশীদুদ্দীনের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন শাহ আবদুল আযীয সাহেবের শাগরেদ। তিনি শাহ সাহেবের কাছে রচনা শিক্ষা করেন এবং তাতে পারদর্শিতা লাভ করেন। তাছাড়া তিনি শাহ আবদুল কাদির এবং মওলানা আবদুল হাই–র কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তবে তিনি বেশীর ভাগ সময় শাহ রফীউদ্দীন সাহেবের কাছেই থাকতেন। মোট কথা, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ খানও শাহ ওয়ালীউল্লাহ–পন্থীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

৯. ৩৮ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১০. ৩৯ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করার পর আন্দোলন টিকিয়ে রাখার পথ পরিষ্কার করেছিলেন। এবং অত্যন্ত দূরদর্শিতার সংগে যথাশক্তি আন্দোলন চালিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয়েছে এবং তাতে সুফল ফলেছে। তাঁর অনুসরণকারীরা পরিস্থিতি বিচার–বিশ্লেষণ করে আন্দোলন নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে জমাত এ নীতি ও আদর্শ সম্মুখে রেখে চলার কষ্ট সহ্য করে এসেছেন। তার বাস্তব রূপায়ণ পাই আমরা দেওবন্দে।

অবশ্য একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, দিল্লীর বাইরে অবস্থিত ওয়ালীউল্লাহ–আন্দোলনের সবগুলি কেন্দ্রই মওলানা ইসহাক সাহেবের নেতৃত্বে একমত ছিল, বরং অপ্রিয় হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বালাকোটের দারুণ বিপর্যয় তাঁর পশ্চাতে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া রেখে যায়। দলে ভাংগন ধরে। মতবিরোধও দেখা দেয়। ফলে, ওয়ালীউল্লাহ্–আন্দোলন দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। আমি অবশ্য দিল্লী (দেওবন্দী) জমাতের কথা যতটা বিস্তারিত জানি, পাটনা অর্থাৎ সাদেকপুরী জমাত[১১] সম্পর্কে ততটা জ্ঞাত নই। তবু আলোচনার উপসংহারে সাদেকপুরী জমাত সম্পর্কে মোটামুট আলোচনা করবো।

বালাকোটের ঘটনার পরে যে সমস্ত মুজাহিদ বেঁচে ছিলেন তাঁরা আমীর–ই–শহীদের লাশ দেখতে পাননি। শিখেরা আমীর–ই–শহীদের খন্ডিত মস্তক নিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় মুসলমানগণ তাঁর লাশ সামরিক মর্যাদায় দাফন করেছিলেন। মুজাহিদদের কল্পনা থেকে পরাজয়ের কথা শত যোজন দূরে ছিল। সেই অস্থিরতার মধ্যে তাদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি হলো যে, হয়তো বা আমীর–ই–শহীদ কোথাও আত্মগোপন করে আছেন। কতগুলি এমন ঘটনাও ঘটেছিল যা এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অনুকূল ছিল। বালাকোটের ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে তিনি অসিয়ত করেছিলেন, 'ধরুন, আমি যদি কয়েক দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যাই তবে আপনারা যেন হতাশ না হন। সবাই যেন নিজ নিজ কাজে অটল থাকেন।' অর্থাৎ তিনি আকার–ইংগিতে সম্ভাব্য ঘটনাবলীর জন্য সবাইকে তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সে পরিবেশে ধীরস্থির হয়ে ভাববার মতো মন–মেজাজ কারো ছিল না। সুতরাং 'আমীর গায়েব হয়ে গেছেন' এ কথা রটে

---

১১. ৪০ নং পরিশিষ্ট দ্রঃ।

গেল এবং শত্রুরা এ কথা দেশময় ছড়িয়ে দিল যেন অতপর প্রেরণা, জিহাদ ও আন্দোলন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

পাটনার মওলানা বেলায়েত আলী বালাকোটের যুদ্ধে শরীক ছিলেন না। ছতান ছিলেন মওলানা ইসমাঈল শহীদ কর্তৃক গঠিত একটি বিশেষ জমাতের বিশিষ্ট সদস্য। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী লিখিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' পাঠের পরে শাহ ইসমাঈল তারই আদর্শে সে জমাতটি গঠন করেছিলেন। তাঁরা নামাযে উচ্চ শব্দে আমীন পাঠ করতেন। জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার অবকাশ রোধের জন্য আমীর–ই–শহীদের অনুরোধে তিনি এ জমাতটি বিলোপ করে দিয়েছিলেন। মওলানা বেলায়েত আলী সেই জমাত পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। মওলানা ইসহাক সাহেবের সংশোধিত কর্মপন্থা তিনি গ্রহণ করেন নি।[১২]

আমীর–ই–শহীদের শাহাদতের সুযোগে মওলানা বেলায়েত আলী স্বাধীনভাবে একটি জমাত গঠনের সিদ্ধান্ত করেন। তিনি হিজায সফরকালে নজ্‌দী-এবং ইয়মনী আন্দোলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য নজ্‌দ ও ইয়মনও ভ্রমণ করেছিলেন।

তিনি তুরস্কের সাথে যোগাযোগ অপেক্ষা আরবের আন্দোলনগুলির সাথে যোগাযোগ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। মোট কথা, মওলানা ইসহাক সাহেব হিজাযে হিজরত করার পর মওলানা বেলায়েত আলী পাটনায় তাঁর নিজস্ব একটি জমাতের বিষয় ঘোষণা করলেন। অপর পক্ষে মওলানা ইসহাক সাহেবের তত্ত্বাবধানে দিল্লীতে জমাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কোম্পানী সরকারের কর্মচারীদের দৃষ্টি থেকে তা গোপন রাখার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ কারণেই তাঁরা কেন্দ্রের ভার মওলানা মামলুক আলী সাহেবের হাতে অর্পণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সরকারী কর্মচারী। মওলানা ইসহাক সাহেব তাঁর বিশিষ্ট লোকজনকে মওলানা মামলুক আলী সাহেবের পরিচালনাধীন ছেড়ে

---

১২. সংশোধিত কর্মপন্থা অর্থাৎ হানফী ফিক্‌হের অনুসরণ এবং তুর্কী খিলাফতের সংগে যোগাযোগ রক্ষা। মওলানা বেলায়েত আলী এ সব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' এবং ইয়মনী ও নজদী মতবাদের বিরুদ্ধ মনে করতেন।

দিয়েছিলেন। এ কারণে মওলানা ইসহাক সাহেবের জমাতের তুলনায় মওলানা বেলায়েত আলী সাহেব কর্তৃক গঠিত জমাত অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল।[১৩]

উপমহাদেশীয় যায়েদী শিয়া শ্রেণীর যে আলিমদেরকে আমীর-ই-শহীদ মওলানা সৈয়দ আহমদ তাঁর জমাত থেকে বহিষ্কার করেছিলেন তাঁরাও মওলানা বেলায়েত আলীর দলে ভিড়ে যান। নওয়াব সিদ্দীক হাসান তাঁর মাধ্যমেই ইমাম শওকানীর শাগরেদ। তা ছাড়া মওলানা নযীর হুসাইন দেহলবী এবং মওলানা আবদুল্লাহ্ গযনবীও মওলানা বেলায়েত আলীর জমাতের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন।

মওলানা বেলায়েত আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমাতের দৃষ্টিভংগি সম্পর্কে বলা হয় যে, আমীর-ই-শহীদ অনির্দিষ্টকালের জন্য নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তাঁর পুনরাগমন পর্যন্ত জিহাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া চাই। তাঁদের ধারণা তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং তাঁর নেতৃত্বে জিহাদ করার পরই তাঁদের মুক্তি হতে পারে। স্পষ্টতই এ ধারণার যৌক্তিক ভিত্তি কিছুই নেই। তবে যে সব বিশিষ্ট আলিম এবং সূফী ওয়ালীউল্লাহ আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলে গণনা করা হয়েছে, তাঁরা এ আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন। সুতরাং উপরোক্ত ধারণা সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, সাধারণ শ্রেণীর লোকদেরকে এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখার জন্য এটি ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল।

মওলানা বেলায়েত আলী উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন[১৪] এবং আফগানিস্তানের সীমান্তে পার্বত্য এলাকায় তাঁর কেন্দ্র

---

১৩. প্রকাশ্যত মওলানা ইসহাক সাহেব উপমহাদেশের আন্দোলন পরিত্যাগ করে আরবে হিজরত করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে মওলানা বেলায়েত আলী সাহেব সে কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মওলানা আরবেও সেই আন্দোলনই পরিচালনা করেছিলেন, যা তিনি দিল্লীতে করেছিলেন।

১৪. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'হুজাজুল কারামাহ্' গ্রন্থে লিখেছেন যে, আজীমাবাদ (পাটনা) এবং বাংলার এক বৃহৎ সংখ্যক লোকের মধ্যে সৈয়দ আহমদ বেরেলভী সম্পর্কে এ ধারণা প্রবল ছিল যে, তিনিই ইমাম মাহদী ছিলেন। সুতরাং তাঁকে মাহদী বলে প্রমাণ করার জন্য চল্লিশটি হাদীস

প্রতিষ্ঠা করতঃ একটি অঞ্চল জুড়ে তাঁর প্রভুত্ব এবং কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর দুশমনরাও একথা স্বীকার করবে যে, তাঁর ব্যবস্থা আমীর-ই-শহীদের সামরিক সরকারের একটি ক্ষুদ্র প্রতীক ছিল।

মওলানা বেলায়েত আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, মওলানা ইসমাঈল শহীদের যে বিশেষ দলের বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেটিকে পুনর্জীবিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এজন্যই মওলানা নযীর হোসাইন এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসানের ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও তাঁর সাথে ছিলেন। মওলানা নযীর হোসাইন প্রথম জীবনে সাদেকপুরের (পাটনা) মওলানা বেলায়েত আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তিনি বিহার থেকে দিল্লীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক এবং তাঁর সহকর্মীদের সংস্রবে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত তিনি মওলানা মুহম্মদ ইসহাকের আদর্শ অনুসরণ করতেন। এরপরে যদিও ঘটনাক্রমে তিনি ওহাবী আন্দোলন এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তথাপি ফতোয়াই-আলমগিরীর সংকলন, হেদায়ার অধ্যাপনা এবং ওয়াহদাতুল ওজুদ তত্ত্বে তাঁর অতীত মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি বিষয় উপেক্ষা করলে মওলানা ইসমাঈল শহীদের পূর্বোক্ত দল পুনর্জীবিত করা ব্যতীত তাঁর যে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তা বোঝা যায়।

মওলানা আহমদ আলী সাহরানপুরী কলকাতাকে এবং মওলানা নযীর হোসাইন দিল্লীকে কার্যস্থলরূপে নির্বাচন করেছিলেন। তাঁদের এই নির্বাচন যে ইংরেজ রাজত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা বলা[১৫] চলে। নিজের জন্মভূমিতে যাতে কাজ করার সুযোগ না থাকে, এজন্যই এ ব্যবস্থা হয়েছিল।

সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁরা সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পক্ষে। তাদের ধারণা, তিনি সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় শহীদ হননি। সুতরাং তাঁরা তাঁর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। এটা মস্তবড় একটা ভ্রান্ত ধারণা। আমীর-ই-শহীদ কবে এমন দাবি করেছিলেন এবং পুনরাবির্ভাবের কথা কবে বলেছিলেন ? ধরে নেয়া যাক, যদি তিনি এরূপ করতেন তবু কেউ তাঁকে বিশ্বাস করতো না।

১৫. ৪১ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

মওলানা বেলায়েত আলীর জমাতের অপর বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান। তাঁর পিতার নাম হাসান বিন্ আলী বিন লুৎফুল্লাহ্ হোসাইনী। তিনি ১২৩৩ হিজরীতে দিল্লী আসেন এবং শাহ আবদুল আযীয এবং শাহ রফীউদ্দীন সাহেবের কাছে অধ্যয়ন করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ সাহেবের সংগে ছিলেন এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১২৫৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

নওয়াব সাহেব নিজে মওলানা সদরুদ্দীন দেহলবীর কাছে অধ্যয়ন করেন। মওলানা ইয়াকুব দেহলবীর কাছে হাদীস পাঠ করেন ও সনদ লাভ করেন। তিনি 'আল হিত্তাহ্' গ্রন্থ্ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থ্ প্রণয়ন না করা পর্যন্ত তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র আদর্শই প্রচার করতেন। পরে তাঁর রাজনৈতিক মতামত তাঁকে ইমাম শওকানীকে অনুসরণ করতে বাধ্য করে।

পরিশেষে সাদেকপুরী জমাতের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে মওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী প্রণীত (সৈয়দ নযীর হোসাইনের বিশিষ্ট ছাত্র) 'আওনোল মা'বুদ' থেকে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করে এ প্রসংগে উপসংহার করবো[১৬]

গাযী শহীদ সৈয়দ আহমদ দেহলবী সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশের এবং কিছু সংখক বিশিষ্ট লোকের[১৭] ধারণা ছিল যে, তিনিই ইমাম মাহদী ছিলেন। তাঁরা আরও মনে করতেন যে, তিনি জিহাদের ময়দানে শহীদ হন নাই। তিনি লোকচক্ষু থেকে অদৃশ্য এবং জীবিত আছেন এবং এই পৃথিবীতেই অবস্থান করছেন। অনেকে এরূপ প্রচার করতে থাকে যে, তারা তাঁকে মক্কা শরীফে তাওয়াফ করতে দেখেছে। আসল কথা এই যে, তিনি সহসা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় লোকেরা মনে করতো যে, সৈয়দ সাহেব অবশ্যই ফিরে

---

১৬. মূল রচনা আরবীতে।

১৭. বিশিষ্ট লোক বলতে এখানে মওলানা বেলায়েত আলী সাহেব। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে এ ধারণা প্রচার করেছিলেন। একদল লোকও তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। পরে তাঁরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। এরা ছিলেন সেইসব লোক যাঁরা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্, শাহ আবদুল আযীয, শাহ ইসমাঈল এবং শাহ ইসহাকের হানফী তরীকা বর্জন করা আবশ্যক মনে করেছিলেন এবং ১৮৫৭ সনে দিল্লীর সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এদেরকে আমি সাদেকপুরী জমাত বলে উল্লেখ করেছি।

আসবেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এবং অমূলক। সৈয়দ সাহেব জিহাদের মাঠে শহীদ হন। সত্যই তিনি লোকচক্ষু থেকে অদৃশ্য হন নাই। এ সম্পর্কে অধিকাংশ বর্ণনাই মিথ্যা এবং কল্পিত। এ সব বর্ণনার ভিতরে যতটুকু সত্য রয়েছে, শুধু ততটুকু অন্তরালে থাকার প্রশ্নটি বিতর্কমূলক হয়ে দাঁড়ায়। তিনি জীবিতাবস্থায় অদৃশ্য রয়েছেন, এটা লোকের ধর্মবিশ্বাসের রূপ গ্রহণ করেছিল। কেউ অস্বীকার করলে তার সঙ্গে তর্ক করার জন্য লোক প্রস্তুত হয়ে যেত । তাদের এ বিভ্রান্তি বিদূরণের জন্য আল্লাহ্র দরবারে নালিশ জানানো ছাড়া উপায় ছিল না। আমি নিজে এই অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন বিশ্বাস থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ওয়ালীউল্লাহ্–জমাতের উপরোক্ত উপদলটির মোটামুটি চিত্র এই। যাঁরা শাহ মুহম্মদ ইসহাকের জমাত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তাঁদের আমি পরিচয় দিয়েছি সাদেকপুরী জমাত বলে।

এবার মওলানা ইসহাকের দিল্লী দলের বর্ণনা করছি। মওলানা ইসহাকের নেতৃত্বে পরিচালিত অন্দোলনের ত্রিশ বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই দিল্লীর সর্বশেষ সম্রাটের সংগে বজ্জাত ইংরেজ কোম্পানীর যুদ্ধ বাঁধলো। সম্রাটের প্রকৃত মর্যাদা যদিও একজন বৃত্তিভোগী জমিদারের ন্যায়ই ছিল, কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টিতে তিনিই ছিলেন দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কোম্পানী সরকারও সম্রাটের নামেই রাজত্ব পরিচালনা করতেন। ঢেঁড়েরায় এরূপ ঘোষণা করা হতো, 'সৃষ্টি আল্লাহ্র, রাজ্য বাদশাহ্র, হুকুম কোম্পানী বাহাদুরের'। এ কারণে জনসাধারণও তাঁকে দেশের বাদশাহ বলে মানতে কোন দ্বিধা করতো না।

১৮৫৭–১৮৫৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীর পতন মুসলিম জগতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমাদের ধারণায় সে–ই সত্যিকারের উপমহাদেশীয়, যে এই পরাজয়কে জাতীয় বিপর্যয় বলে মনে করে।

এই মহাবিপর্যয়কে কেন্দ্র করে মওলানা ইসহাকের দল পুনরায় দু'টি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। মওলানা ইসহাক যাঁদের উপর তাঁর নতুন আন্দোলন পরিচালনার ভার অর্পণ করেছিলেন, তাঁরা ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে সম্রাটের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। পরে যখন পরাজয় হলো, তখন তাঁরা মওলানা ইসহাকের

অনুসরণে মক্কা শরীফে হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে আমীর ইমদাদুল্লাহ, মওলানা আবদুল গনী ও মওলানা ইয়াকুব দেহলবীর সংগে মিলে আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে থাকেন।

এতদ্‌সংগে এ সত্যও লক্ষণীয় যে, মওলানা ইসহাকের অনুবর্তীদের মধ্যে প্রথম সারিতে যে আলিম এবং সূফী–দরবেশগণ ছিলেন, তাঁদের বেশীর ভাগই যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতার ভূমিকা অবলম্বন করেন। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, মওলানা ইসহাক কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন পাটনার সাদেকপুরে একটি দল সৃষ্টি হয়েছিল, অপরদিকে তেমনি তাঁর নিজস্ব দলের ভিতরেও দিল্লীতে একটি বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি হয়। এই দ্বিতীয় দলের প্রধান নায়ক ছিলেন মওলানা নযীর হোসাইন দেহলবী এবং শায়খ মুহম্মদ থানুবী।[১৮]

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইমাম আবদুল আযীযের জমাতে ভাংগনের যে বীজ বালাকোটের পরাজয়ের পর অংকুরিত হয়েছিল, ধারাবাহিকভাবে তার বিষময় কুফল থেকে কোন দলই অব্যাহতি পায় নি। যেভাবে মওলানা ইসহাক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমাত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তেমনি আমীর ইমদাদুল্লাহ্‌র জমাত এবং অনুরূপভাবে শায়খুল হিন্দের জমাতেও বিরোধী দলের অনুপ্রবেশ চলে আসছে। ইমাম আবদুল আযীয কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমাতের ভিতর থেকে এ সব বিরোধী উপকরণ চূড়ান্তভাবে বহিষ্কার[১৯] করার জন্য বিচক্ষণ নওজোয়ান যতক্ষণ পর্যন্ত বদ্ধপরিকর না হবেন, ততক্ষণ এ আন্দোলন দ্বারা কোন ফলপ্রসূ লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হবে না।

ওয়ালীউল্লাহ্–আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবার প্রথমদিকে মওলানা মুহম্মদ ইসহাক পরিচালিত কেন্দ্রীয় পরিষদ আরবে অবস্থান করে এই

---

১৮. ৪২ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৯. শায়খ মুহম্মদ থানুবীর আদর্শই ছিল মওলানা আশরাফ আলী থানুবীর আদর্শ। তিনি শায়খুল হিন্দের রাজনৈতিক আদর্শকে ভ্রান্ত মনে করতেন।
আমি এ নির্দেশ এজন্য দিচ্ছি যে, আমি দেখেছি, ইউরোপের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক দলকে অভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে মুক্ত রাখা প্রথম কর্তব্য মনে করা হয়। এ জন্য তারা সংগ্রাম করতে ভয় করে না।

উপমহাদেশীয় আন্দোলন পরিচালনা করতেন। মক্কায় প্রবাসীরূপে অবস্থান করে মওলানা মুহম্মদ ইসহাক এবং তাঁর পরে আমীর ইমদাদুল্লাহ্কে আন্দোলন সক্রিয় রাখতে যে পরিমাণ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল, তাতে তাঁদের সীমাহীন ধৈর্য এবং স্থৈর্যের স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমার বিশ্বাস, এ গুণ তাঁরা ইমাম আবদুল আযীযের শিক্ষা থেকে লাভ করেছিলেন। ইমাম আবদুল আযীয কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে তাঁরা কখনো এ আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতেন না। মক্কা-প্রবাসীরূপে আমার নিজের এ ধরনের জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলে[২০] এবং শায়খুল হিন্দের মক্কায় অবস্থানের ঘটনাবলী আমার সম্মুখে না থাকলে আমি ওঁদের ত্যাগ ও পরিশ্রমের মর্যাদা অনুধাবন করতে পরতাম না।

دل سن داند و من دقانم و داند دل من

তরজমা ঃ আমার হৃদয় জানে, আমি জানি, আর জানে আমার মন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহীর সর্বশেষ নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার দু'বছর পরে হিজাযে বসবাসকারী আমীর ইমদাদুল্লাহ্ কর্তৃক পরিচালিত শাহ

---

২০. মক্কায় বাস করে গোপন আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না এবং আজো তা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি কর্মরত লোকের উপর শৃঙ্খলাবোধহীন জনতা এমনভাবে চেপে থাকে যে, তার মাথা চুলকাবারও অবসর থাকে না। এ সত্ত্বেও কাজ করার লোককে কোনক্রমে অবসর করে নিতেই হতো। আমি জেনে বিস্মিত হয়েছিলাম যে, শায়খ মুহম্মদ থানুবীর অনুসারী মওলানা আশরাফ আলী থানুবীও আমীর ইমদাদুল্লাহ্র বিশিষ্ট সহচরদের অন্যতম ছিলেন। এভাবে শায়খুল হিন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ হিজায ভ্রমণে এসে সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন, যাতে তিনি কোন গোপন কার্যকলাপ করতে না পারেন। কিন্তু আমি জানি যে, তিনি কাজ চালিয়ে যেতেন এবং এজন্য পূর্ণ অবসরও বের করে নিতেন। এতদ্বারা আমার এ ধারণা স্পষ্ট হয়েছে যে, আমীর ইমদাদুল্লাহও এভাবেই তাঁর কাজের জন্য সময় বের করে নিয়ে থাকতেন। আমি নিজেও এধরনের বিপদের সমুখীন হয়েছি। অবশ্য উপমহাদেশের সংগে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না । তবে ইউরোপে আমার বহু বন্ধুবান্ধব ছিলেন। কাবুলের লোকেরাও আমার সাথে মেলামেশা করতেন। সুতরাং আমাকে বহু অসুবিধায় পড়তে হতো। আমার নিজের এবং শায়খুল হিন্দের অবস্থাদির পরিপ্রেক্ষিতে আমীর ইমদাদুল্লাহ্র অসুবিধা আমি যতটা উপলব্ধি করতে পেরেছি আর কারো পক্ষে ততটা সম্ভব নয়।

মুহম্মদ ইসহাকের কেন্দ্রীয় সংগঠন যাঁরা উপমহাদেশে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাঁরা দিল্লীর কাছাকাছি কোথাও শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার অনুসরণে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে মওলানা কাসেম সাহেব ক্রমাগত সাত বছর চেষ্টা করেন এবং ১২৮৩ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর পতনের নয় বছর পরে, দেওবন্দ মাদ্রাসার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। মওলানা কাসেম সাহেবের উদ্যোগ, চেষ্টা এবং তদবীরের ফলে সাহারানপুর[২১] এবং মোরাদাবাদেও দেওবন্দের দুটি শাখা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যাবত শাহ মুহম্মদ ইসহাকের কেন্দ্রীয় সংগঠনের নেতৃত্ব আমীর ইমদাদুল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত ছিল। তিনি মক্কা শরীফে অবস্থান করেই আন্দোলন পরিচালনা করতেন। দেওবন্দের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর এ মাদ্রাসাকেই জমাতের কেন্দ্র করে নেওয়া হলো। আমীর ইমদাদুল্লাহ্‌র পরামর্শ অনুযায়ী মাদ্রাসার কার্যাবলী পরিচালিত হতো। প্রকৃতপক্ষে আমীর ইমদাদুল্লাহ্‌ই ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রাণ।

দেওবন্দ মাদ্রাসার সপ্তবার্ষিকী নেসাব-ই-তালীম (পাঠ্য তালিকা), কার্যপদ্ধতি এবং মূলনীতি মওলানা কাসেম সাহেব তৈরী করেছিলেন। এই শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ইমাম আবদুল আযীযের শিক্ষানীতি এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আদর্শ সংরক্ষিত ছিল। পরে দুবার দেওবন্দের পাঠ্য-তালিকার রদবদল করা হয়েছে। প্রথমবার মওলানা ইয়াকুব সাহেব সপ্তবার্ষিক কোর্সের

---

২১. ১২৮৩ হিজরীতে দেওবন্দ দারুল উলূম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগে সংগে বিভিন্ন স্থানে তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাহারানপুরে তার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এধরনের শাখার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে চল্লিশটিতে পৌঁছে। দেওবন্দের সমস্ত শাখা বিকেন্দ্রিক ছিল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মাদ্রাসার অধীন এবং তার আইন-কানুনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। প্রথম অবস্থায় যখন আমি জমিয়তুল আনসার সংগঠনের কাজ করতাম, তখন এ সমস্ত মাদ্রাসা বিকেন্দ্রিক রাখার চেয়ে এককেন্দ্রিক করার ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু আমার ওস্তাদ শায়খুল হিন্দের এ ব্যাপারে আগ্রহ ছিল না। তিন বছর পরে মাদ্রাসাগুলি বিকেন্দ্রিক রাখার উপকারিতা বুঝতে পেরেছিলাম। বিকেন্দ্রিক থাকার ফলে শাখাগুলির উপর সরকারী চাপ পড়েনি। অবশ্য এক-কেন্দ্রিকতা বাহ্যত ভালো। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিকেন্দ্রিকতাই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক।

স্থলে অষ্টবার্ষিক কোর্স প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় বার মওলানা শায়খুল হিন্দ জমিয়তুল আনসার আন্দোলন প্রবর্তন করেন। উভয় বারই শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের আদর্শ রক্ষিত হয়। এ মাদ্রাসার পাঠ্য-তালিকা সংস্কারের বেলায় প্রতিবারই আমার সপ্তবার্ষিক কোর্স প্রবর্তন করার খুব ইচ্ছা হয়। আমার আশংকা ছিল, পাছে মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের অনুসরণে নেসাবের রদবদল হলে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে দূরে সরে যাওয়া হবে। তখনও শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র দার্শনিক মতামত প্রচারে যতটুকু সুযোগ ছিল যাতে তার অবসান না ঘটে আমি তাই দেখতে চেয়েছিলাম।

দেওবন্দ শিক্ষাকেন্দ্রের মৌলিক নীতি এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি নির্ধারণ করতেন আমীর ইমদাদুল্লাহ, তাঁর সহকর্মী মওলানা মুহম্মদ কাসেম, মওলানা রশীদ আহমদ, মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব প্রমুখ ব্যক্তি। যাঁরা তাঁদের নির্ধারিত নীতি ও আদর্শের সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারতেন না, তাঁরা দেওবন্দের কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রবেশ করতে পারতেন না। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র জমাত প্রাথমিক পর্যায়ে যে পাঠ্যতালিকা প্রবর্তন করে তার একটা নির্দিষ্ট সীমা ছিল। এতে হানাফী ফিকাহ্ অনুসৃত হতো। দেওবন্দের পাঠ্যতালিকাও তার অনুসরণে প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষার সীমাও তদনুযায়ী নির্ধারিত হয়। অধ্যাপক তৈরী করাও অবশ্য এ মাদ্রাসার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

মাদ্রাসার নির্ধারিত কোর্স সমাপ্তির পরেও যাঁরা শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শন এবং রাজনীতিতে অধিকতর জ্ঞান অর্জনে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা ছিল না এবং নেই। তাঁরা নির্ধারিত পাঠ্যতালিকার সমাপ্তির পর ওস্তাদের সংস্পর্শে আসবেন-এই ছিল অভিপ্রায়। অর্থাৎ ওয়ালীউল্লাহ-দর্শন শিক্ষার জন্য মওলানা কাসেম সাহেব এবং রাজনীতি শিক্ষার জন্য মওলানা ইয়াকুব কিংবা আমীর ইমদাদুল্লাহ্র শিষ্য হয়ে তাঁরা দলভুক্ত হতে পারতেন।

আফগান সরকারের কাছেও এ মাদ্রাসার প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিল। এ কারণে সিন্ধুনদের অপর পারে যারা দেওবন্দের আদর্শে শিক্ষা অর্জন করতো তারা যেন স্বদেশে কোন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হতো এবং তেমন উপদেশ দেওয়া হতো। উপমহাদেশে দেওবন্দপন্থী এবং

অন্যান্য আদর্শপন্থী মুসলমানদের মধ্যে যে মতবেদ সৃষ্টি হয়ে পড়েছিল, সিন্ধুনদের অপর পারেও যাতে তার বিস্তৃতি না ঘটে তৎপ্রতিও খেয়াল ছিল।

মক্কা কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে ওসমানীয়া সরকারের সংগে বন্ধুত্বসূচক সম্পর্ক দৃঢ় হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখারও প্রয়োজন অনুভূত হয়। এছাড়া জরুরী অবস্থার উদ্ভব না ঘটলে বৃটিশ রাজনীতি সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকাও দেওবন্দের নীতি হওয়া উচিত মনে করি।

১৩২৩ হিজরীতে মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহীর মৃত্যুর সংগে দেওবন্দ মাদ্রাসা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটে। প্রথম পর্যায়ের এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলনকে ব্যাপকতর করা এবং মূল আদর্শের সংরক্ষণ। এ সময়ের মধ্যে দেওবন্দের শিক্ষা আন্দোলন উপমহাদেশের সীমা অতিক্রম করে আফগানিস্তান, তুরস্ক, হিজায এবং কাজান প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে । এই সময়ে খৃস্টান, হিন্দু, শিয়া, বেদাতী, উপমহাদেশীয় ওয়াহাবী, ইংরেজি ভাবাপন্ন মুসলিম যুব সম্প্রদায় প্রভৃতি বহু দিক থেকে দেওবন্দের মূল আদর্শের উপর বহু আক্রমণ করা হয়। প্রামাণ্য এবং প্রতিরোধমূলক প্রতিবাদ তৈরী করে সে সব আক্রমণের মোকাবিলা করা হয়।

দেওবন্দ শিক্ষা আন্দোলনের এ ছিল সর্বপ্রথম পর্যায়। এর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় ১৩২৩ হিজরীতে শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর[২২] নেতৃত্বে। ১৩৩৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যুর সংগে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ–আন্দোলনের প্রথম পর্যায় যদি শাহ্ আবদুল আযীযের মৃত্যু পর্যন্ত ধরা যায় এবং ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র কার্যারম্ভের কাল যদি ১১৪৪ হিজরীর পাঁচ বছর পূর্ব থেকে অর্থাৎ যখন থেকে তিনি কুরআনের তরজমা লিখতে আরম্ভ করেন, তখন থেকে ধরা যায়, তাহলে এ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এক শতাব্দীব্যাপী হয়ে দাঁড়ায় এবং তার দ্বিতীয় পর্যায়ও হয় তেমনি এক শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ।

---

২২. ৪৩ নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দেওবন্দ শিক্ষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান সর্ব প্রথম মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রদেরকে জমিয়তুল আনসারের মাধ্যমে সংগঠিত করতে শুরু করেন। এভাবে দেওবন্দে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রগণ একটি সংগঠনের ভিতরে সংহত হন। এ সংগঠনে যেমন উপমহাদেশীয় আলিমরা যোগদান করেছিলেন, তেমনি আফগানিস্তান এবং তুরস্কের আলিমরাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এ ছাড়া অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী সমন্বিত মাদ্রাসার সর্বোচ্চ মান তখন পর্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। তার জন্য নিয়ম–কানুন বিধিবদ্ধ হলো এবং মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ এবং মওলানা কাসেম সাহেব কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থাবলী সর্বোচ্চ মানের অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করা হলো। তা'ছাড়া দেওবন্দ মাদ্রাসাকে দারুল উলূমের (বিশ্ববিদ্যালয়) স্তরে উন্নীত করা হয় এবং দারুল হাদীসকে কলেজের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধে শায়খুল হিন্দ ছিলেন তুরস্কের পক্ষে। জমিয়তুল আন্‌সারের মাধ্যমে তিনিও ওসমানিয়া খিলাফতকে পূর্ণ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেন। তুরস্কে তখন ওসমানিয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। মওলানা শায়খুল হিন্দের আন্দোলন ধর্মীয় ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও বিপ্লবের ইতিহাসে তার একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ফরাসী বিপ্লবও আদিতে এক ধর্মপ্রাণ পন্ডিত ব্যক্তি দ্বারা শুরু হয়েছিল। তাই বলে ফরাসী বিপ্লবের মর্যাদা লাঘব হয় নাই। এখানে শায়খুল হিন্দ কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবের পূর্ণ বিবরণ আমি দিতে চাই না। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক সে কাহিনী[২৩] নিখুঁতভাবে লিখবেন বলে আমার বিশ্বাস।

হিন্দুস্তান, ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান এবং তুরস্কের ইতিহাস এ আন্দোলনকে বাদ দিয়ে কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাছাড়া বিপ্লবী ইউরোপও এ আন্দোলনের মর্যাদা দিতে বাধ্য।

আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, ১২৩৯ হিজরীর পরে শাহ মুহম্মদ ইসহাক ওসমানিয়া খিলাফতের সংগে যোগাযোগের মাধ্যমে আন্দোলনের

---

২৩. শায়খুল হিন্দ আমাকে কাবুলে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে গিয়ে আমি শায়খুল হিন্দের পঞ্চাশ বছরের সাধনার ফল দেখেছি। আমীর আমানুল্লাহ খানের কর্মক্ষেত্রে অবতরণ প্রকৃতপক্ষে শায়খুল হিন্দের জমাতেরই কর্মতৎপরতা। আমীর আমানুল্লাহ্‌র পরাজয়ে আমরা মোটেই ভীত হইনি।

দ্বিতীয় পর্যায় সূচনা করেছিলেন। শায়খুল হিন্দের ওস্তাদ আন্দোলনকে পূর্ণতায় নিয়ে যান। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওসমানিয়া খিলাফতের পতনের সংগে আন্দোলন তার দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করে। ওসমানিয়া খিলাফতকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মওলানা শায়খুল হিন্দ যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার কেন্দ্র ছিল দিল্লী। এ আন্দোলন শুরু করার ফলে উপমহাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন একটা অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়। সুতরাং শায়খুল হিন্দ উপমহাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনে নিজের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেন। আন্দোলন তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে। সংক্ষেপে ওয়ালীউল্লাহ–আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় মওলানা ইসহাক সূচনা করেন। ১২৪৬ হিজরীতে এবং ১৩৩৯ হিজরী অর্থাৎ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসানের মৃত্যুতে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় এখান থেকে শুরু হয়েছিল বলে আমরা মেনে নেই। তৃতীয় পর্যায়ে আন্দোলন যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা হচ্ছে এই ঃ

১ মওলানা শায়খুল হিন্দ ওয়ালীউল্লাহ্–পন্থীদের জন্য শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শন অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়রূপে নির্ধারিত করেছিলেন। এ থেকে আমরা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি। সেটি এই যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শনকে আমরা আমাদের দলের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছি। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শনে বিশ্বাসী অমুসলিমদেরকেও আন্দোলনের সাথে নেওয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় জড়বাদী দর্শনও এতদ্বারা উচ্ছেদ করা সম্ভব। অধিকন্তু এর অর্থনৈতিক মতামত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করতে পারে।

২. মওলানা শায়খুল হিন্দ আলীগড় কলেজের বিপ্লবী অংশকে তাঁর আন্দোলনের পক্ষে ভিড়িয়ে নিয়েছিলেন। দলীয় প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত করার জন্য একদিকে যেমন মওলানা কেফায়েতুল্লাহ এবং মওলানা হুসাইন আহমদ ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁদের সাথে ডাঃ মোখ্তার আহমদ আনসারী এবং মওলানা মুহম্মদ আলীও শরীক ছিলেন। শায়খুল হিন্দের এ কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, পাশ্চাত্য নীতি ও আদর্শকেও দলীয় স্থায়ী কর্মসূচীতে গ্রহণ করা হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম যুবক

যাদেরকে আমরা কলেজপার্টি বলে আখ্যা দিয়ে থাকি, তারা ভবিষ্যতে তুরস্কে কামালপাশা যে কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন, তেমন কার্যসূচীর প্রতি আকৃষ্ট হবে। কিন্তু তুরস্কে কামালবাদের সাথে লা–দীনীয়াত (ধর্মহীনতা)ও প্রবেশ করেছে। আমরা 'লা–দীনীয়াতের' প্রশ্নে নীরব থাকতে পরি না। এ কারণে 'লা–দীনীয়াতকে' বাধা দেবার উদ্দেশ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্–দর্শনকে আমাদের কর্মতালিকায় অপরিহার্য মনে করি।

৩. মওলানা শায়খুল হিন্দ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। আমরা তাঁর কংগ্রেসে যোগদানের এই অর্থ করেছিলাম যে, শন্তিপূর্ণ উপায়ে ডোমিনিয়ান স্টেটাস অর্জন করা আমাদের পার্টির কর্মসূচীর তৃতীয় নীতি। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে কেবল ডোমিনিয়ান স্টেটাসই অর্জন করা যেত।

ওয়ালীউল্লাহ–আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে আমরা উপরোক্ত তিনটি প্রধান মূলনীতি গ্রহণ করেছিলাম। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শেষ হলে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মওলানা ইসমাঈল শহীদ এবং তাঁর সংগিগণ আন্দোলনকে নতুনভাবে জীবন দান করেছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, দ্বিতীয় পর্যায় শেষে মওলানা শায়খুল হিন্দ এবং তাঁর ওস্তাদবৃন্দ যে খেদমত করেছেন, তা'ও আল্লাহ্‌র কাছে নিঃস্বার্থ বলেই গৃহীত হবে। এবং তাঁদের দৃঢ়–সংকল্পের গুণে আন্দোলন তার তৃতীয় পর্যায়ে উপমহাদেশকে মুক্ত ও আজাদ করবে এবং সারা দুনিয়ায় মুক্তির পয়গাম পৌছাবে। একমাত্র আল্লাহ্‌ই সকল সাফল্যের নিয়ামক।

আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। ১১৪৪ হিজরীর ২১ শে যুলকাদাহ্ (১৭৩১ খৃঃ) জুমার রাতে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ স্বপ্নযোগে অবহিত হয়েছিলেন যে, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত করার কালে তাঁর প্রধান ভূমিকা থাকবে ঃ রাজশক্তি অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ায় তার বিলুপ্তি ঘটবে। তাঁর বদলে তাঁর দ্বারাই নতুন সরকারের পত্তন হবে। উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা, রাজনীতি এবং গণ–আন্দোলনের তিনিই নেতা হবেন। তাফহীমাত (১২১–১২২ পৃঃ, ২য় খন্ড)–এ এর তাৎপর্য সম্পর্কে এই

ইংগিত আছে যে, এ স্বপ্ন ফলবতী হবার জন্য তাঁকে নবীগণের ন্যায় ধৈর্যশীল হতে হবে।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ তাঁর চিন্তাধারা অভিজাত সমাজে প্রচার করেছিলেন এবং শিক্ষাদান ও প্রচারের জন্য একটি দলও তৈয়ার করেছিলেন। তারপরে ইমাম আবদুল আযীয সরকার গঠন ও পরিচালনা করার উপয়োগী লোক শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তুলেছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁরা একটি অস্থায়ী সরকারেরও প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বালাকোটে তাঁদের পরাজয় ঘটে। আমীর–ই–শহীদ এবং তাঁর সংগীরা সেখানে শহীদ হন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তাঁরা কেন পরাজিত হয়েছিলেন। এ প্রশ্ন নিয়ে আমি খুবই দ্বিধা–দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম এবং নানা প্রবোধ দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিতাম। কিন্তু বিদেশে থাকাকালে ইউরোপীয় বিপ্লবসমূহের ইতিহাস পাঠ করার পর আমার এই প্রতীতি জন্মে যে, বড় বড় বৈপ্লবিক আন্দোলন একাধিকবার ব্যর্থ হতে পারে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসেও গৃহযুদ্ধের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এগুলি বিপ্লবকে পূর্ণতাদানের উপকরণ। অতপর আমি ধরে নিয়েছি যে, শাহ সাহেবের বিপ্লব যদি একবার ব্যর্থ হয়েও থাকে, তবু তা ব্যর্থতা নয়। পরে আমি আমার দেওবন্দী ওস্তাদবৃন্দের কার্যকলাপকে আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়রূপে গণ্য করেছি। মওলানা শায়খুল হিন্দের মৃত্যুতে সে পর্যায়ের অবসান ঘটেছে। এ পর্যায়ে এসেও আন্দোলন পরাজয় বরণ করেছে। অতপর আন্দোলন তার তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করে নিয়েছে এবং আমি এ আশা নিয়েই বেঁচে আছি যে, এ আন্দোলন পরিণামে জয়যুক্ত হবেই। এতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা–সন্দেহ নেই।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। ফরাসী বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু তার পরাজয় ঘটে। দ্বিতীয় বারের উত্থানেও তা ব্যর্থ হয়। পরে রাশিয়ার লেনিন এ আন্দোলনকে নতুনভাবে সংগঠিত করেন। এ জন্যই এর নামকরণ করা হয় 'থার্ড ইন্টারন্যাশনাল'। কার্ল মার্কসের মূলনীতির সংগে লেনিনের বর্তমান নীতি ও আদর্শের মধ্যে যথেষ্ট

পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু মূলত তা একই আন্দোলন এবং তৃতীয় পর্যায়ে এসে তা সাফল্য অর্জন করেছে এবং এক বিরাট ভূখন্ডের উপর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আমার মতে তৃতীয় পর্যায়ে ওয়ালীউল্লাহ্র রাজনৈতিক অন্দোলনের উপর কামাল পাশার জাতীয় বিপ্লবের প্রভাব থাকবে কিন্তু আন্দোলন পরিচালিত হবে ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শন এবং অর্থনৈতিক মতামত দ্বারা। তাছাড়া শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র সহযোগিতায় যোগ্য রাজনীতিজ্ঞ তৈয়ার করাও জরুরী মনে করা হচ্ছে। শায়খুল হিন্দের আদর্শে এ নীতির ভিত্তিতে একটি দল গঠন করার ইচ্ছা করেছি। উপরোক্ত তিনটি নীতি মূলত শায়খুল হিন্দের অনুসৃত। এই নীতিত্রয় ঃ

১. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শনকে তিনি দেওবন্দের সর্বোচ্চ মানে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করেছিলেন।

২. সেকালে আলীগড় কলেজে কামালী আদর্শ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি আলীগড় কলেজ আন্দোলনকে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে শামিল করতে চেয়েছিলেন। একদিকে যেমন মওলানা কেফায়েতুল্লাহ এবং মওলানা হোসাইন আহমদ ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ডাঃ মোখতার আহমদ আন্সারী এবং মওলানা মুহম্মদ আলী ছিলেন। এতে সন্দেহ ছিল না যে, আলীগড় আর একপা অগ্রসর হলেই সে তুরস্কের কামালী আদর্শের অনুকরণ করবে। আমরা আলীগড়ের এই অগ্রসর দলকে নিজেদের সাথে যোগ করে নিতে চাই। দেওবন্দী জমাতের মধ্যে যাঁরা এ হিম্মৎ রাখেন না, তাঁদের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকা উচিত। শায়খুল হিন্দের সাথে তাঁদের কোন কাজের সম্পর্ক নির্দেশ করারও কোন অধিকার নেই।

و تلك شرائع للشعر قد ما
و قد نسخت لشيخ الهند حالا

তরজমা ঃ প্রাচীন কাল থেকে এই হচ্ছে চিরন্তন ছন্দ আর আজ শায়খুল হিন্দের বেলায় বুঝি তা অচল।

৩. রসূলুল্লাহ্‌র মক্কার জীবনকে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আদর্শ করেছিলেন। তিনি আমাদেরকে বলতেন, নতুন কোন আদর্শকে মানুষের মনে দৃঢ়মূল করার জন্য একটি প্রস্তুতি কালের প্রয়োজন। কর্মীদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করে তোলাও এজন্য আবশ্যক, সুতরাং এই প্রস্তুতি এবং সংগঠনের কালটিকে যথাসম্ভব নিরুপদ্রব রাখা উচিত। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সেই প্রস্তুতিকালের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ কথা স্মরণ রেখে আমরা কংগ্রেসের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করতে চাই।

কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের জাতি তার অতীতের মৌলিক চিন্তা ও কৌশল বিস্মৃত হয়েছে। সুতরাং তাদের এখন ইউরোপীয় রাজনীতি শিক্ষা করেই সাফল্য অর্জন করতে হবে। আফগানিস্তান, তুরস্ক এবং আরবের বিভিন্ন রাষ্ট্র এখন ইউরোপের আদর্শে আপনাদেরকে পুনর্গঠিত করছে। এদেশে এখন আর সম্রাট শাহজাহানের বাদশাহী পুনঃ প্রবর্তন সম্ভব নয়। অবশ্য সেই প্রাণশক্তিই থাকবে, কিন্তু ইউরোপীয় পদ্ধতিতেই রাষ্ট্র চলবে। আমাদের এখন ডোমিনিয়ন স্টেটাস মেনে নেওয়া আবশ্যক। এর ফলে ইউরোপে এক বৃহৎ রাষ্ট্রের সহযোগিতা আমরা অর্জন করতে পারবো। বহু বিষয় বিবেচনা করেই বৃটিশ কমনওয়েল্‌থের ভিতরে থাকা স্বীকার করে নিয়েছি।

কংগ্রেসের সাধারণ সমর্থকেরা বিষয়গুলির তাৎপর্য যথাযথ অনুধাবন করতে অক্ষম। ইউরোপে যে ধরনের বিপ্লব ঘটেছে, তারা এখানেও সেই ধরনের বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে ; কিন্তু আমাদের দেশ বুনিয়াদী প্রশ্নে অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে স্বতন্ত্র। স্বাধীন সংবাদপত্র, বাধ্যতামূলক সাধারণ শিক্ষা এবং সামরিক শিক্ষা ইউরোপে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। পক্ষান্তরে আমাদের জনসাধারণ যেমন শিক্ষায় অনগ্রসর, তেমন সামরিক শিক্ষা থেকে সহস্র যোজন দূরে ; তাদের পক্ষে ইউরোপীয় ধারার বিপ্লব সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালে এ ধরনের বিপ্লবের দু' দু' বার পরীক্ষা হয়ে গেছে। প্রথম পরীক্ষা গেছে রাশিয়ায়। রাশিয়ায় উপযুক্ত গণশিক্ষা ছিল না, এ সত্ত্বেও বিপ্লবী নেতারা বিপ্লবকে সফল করে তুলবেন, কিন্তু কার্যায়নের সময় তাঁরা শতকরা একশ ভাগ ব্যর্থ হলেন। ব্যর্থতার পরে তাঁরা বিপ্লব সার্থক করার জন্য গণ–

শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন এবং স্বৈরতন্ত্র ও ডিক্‌টেটরশীপের সাহায্যে দেশের এক অংশকে প্রস্তুত করলেন, উদ্দেশ্য সফল করার জন্য নীতিও পরিবর্তন করলেন। তবেই গিয়ে তাঁরা সরকার চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন। কার্লমার্কসের অনুসরণকারিগণ লেনিনের কাজ কখনো পছন্দ করবে না। দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে লেনিন বিপ্লবের নীতি ও আদর্শের অনেক পরিবর্তন করেছিলেন। হিন্দুস্তানে বসে যারা রুশবিপ্লবের কাহিনী পাঠ করে, তারা তার তাৎপর্য কখনও বুঝতে পারবে না। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটেছিল তুরস্কে। রুশ জনসাধারণের মধ্যে তবু কিছু প্রাথমিক শিক্ষা ছিল, তুরস্কে তাও ছিল না। সুতরাং আতাতুর্ক তাঁর দেশবাসীকে আরবী হরফ বাদ দিয়ে রোমান হরফের সাহায্যে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে তিনি একনায়কত্বের শক্তি প্রয়োগ করে শীঘ্রই একটি দল সংগঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশ রাশিয়া এবং তুরস্ক উভয়ের চেয়ে পশ্চাৎপদ।

নিঃসন্দেহে আমাদের দেশে একটা ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞান–বিজ্ঞানের সংগে পরিচিত। তাঁরাই কংগ্রেসের পরিচালক এবং তাঁরাই বিপ্লবের অপেক্ষায় দিন গণনা করছেন। কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত বিপ্লব কখনো সার্থক হতে পারে না। অথচ আমাদের দেশের এই মধ্যবিত্ত সমাজ নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের সংস্পর্শে যাওয়া পছন্দ করে না। এ কথা সত্য যে, গান্ধীজী এ সবই বুঝতেন, কিন্তু তিনি একমাত্র গুজরাট ছাড়া আর কোথাও তাঁর আদর্শানুযায়ী সরকার গঠন করতে সমর্থ নন। গান্ধীজী জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন। আমরা তার যথার্থ মূল্য স্বীকার করি। কিন্তু বিপ্লবের জন্য এ–ই যথেষ্ট নয়। মানবতার মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রাণোৎসর্গ করার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলাই হচ্ছে বিপ্লবীর আসল কর্তব্য এবং বিপ্লবকে সাফল্যমন্ডিত করার উপায়। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত চরিত্রে তা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান, কিন্তু তাঁর অনুচরদের মধ্যে শতকরা একজনের মধ্যেও সে গুণ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এজন্যই আমরা গান্ধীজীর দলের কৃত্রিম তোড়জোড়ে আদৌ অনুপ্রাণিত নই।

আমরা আমাদের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কুরআনের নির্দেশ অনুসারে মানবতার মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণা অনায়াসেই সৃষ্টি করতে পারি।

কুরআনের লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ আমাদের দৃষ্টিতে অতুলনীয়। এজন্য আমরা তার ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্য কারো ব্যাখ্যা গ্রহণ করি না। আমাদের শিক্ষিত যুবকদেরকে কুরআনের শিক্ষার মাধ্যমে এই মহত্তম কল্যাণের পথে নিয়ে আসতে পারি। এভাবে যদি হিন্দু যুবকেরা আমাদের উপর নির্ভর করে, তবে আমরা তাদেরকে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শনের সাহায্যে ভগবত গীতা শিখিয়েও সেই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারবো। বাইবেলপন্থীদের বেলায়ও আমরা তাই করতে পারবো। আমরা শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শনের মাধ্যমে বাইবেল শিখিয়েও খৃস্টানদের মানবতার মুক্তির সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হবো।

মোট কথা, শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান আমাদেরকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথমত, দেওবন্দ দারুল্ উলূমের সর্বোচ্চ মানে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শন এবং মওলানা কাসেম সাহেবের গবেষণাপূর্ণ রচনাবলী পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, দেওবন্দের সাথে আলীগড়ের ইংরেজি শিক্ষিত বিপ্লবপন্থীদের সংযোগ সাধন ও রক্ষা করা এবং তৃতীয়ত, বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ বর্জন করে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ভিতরে থেকে স্বতন্ত্র দল হিসাবে কাজ করে যাওয়া।

আমাদের ধ্বনি ঃ প্রথমে ইউরোপিয়ান হও–এর আসল তাৎপর্য, সামরিক চেতনা জাগ্রত করা এবং বিদ্রোহ করায় উদ্বুদ্ধ করা। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর 'খাইরে কাসীর' গ্রন্থের ১১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, সামরিক চেতনা উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্য থেকে লোপ পেয়েছে এবং তা আফগান জাতিতে চলে গেছে। এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার তাৎপর্য ছিল জিহাদের শক্তি–সামর্থ্য অর্জন করা। আফগানদের মধ্যে যেহেতু সামরিক শৌর্যবীর্য বিদ্যমান রয়েছে সুতরাং তাদেরকে সংগঠিত করে ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করা সম্ভব। যুদ্ধ করা এবং প্রাণ দেওয়ার সাহস–শক্তি যে জাতির চরিত্র থেকে বিদায় নিয়েছে, তারা কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। হিন্দু বণিকরাই তাঁর দৃষ্টান্ত। তারা হিসাব–নিকাশে খুব পটু এবং ধনসম্পদের মালিক, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা তাদের নেই। একজন

সাধারণ সৈন্যও অনায়াসে তার ধনসম্পদ দখল করে নিতে পারে। তাই উপমহাদেশীয়রা যদি ইংরেজ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে পাশ্চাত্য সামরিক বিদ্যা শিক্ষা না করে, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের পক্ষে স্বাধীন রাষ্ট্রের শৃংখলা রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না। এ কারণেই অসংখ্য মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকান্দর হায়াত খানকে আমি সমর্থন করি। কেননা, তিনি আমাদের লোকদেরকে সামরিক বাহিনীতে প্রেরণের পক্ষপাতী। অবশ্য সৈন্যবাহিনীতে যারা প্রবেশ করবে, তাদের শতকরা নব্বই জনই যুদ্ধে মারা যাওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু যে দশজন ফিরে আসবে তারাই হবে আমাদের আসল রক্ষক।

এ কারণে আমরা শিক্ষিত শ্রেণীকে ইউরোপীয় সামরিক শিক্ষা অর্জনের জন্য বাধ্য করেছি। ভবিষ্যতে যখন ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ অর্জিত হবে, তখন এরা দেশের কৃষক-মজুরদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারবে। এজন্য কৃষকদেরকেও ইউরোপীয় করে তুলতে হবে। জাতীয় জীবনে কৃষকদের গুরুত্ব উপেক্ষিত হলে স্বাধীনতা অর্থহীন হবে।

আমরা জনসাধারণকে ইংরেজি হরফের সাহায্যে মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। পরিবারের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এমন কেউ যেন না থাকে, ইংরেজি হরফের সাহায্যে যে নিজের ভাষা শিখতে এবং পড়তে না পারে। তারপর তাদেরকে তুর্কী-মুসলমানদের জীবনধারায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তুর্কীরা পাশ্চাত্য নীতি ও আদর্শ অনুসারে তাদের জাতীয় জীবন গড়ে তুলছে। আমরাও সেই প্রগতিশীল মুসলিম জাতির অনুসরণে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের দেশের মতো তুরস্কেও অবিশ্বাসী আছে, সব দেশে সব কালেই তারা থাকবে। কিন্তু সমগ্র তুর্কী জাতিকে যারা অবিশ্বাসী-নাস্তিক জ্ঞান করে তারা আহাম্মক। দুঃখের বিষয়, এ সম্পর্কে আমাদের বড়ো বড়ো আলিমরাও উদাসীন। তাঁদেরকে এ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে। অবশ্য খুব মোলায়েমভাবেই তাঁদেরকে এসব বিষয় বুঝিয়ে দিতে হবে।............ এ কথা দ্বারা আমি আমার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করছি, তা নয় ; আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত যে, এ দেশে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আমি সেই বিপ্লবীদেরই মনোভাবের

প্রতিধ্বনি করছি। আমি রাশিয়া এবং তুরস্কের বিপ্লবীদের জানি। তাদের সবারই প্রায় একই আদর্শ। তাদের ভাষা আলাদা, তাদের ধর্মও আলাদা, কিন্তু সমাজ উন্নয়নের নীতি এক ও অভিন্ন।

কলেজ ও অফিস–আদালতের ইংরেজি শিক্ষিতদের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেকের সন্দেহের ভাব বিদ্যমান। তাঁরা মনে করেন ইংরেজি শিক্ষিতেরা শুধু ইউরোপীয় ফ্যাশনই শিক্ষা লাভ করেছে। দেশে থাকতে আমার নিজেরও এরূপ ধারণা ছিল। তাঁরা দেখেছেন যে, ইংরেজি শিক্ষিতেরা অফিস–আদালতে চাকরি করে––অর্থ রোযগার করে। তারা নিজেদের জীবিকামান এত দূর বৃদ্ধি করে যে, পিতামহের সঞ্চিত অর্থ–সম্পদও তাদের চালচলন ও ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। বিলাসিতা, দুর্বল চিন্তা এবং পৌরুষহীনতার তারা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। অথচ দিনরাত তাদের মুখে পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণ–কীর্তন। তারা বলে, ইউরোপীয় হওয়া ছাড়া মনুষ্যত্ব অর্জন সম্ভব নয়। আমার জীবনে এ শ্রেণীর পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন লোকদের সাথে মেলামেশা করার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছে। দেশে অবস্থানকালে আমি তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করেছি এবং জাতিকে এই পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেছি। এখন আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, এসব বিলাসী দুর্বল–চিত্তদের চেয়ে কৃষকদেরকে পাশ্চাত্য আদর্শে গড়ে তোলা উচিত। পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পর্কে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা ভুল এবং অর্থহীন প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের কৃষক সমাজ অর্থনৈতিক পীড়নে নিষ্পেষিত হচ্ছে। তাদেরকে এ দুর্বিষহ অবস্থা থেকে উদ্ধার করা আবশ্যক। নিজের পায়ে নিজেদের দাঁড়ানো ছাড়া তাদের উদ্ধার লাভের অন্য কোন উপায় নেই, কিন্তু সেজন্য তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। পুঁজিবাদী সরকার শিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। আমাদের কৃষকদেরকে কলেজের শিক্ষা দিয়ে গ্রাজুয়েট তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাদেরকে পাশ্চাত্যের কৃষকদের ন্যায় শিক্ষিত উন্নত করে তোলার জন্য সর্বপ্রথম মাতৃভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । এজন্য আমাদের আরবী বর্ণমালা একটি প্রবল অন্তরায়। যে লোক চব্বিশ ঘন্টা কর্মব্যস্ত, তার পক্ষে এ বর্ণমালার সাহায্যে, যে বর্ণমালা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, শিক্ষাদান এবং শিক্ষা–গ্রহণ উভয়ই দুঃসাধ্য। রোমান বর্ণমালা, যা পৃথক পৃথকভাবে লিখিত

হয়ে থাকে–তা একবার শিখে নিলে সারাজীবন আর কোন অসুবিধা পোহাতে হয় না। টাইপরাইটারের সাহায্যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব। সিপাই হওয়ার জন্য এতটুকু শিক্ষাই যথেষ্ট। এ শিক্ষা কলেজের শিক্ষার ন্যায় ব্যয়বহুলও নয় এবং তাতে সৌখিন এবং বিলাসী হয়ে নির্জীব কাপুরুষ হয়ে পড়ারও আশংকা নেই। মাতৃভাষা লেখা এবং পড়ার অভ্যাস জন্মালে মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকার মারফতে গৃহে বসে নিজ ভাষায় উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা সহজ হবে।

জাতিকে এভাবে শিক্ষিত করে তোলা এ যুগে যত সহজসাধ্য হয়েছে, তা পূর্বে কারো কল্পনায় ছিল না। সুতরাং এ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

এভাবে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা হয়ে গেলে আমার নিজস্ব অন্য কর্মসূচী রয়েছে। আমি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন শরীফের অন্তত চল্লিশটি সূরার ব্যাখ্যা করে সংবাদপত্রের মারফতে তাদের ঘরে ঘরে পৌছাব। এরপরে আশা করি, কোন দজ্জাল এসে তাদেরকে ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তবে যারা প্রকৃতভাবে দজ্জাল, তাদের কথা আলাদা। আমার জীবনের শেষ মকসুদ হচ্ছে এ পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা। কিন্তু সেজন্য মাতৃভাষায় ব্যাপক শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন। অবশ্য কারো কাছে যদি এর চেয়ে উত্তম কোন পরিকল্পনা থাকে, তবে তা উপস্থিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছি।

মুসলিম লীগ কর্মকর্তারা ইংরেজের কর্মচারীরূপে জীবন কাটিয়েছেন। আলিমদের মধ্যে অনেকে মুসলমানের অতীত জীবনযাপন নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ; কিন্তু যে ইউরোপ মুসলিম রাষ্টগুলিকে গ্রাস করেছে, তার সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। এরা খালেদ ইবনে ওলীদ এবং হযরত ওমর ফারূকের নাম করে নানা পরিকল্পনা উপস্থিত করেছেন। আমি ওসব শুনতে নারাজ। ফারূকে আযমকে বুঝতে হলে অন্তত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শন বুঝতে হবে। যে ব্যক্তি শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র দর্শন কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারবে, সে প্রথমেই ইউরোপের প্রতি দৃষ্টি দেবে। তারা অতীত মুসলিম মহাত্মাদের নাম আওড়াচ্ছে বটে, কিন্তু তারা মূল বিষয় সম্পর্কে বে-খবর।

পরিশিষ্ট

১. প্রথম আসফজাহ

প্রথম আসফজাহ বর্তমান নিজামের পূর্বপুরুষ। তিনি সম্রাট আলমগীরের দরবারে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং সম্রাটের অন্যতম সভাসদ ছিলেন। সম্রাট আলমগীরের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আসফজাহের বংশাবলী এখন পর্যন্ত রাজ–সিংহাসনে আসীন আছেন। দিল্লীর সিংহাসনকে দৃঢ় করার চেষ্টা আসফজাহ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিভা ও বিচক্ষণতার সাহায্যে মুহম্মদ শাহের দরবারকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার কার্যে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। অতপর তিনি ব্যক্তিগত উন্নতির দিকে মনোযোগ দেন। এতে তিনি সফলকাম হন। প্রথম দিকে আসফজাহের উপর বাদশাহ্‌র সুনযর ছিল, কিন্তু পরে কুচক্রী সভাসদগণ সম্রাটকে তাঁর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন করে তোলেন। অতপর তিনি নিজের উন্নতির কাজে আত্মনিয়াগ করেন। মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী 'সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ' গ্রন্থের ভূমিকার ১১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'শাহ আবদুর রহীমের পত্রাবলীর এক কপি হায়দারাবাদের ওসমানিয়া ইউনিভারসিটির লাইব্রেরীতে আমি পাঠ করেছি। তাতে নেয়ামুল মুল্‌ক প্রথম আসফজাহের নামে লিখিত একখানা চিঠি দেখেছি। সে চিঠিতে তিনি নওয়াব সাহেবকে মারাঠাদের সংগে জিহাদ করার উৎসাহ দিয়েছিলেন।' আসফজাহের ইতিহাস 'সিয়ারুল মুতায়াখ্‌খেরীন' এবং যাকাউল্লাহ্‌ প্রণীত 'তারীখ–ই–হিন্দ' (নবম খন্ড) দেখুন। ১১৬১ হিজরীতে প্রথম আসফজাহ্‌ ইন্তিকাল করেন।

২. মীরযা মযহার জানেজানাঁ

মীরযা মযহার জানেজানাঁর আসল নাম শামসুদ্দীন হাবিবুল্লাহ। তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সৈয়দ এবং তাঁর পূর্বপুরুষ রাজ–দরবারের আমীর–উমরাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তৈমুরী খান্দানের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক

ছিল। তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শী সুপন্ডিত ছিলেন। ১১৯৫ হিজরীর মুহর্‌রম মাসের ৭ তারিখ গভীর রাতে আততায়ীর দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তিনদিন পরে ইন্তিকাল করেন। (খাযীনাতুল আসফিয়া) মওলানা সিন্ধীর অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি 'আত্‌তাহমীদ' গ্রন্থে লিখিত আছে, ইমাম রব্বানীর মুজাদ্দাদিয়া তরীকার বিশিষ্ট সূফীদের মধ্যে ইমাম শামসুদ্দীন হাবিবুল্লাহ মুহম্মদ মযহার জানেজানাঁ অন্যতম। তিনি শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমসাময়িক ছিলেন। শায়খ মুহসিন তাঁর 'ইয়ানে জানী' গ্রন্থে ইমাম রব্বানী সাহেবের কথা আলোচনার পর লিখেছেন যে, মীরযা মযহার জানেজানাঁ তার পরবর্তী শাগরিদদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শহীদ-ই-দেহলবী বলে আখ্যাত হয়েছেন। তিনি হযরত আলী (কঃ)-এর পুত্র মুহম্মদ বিন্ আল্ হানফিয়ার বংশধর। তিনি বহু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আলহাজ মুহম্মদ আফযাল শিয়ালকোটীর কাছে তিনি হাদীস শিক্ষা করেছিলেন এবং মুজাদ্দাদিয়া তরীকার ইমাম রব্বানীর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন শাগরিদ ছিলেন। সুন্নতের অনুসরণকারী এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন (কাশফ) হিসাবে তাঁর স্থান ছিল অতি উচ্চে। তাঁর জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর ওস্তাদ শায়খ আফযাল শিয়ালকোটী, ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ এবং আল্‌হাজ ফাখের এলাহাবাদী প্রমুখ তাসাউফ এবং হাদীসের ইমামগণ সাক্ষ্য দান করেছেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহম্মদ হায়াত সিন্ধী মদনী তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- কোন হাদীস হানাফী মতের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও মীরযা জানেজানাঁর প্রমাণে সে হাদীস পালন করা উচিত। তিনি মুহররম মাসে শহীদ হয়েছিলেন। মীরযা মযহার জানেজানাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ ছিলেন কাযী সানাউল্লা উমুরী ওসমানী। তিনি পানিপথের অধিবাসী এবং ফিক্‌হ্, অসূল, তাসাউফ ও ইজতিহাদে পারদর্শী ছিলেন। হানাফী ফিকাহের কোন কোন মাস'আলা তিনি নির্ধারণ করেছেন। ফিক্‌হ, তফসীর এবং তাসাউফ সম্পর্কে তাঁর কোন কোন গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মীরযা জানেজানাঁ তাঁর এ শিষ্যদের জন্য গর্ববোধ করতেন।

'আত্ তাহমীদ'-এ উল্লেখ আছে-মীরযা জানেজানাঁ এবং ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ পরস্পর প্রীতি এবং সহযোগিতায় ভ্রাতৃতুল্য ছিলেন। এই দুই মহান ব্যক্তির জন্য আজো দিল্লী গৌরববোধ করে।

মীরযা মযহার জানেজানাঁ দিল্লীর কোন শিয়া প্রধানের ভৃত্যের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর একটি কবিতা ঃ

به لوح تربت من یافتند از غیب تحریری
که این مقتول را جر بے گناهی نیست تقصیری

তরজমা ঃ
আমার কবরের স্মৃতিফলকে দেখবে
গায়বী হাতের একটি লেখা,
এই শহীদের দোষ শুধু এই যে,
তার কোন দোষ নেই।

আমীরুর্ রওয়াত গ্রন্থে আছে ঃ মীরযা সাহেবের হত্যায় দিল্লীর শাসনকর্তা নজফ আলী খানের হাত ছিল। সে ছিল ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে রাফেজী।

৩. ইজ্‌তিহাদের যোগ্যতা (মুজতাহিদানা কামাল)

বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্য হাদীস, ফিক্‌হ এবং ইজতিহাদে যোগ্যতা অর্জন অপরিহার্য। ইজতিহাদ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর আল্‌মুসাফ্‌ফায় লিখেছেন--প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ 'ফরযে কিফায়ার' অন্তর্গত। এখানে ইজতিহাদের অর্থ নিরপেক্ষ ইজতিহাদ নয়। যেমন, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের ইজতিহাদ ছিল। আমার বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ অবশ্যকরণীয় কাজ। এ কথার তাৎপর্য এই যে, যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন সমস্যাও দেখা দেবে। এ সব সমস্যা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিধান কি, তা জানা অপরিহার্য। পূর্বের সিদ্ধান্ত কখনও চূড়ান্ত গণ্য হতে পারে না। তা ছাড়া গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রমাণসিদ্ধ দলীল ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মুশকিল আরো এই যে, বহু ইজতিহাদের গোড়া খুঁজে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় নতুন করে ইজতিহাদ করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই। আপন সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হতে পারলে

কোন বৈপ্লবিক কার্যে হাত দেওয়া যায় না। স্বাধীন ইজতিহাদের তিনটি স্তর বিদ্যমান।

প্রথমত, শরীয়তের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীনকে ইমাম মান্য করা অপরিহার্য। যারা শুধু কুরআন থেকেই প্রেরণা লাভ এবং ইজতিহাদ করতে চায়, আমরা তাদেরকে মুজতাহিদ মানতে পারি না। তারা প্রকৃতপক্ষে মুজতাহিদ নয়, তারা উত্তরাধিকারলব্ধ জ্ঞানকে কুরআনের পোশাক পরিয়ে উপস্থিত করতে চায়। খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ সম্মুখে রেখে যাঁরা ইজতিহাদ করেন, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ মুজতাহিদ। তিনজন ইমাম তার দৃষ্টান্ত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে ইমাম শাফেয়ীর অনুসরণকারী বলে আমি মনে করি। ইমাম আহমদ, ইবনে হাম্বল এবং ইমাম শাফেয়ীর মতামত একত্র করলে বিরাট একটা কিছু হতে পারে, যেমন ইমাম মুহম্মদ এবং আবু ইউসুফের মযহাব ইমাম আবূ হানীফার মযহাবের সাথে যুক্ত হয়ে একটি ব্যাপক মযহাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশ–দেশান্তরের আলিমদেরকে আকৃষ্ট ও সম্মোহিত করে রেখেছে। আমাদের মতে ইমাম হাম্বলের মযহাব ইমাম শাফেয়ীর মযহাবের পরিশিষ্টের শামিল। এ সম্পর্কে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ তৎকৃত 'আল্ আনসাফে' উল্লেখ করেছেনঃ 'ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহম্মদের মযহাব যেমন আবূ হানীফার মযহাবের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মযহাবের সাথে তাঁর শিষ্যদ্বয়ের মযহাব যেমন একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে, ইমাম শাফেয়ীর মযহাবের সাথে ইমাম হাম্বলের মযহাব তেমনভাবে সংযুক্ত করা হয়নি। এজন্যই তাঁদের দু'জনকে পৃথক পৃথক মুজতাহিদরূপে গণ্য করা হয়ে আসছে। অবশ্য এখনো যদি কেউ চেষ্টা করে, তবে এ দু'টি মযহাবকে একসাথে সংগঠিত করা কোন কঠিন কাজ নয়। (আত–তামহীদ) আমি আশা করি, হাম্বলী–পন্থিগণ ইমাম শাফেয়ীর মযহাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন এবং অনুরূপভাবে শাফেয়ী–পন্থিগণ ও হাম্বলী মযহাব অবলম্বিগণ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারলে মিল্লাতে ইসলামের বিরাট কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

ইজতিহাদের দ্বিতীয় স্তর হলো, কোন নিরপেক্ষ মুজতাহিদকে ওস্তাদরূপে মেনে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে এ বিদ্যা শিক্ষা করা। তবে ওস্তাদের ন্যায়

তাদেরও খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রতি সরাসরি পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে। সাহেবায়েন অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহম্মদ তার উদাহরণ। এঁরা হচ্ছেন নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ। বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য ন্যূনপক্ষে এ শ্রেণীর যোগ্যতা প্রয়োজন।

ইজতিহাদের তৃতীয় স্তরে আছেন বিভিন্ন মযহাবের ঐক্যসূত্র আবিষ্কারকারী। এঁরা খুলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত যান না। পূর্বে যে সমস্ত মুজতাহিদ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এঁরা সেগুলোর মূলনীতি পর্যালোচনা করে একটা শৃংখলায় সুসংবদ্ধ করেন। এ শ্রেণীর মুজতাহিদগণ ইসলামের ঘরোয়া শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে কাজী বা মুফতীরূপে কাজ করতে সক্ষম। এ সংগঠন সমাজে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে। হানাফী মযহাবে এ শ্রেণীর মুজতাহিদদের মধ্যে শামসুল আয়েম্মা সারখ্সীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে হানাফী মযহাবের এ শ্রেণীর যে বহু মুজতাহিদ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা অতুলনীয়। খোরাসানের এক একটি গ্রামে দশ দশ জন এ জাতীয় ঘরোয়া মুজতাহিদ অতীত হয়েছেন। হানাফী মযহাবের স্থিতিশীলতার এই ছিল কারণ, যে জন্য রাজত্ব চলে যাওয়ার পরেও জনসাধারণের মধ্যে সে মযহাব টিকে রয়েছে এবং তার বিরুদ্ধতা ইসলামের বিরুদ্ধতারূপে গণ্য করা হচ্ছে।

৪. শাহ্ সাহেবের প্রতি স্বপ্নযোগে ইলহাম

মূল স্বপ্নটির বর্ণনা শাহ্ সাহেব প্রণীত 'ফুয়ূযুল হারামাইন'–এর ৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের নীতি এই যে, সেখানে শাসকগোষ্ঠী ছাড়া অন্য কেউ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারে না। এজন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে যাঁরা কবি–সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরা তাঁদের কাব্য, গল্প, কাহিনী, স্তুতি নানা উপদেশাত্মক রচনার মাধ্যমে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতেন। যাঁদের এভাবে মত প্রকাশের সুযোগ না হয়, তাঁদের চিন্তা ও কল্পনা ভবিষ্যৎ ঘটনার রূপ ধরে স্বপ্নরূপে দেখা দেয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এ ধরনের স্বপ্ন তাঁদের অনুসরণকারিগণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে থাকে এবং তাৎপর্য আবিষ্কারে তৎপর হয়। অনতিকাল মধ্যে দৃষ্ট স্বপ্ন বাস্তব ঘটনারূপে দেখা দিতে থাকে।

শাহ্ সাহেব তাঁর সংস্কার আন্দোলনের পরিকল্পনা মক্কা শরীফে প্রণয়ন করেছিলেন। সেই পরিকল্পনাটিকে তিনি একটি স্বপ্নের কাঠামোয় বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

১১৪৪ হিজরীর ২১শে যিলকাদ জুমার রাত্রিতে মক্কায় আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এ যুগে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার একটি উপলক্ষরূপে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দিষ্ট করেছেন। দেখতে পেলাম, কাফির সর্দারদের দ্বারা মুসলিম নগরীগুলো বিজিত হয়েছে। তাদের ধনসম্পদ লুন্ঠিত হয়েছে এবং তারা বন্দী হয়েছে । আজমীরের ন্যায় শহরে কুফরী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইসলামী আইন-কানুন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি আমার প্রতি ক্রোধের রূপ পরিগ্রহ করলো। ক্রোধ যেন সংগ্রামের রূপ নিয়ে আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এখন কি করা যেতে পারে?' আমি উত্তর করলাম قد كل نظام অর্থাৎ 'সব অবাঞ্ছিত সরকার ভেংগে দাও।' এর পরে সমবেত লোকদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। আমি যেন একটি শহর ধূলিসাৎ করার জন্য তার কাছাকাছি পৌছেছি। আমার পশ্চাতে পশ্চাতে অসংখ্য লোক শহরগুলিকে একটার পর একটা ধ্বংস করতে করতে আজমীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। দেখলাম তারা যেন কাফির সর্দারকে হত্যা করে ফেলেছে এবং তার কন্ঠশিরা দিয়ে প্রবলবেগে রক্ত বের হচ্ছে।

এ স্বপ্নের তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করলে এই মনে হয় যে, ক্রমবর্ধমান মারাঠা শক্তি দমন করার দিকেই এর নির্দেশ রয়েছে এবং শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ই হবেন তার মাধ্যম। আজমীর ছিল দিল্লীর আত্মার শামিল। সেজন্যই হয়ত আজমীরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরে আগমন করেন এবং আজমীর থেকেই ইসলাম প্রচার শুরু করেন যার ফলে দিল্লী বিজিত হয়।

স্বপ্ন দেখার দু'বছর পর ১১৪৬ হিজরীতে বাজীরাও উত্তর উপমহাদেশ আক্রমণ করেন। অপর দিকে ১১৫০ হিজরীতে নাদির শাহের অভিযানের ফলে পূর্বতন শাসন ব্যবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। নাদির শাহের পরে আহমদ শাহ আবদালী অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। মুসলমান বাদশাহ্দের

মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ এবং সরকারে অকর্মণ্যতা ও দুর্বলতা প্রকাশ ছাড়া এ সমস্ত অভিযান দ্বারা অন্য কোন ফল হয়নি। তবে আহমদ শাহ আবদালী ১১৭৪ হিজরীতে পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন।

উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা আহমদ শাহ্ আবদালীকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে নওয়াব নজীবুদ্দওলাহ্ ছিলেন নেতৃস্থানীয়। তিনি যে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন এ ঐতিহাসিক সত্য সবারই জ্ঞাত থাকার কথা।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সংস্কার কর্মপন্থায় জরাজীর্ণ সরকারের উচ্ছেদ সাধনকেই মূলনীতিরূপে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ এবং তাসাউফের উপর লিখিত প্রায় পঞ্চাশখানা গ্রন্থে প্রসংগক্রমে সমাজের পুঞ্জীভূত গলদের বিস্তারিত বর্ণনা এবং সে সবের প্রতিকারের উপায়রূপে আমূল সংস্কারের প্রয়োজন সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।

৫. শাহ্ সাহেবের স্বাধীন নেতৃত্ব

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মূলনীতি উপেক্ষা করে ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শ বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এমনকি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ বর্জন করে সরকার গঠনের চেষ্টা করলে তাতেও ব্যর্থকাম হওয়ার পূর্ণ আশংকা রয়েছে। তিনি তাঁর 'তাফহীমাতে ইলাহিয়ায়' (৮১ পৃঃ) উল্লেখ করেছেন যে, 'আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের নতুন পন্থা আমাকে দান করা হয়েছে।' এই নতুন তরীকা বা পন্থা দ্বারা যাবতীয় পুরাতন তরীকা বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য সাধারণ মানুষ গতানুগতিকতাই পছন্দ করে। এই গতানুগতিকতার প্রতি একটা মোহ বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহ্‌র নৈকট্য গতানুগতিকতার দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার বিধি এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে একই কার্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং পরস্পর অবিচ্ছেদ্য বিবেচনা করেছেন।

তিনি সরকারের নাম দিয়েছেন প্রকাশ্য 'খিলাফত' এবং সরকার গঠনকারী দলের নাম দিয়েছেন 'গুপ্ত খিলাফত'। একালের পরিভাষায় প্রথমটিকে সরকার

এবং দ্বিতীয়টিকে সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দল বলা যেতে পারে। রাজনীতিতে এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না, উভয়ই সমান মর্যাদার দাবিদার। শাহ সাহেব দুইয়ের জন্য ইসলামে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট পরিভাষা খিলাফত শব্দ ব্যবহার করেছেন।

শাহ সাহেব দু'ভাগে পৃথক করে এদেরকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অবশ্যই রাজনৈতিক দলের গঠন ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন, নতুবা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হতে পারে না। ব্যবহারিক অথবা নৈতিক, আধ্যাত্মিক অথবা রাজনৈতিক সমস্ত ক্রিয়াকর্মই শাহ সাহেবের নিকট এক এবং অভিন্ন--সকলের উৎস এক। অতপর আমরা বলতে পারি, শাহ সাহেবের তরীকা ব্যতীত আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাঁর নীতি বর্জন করে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব।

শাহ সাহেবের উপরোক্ত কথার তাৎপর্য এই যে, আধ্যাত্মিক তরীকা, মযহাব ও রাজনীতি সব ব্যাপারেই তাঁর পদ্ধতি আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের উপলক্ষ হতে পারে। তিনি বলেছেন, এই মযহাব এবং তরীকার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন আদর্শ দেখতে পাবে না, এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন আধ্যাত্মিক সাধনারীতিও দেখতে পাবে না, যা নিখুঁত প্রেরণার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আধ্যাত্মিক সাধনার বহু পদ্ধতি বিদ্যমান আছে এবং মযহাবও বহু রয়েছে। ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু এ সমস্ত পথে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব এবং ফলপ্রসূও বটে; কিন্তু প্রেরণার মূল উৎসে ওসব পথে যাওয়া যায় না।

উপরোক্ত আলোচনা আধ্যাত্মিক তরীকাগুলির বিষয়ে হলেও আমাদের মতে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ রাজনীতিতেও সমগ্র বিশ্বের নেতৃস্থানীয়। উপমহাদেশে তো বটেই, ইউরোপেও। তাঁর মূলনীতি বর্জন করে কোন রাষ্ট্র কায়েম থাকতে পারে না। এ সম্পর্কে আমি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করতে পারতাম, কিন্তু আমার পরিবেশ তার অনুকূল নয়।

৬. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র মাদ্রাসা

পিতার মৃত্যুর পর শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মাদ্রাসা–ই–রহীমিয়ায় অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। ১১শ শতাব্দীর শেষে ১২শ শতাব্দীর প্রথম দিকে শাহ আবদুর রহীম পুরাতন দিল্লীতে এই মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ই মাদ্রাসা–ই–রহীমিয়া নামে পরিচিত। (হায়াত–ই–দিল্লীর ২২ পৃঃ)

শাহ সাহেবের জ্ঞান ও গবেষণার খ্যাতি যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বিভিন্ন স্থান থেকে অধ্যয়নের জন্য ছাত্ররা এসে ভিড় করতে থাকে। ফলে পুরাতন অট্টালিকায় স্থান সংকুলান অসম্ভব হয়। তখন সম্রাট মুহম্মদ শাহ ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌কে ডেকে শহরের একটি বড়ো অট্টালিকায় দারুল হাদীস স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। এই অট্টালিকাটি বাদশাহ দান করেন। পুরাতন মাদ্রাসার স্থান জনশূন্য হয়ে পড়ে। এই নতুন মাদ্রাসাটি এককালে খুব বড় এবং জাঁকজমকশালী ছিল। বস্তুতপক্ষে উহাকে উচ্চস্তরের দারুল উলূম বা বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য করা হতো। মাদ্রাসাটি ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় ছিল। বিপ্লবের সময় মাদ্রাসাটি নাস্তানাবুদ হয়। মাদ্রাসার দরজা–জানালা এবং তার কড়ি–বরগা পর্যন্ত লুন্ঠিত ও অপহৃত না হলে আজো হয়তো মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকতো। মাদ্রাসা এলাকার পরিসর এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে সেখানে বহু লোকের বসতি স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এলাকাটি শাহ্ আবদুর রহীমের নামেই পরিচিত। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র পরে তাঁর চার পুত্রই মাদ্রাসায় অধ্যাপনার কাজ করতেন। ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্ররূপে এ মাদ্রাসা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। শাহ সাহেবের পুত্রদের অবর্তমানে শাহ ইসহাক মুহাজিরে মক্কা এ মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মওলানা মুহম্মদ ইসহাক ১২৫৬ হিজরীতে মক্কা শরীফ হিজরত করার পর মওলানা রফীউদ্দীনের প্রতিনিধি মওলানা মাখসুসুল্লাহ এবং মওলানা মূসা এ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধান করতেন। আবদুস সালাম নামে এক শিশু পুত্র রেখে মওলানা মূসা ইন্তিকাল করেন। মওলানা মাখসুসুল্লাহও পরলোকগমন করেন। তখন খান্দানে নাবালক আবদুস সালামকে শিক্ষা দেবার মতো কেউ বেঁচে

ছিলেন না। মোট কথা, কয়েক পুরুষ পরে তাঁদের এই ধারা অবলুপ্ত হলো। তারপরে সম্পূর্ণ জায়দাদ রায় বাহাদুর লালা শিব প্রসাদের হস্তগত হয়। এজন্যই সেই গলিতে 'মাদ্রাসা–ই–লালা রামকিষণ দাস' ফলক লাগানো হয়েছে।

দ্রষ্টব্য ঃ মৌলভী বশীরুদ্দীন প্রণীত 'দারুল হুকুমত দিল্লী' গ্রন্থ্ পৃঃ ১৬৭ ও ২৮৬ ।

৭. মওলানা মুহম্মদ আশেক ফুলহাতী

'আত্–তাহ্মীদ' গ্রন্থের উর্দু ভাগে মওলানা সিন্ধী লিখেছেন যে, অসংখ্য আলিম শাহ সাহেবের দরবারে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতেন। এমন কি মক্কা–মদীনা থেকেও জ্ঞান সঞ্চয়ের আগ্রহে শাহ্ সাহেবের দরবারে শিক্ষার্থীরা দিল্লীতে আগমন করতেন। কিন্তু শাহ সাহেবকে যাঁরা পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তাঁদের সংখ্যা তিন–চার জনের বেশি ছিল না––তাঁরা ছিলেন ঃ

(১) মামাত ভাই, শাহ মুহম্মদ সাদেক।

(২) জামালুদ্দীন শাহ মুহম্মদ আমীন কাশ্মিরী।

(৩) শাহ নূরুল্লাহ বুড্ডানভী।

(৪) শাহ আবু সাঈদ বেরেলভী।

প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন মওলানা আবদুল আযীযের ওস্তাদ এবং ৪র্থ জন শাহ আবু সাঈদ ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র খলীফা এবং সৈয়দ আহমদ শহীদের মাতামহ (২৩ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ 'তাফহীমাতে ইলাহিয়ায়' (১ম খন্ড ঃ ১২৫–১২৬ পৃঃ) লিখেছেন ঃ 'শায়খ মুহম্মদ আশেক ছিলেন শায়খ উবাইদুল্লাহ্র পুত্র, শায়খ উবাইদুল্লাহ্র পিতা শায়খ মুহম্মদ ছিলেন আমার মাতামহ। শিশুকাল থেকেই শায়খ আশেকের সাথে আমার বিশেষ অন্তরংগতা ছিল। আমাদের এ অন্তরংগতা দেখে আমার পিতা শায়খ আবদুর রহীম খুব সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন এবং ভবিষ্যতে এই বন্ধুত্ব উভয়ের বাস্তব জীবনে বিশেষ সহায়ক হবে আশা করতেন। শায়খ আশেক আমার কাছেই শিক্ষা এবং দীক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর

ভিতর–বাহির, মন–মেজাজ ও ভাষা সবই যেনো আমার রংগে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা এবং দীক্ষার ব্যাপারে তিনি সর্বতোভাবে আমাতেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এভাবেই তাঁর অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, তাঁর পরিপূর্ণ আত্ম–বিকাশ ঘটেছিল এবং তাঁর চেতনা ও জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করেছিল। সুতরাং শিক্ষা ও আদর্শ থেকে যে তিনি বিচ্যুত হবেন না এবং তাঁর কথা ও উক্তিতে যে কোন দুর্বলতার অবকাশ থাকবে না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম। তাঁর এবং আমার মধ্যে এমন মানসিক যোগাযোগ ঘটেছিল, আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমার নিকট থেকে যা কিছু তিনি গ্রহণ করতেন তাতে অনুকরণের ছাপ পড়তো না। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তিনি এবং আমি যেনো একই উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করতাম। চরিত্র, আচার–অনুষ্ঠান, রীতি–নীতিতে শায়খ মুহম্মদ আশেক সব দিক থেকে বাঞ্ছিত এবং প্রিয় ব্যক্তি। তিনি একাধারে আমার শুভাকাংক্ষী, আমার জ্ঞান ও তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও সংরক্ষণকারী এবং আমার গ্রন্থগুলি দেখা–শুনার দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন। বস্তুতপক্ষে আমার অনেক পান্ডুলিপি রচনার মূলে রয়েছেন তিনি। তিনি আমার অনেক পান্ডুলিপি পরিচ্ছন্ন করে লিখেছিলেন। আমার মনে হয় আমার জ্ঞানচর্চা তাঁর মাধ্যমেই বেঁচে থাকবে। তাঁর গুণাবলী সাধারণ্যে ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য আমি ইল্হাম প্রাপ্ত হয়েছি, তাঁর যোগ্যতার পরিচয় যেনো লোকের কাছে অজ্ঞাত না থাকে। আমার ওয়ালিদ এবং তা ছাড়া আবূ তাহির মদনী যেভাবে আমাকে তাসাউফের খিলাফতের প্রতীকরূপে খির্কা দান করেছিলেন, আমিও তাকে তেমনি আমার খির্কা দ্বারা ভূষিত করেছি। আবূ তাহিরের খির্কাটি ছিল সকল আধ্যাত্মিক সূফীর আশীর্বাদে পুষ্ট। সুতরাং তাসাউফের যে সব সাধনা পদ্ধতি শেখ মুহম্মদ আশেক আমার কাছে শুনেছেন কিংবা যা না–ও শুনেছেন, তা অন্যকে শিক্ষা দিবার অনুমতি দিচ্ছি। তিনি তাঁর মুরীদগণকে নিজ ইচ্ছা মতো পরিচালনা করুন। তা ছাড়া হাদীস, তফসীর কিংবা অন্যান্য বিষয় যা তিনি আমার কাছে অধ্যয়ন করেছেন এবং যা আমরা উভয়েই মদীনায় ওস্তাদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছি, তা–ও অন্যকে শিক্ষা দিবার অনুমতি তাঁকে দিচ্ছি।'

'আনফাসুল্ আরিফীন' গ্রন্থে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ শায়খ মুহম্মদ আশেক সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন ঃ 'আমার ওয়ালিদ তাঁর শেষ জীবনে এক সময় আমার এবং শায়খ মুহম্মদ আশেকের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এরা পরস্পরে বন্ধু। এদের বন্ধুত্ব দেখে আমি খুবই আনন্দিত।' আমি ওয়ালিদ সাহেবের এই ইংগিতের তাৎপর্য পরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। শায়খ আশেকের সাথে আমার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ঘটেছিল। তিনি আমার অনুসারী হয়েছিলেন। আমি আশা করছি, আমাদের এই ঘনিষ্ঠতা কল্যাণপ্রসূ হবে।'

শাহ আবদুল আযীয 'উজালাতে নাফেয়া' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'পিতার মৃত্যুর পরে আমি শায়খ মুহম্মদ আশেক, খাজা মুহম্মদ আমীন প্রমুখ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খলীফার নিকটে শিক্ষাদীক্ষা নিয়েছিলাম। শায়খ মুহম্মদ আশেক শায়খ আবূ তাহিরের এবং মক্কা-মদীনার অন্যান্য ওস্তাদের কাছ থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। (পৃঃ ১০২)

শায়খ মুহসিন 'আল ইয়ানিউল জনী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'শায়খ মুহম্মদ আশেক শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র বিশিষ্ট শাগরিদদের অন্যতম। তিনি মক্কা-মদীনায় শাহ সাহেবের সংগে একত্রে অধ্যয়ন করেছেন। তাসাউফের সাধনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি একখানা বিখ্যাত কিতাব রচনা করেছেন।'

তাঁর পরে ছিলেন শায়খ মুহম্মদ আমীন কাশ্মিরী। তিনি মূলে বোখারার অধিবাসী ছিলেন এবং দিল্লীতে এসে বসবাস করতেন। তিনি তাঁর ওস্তাদের সনদ-প্রাপ্ত বলে সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। শাহ আবদুল আযীয এঁদের উভয়ের কাছেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

মওলানা নূরুল্লাহ বুড্ডানভী। তিনিও ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র শাগরিদ ছিলেন। তাফহীমাতে ইলাহিয়ার ১ম খন্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় শাহ সাহেব তাঁকে খিলাফতের অনুমতিপত্র লিখে দিয়েছিলেন। হানাফী-ফিক্হে তিনি শাহ আবদুল আযীযের ওস্তাদ এবং তাঁর শ্বশুরও ছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন মওলানা হায়বাতুল্লাহ্ এবং এই মওলানা হায়বাতুল্লাহ্র পুত্রই ছিলেন মওলানা আবদুল হাই। মওলানা আবদুল আযীযের শাগরিদদের মধ্যে তাঁর ভাইদের পরেই মওলানা আবদুল হাই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি।

মওলানা শাহ আবদুর রহীম সাহেবের জীবনী সম্পর্কে লিখিত 'আনফাসুল আরিফীন' গ্রন্থে তাঁর বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ রয়েছে।

৮. মাদ্রাসা–ই–নজীবাবাদী

আহমদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ করে আনার ব্যাপারে নওয়াব নজীবুদ্‌-দওলাহ খান এবং বেরেলীর ওলী নওয়াব হাফিজুল মুলক রহমত খান প্রমুখ প্রধান উমারা শরীক ছিলেন। নওয়াব হাফিজুল মুলকের সরকার থেকে শাহ সাহেবের মাদ্রাসার অধ্যয়নরত ছাত্রদের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। নওয়াব নজীবুদ্‌দওলাহ ছিলেন শাহ সাহেবের অন্যতম ভক্ত মুরীদ। শাহ সাহেবেরই পরামর্শক্রমে উক্ত নওয়াব নজীব এবং তাঁর অন্যান্য বন্ধু মিলে কান্দাহার থেকে আহমদ শাহ আবদালীকে ডেকে এনেছিলেন। শাহ সাহেবের বাহ্যিক আহ্বান ছিল একটা উপলক্ষ মাত্র। মূলে এখানে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রেরণাই কাজ করছিল। যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালীর সৈন্যবাহিনীর সাথে নওয়াব নজীবুদ্‌দওলাহ্‌র উযীর নওয়াব সুজাউদ্‌দওলাহ এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল এবং যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। এই যুদ্ধে নওয়াব নজীবুদ্‌দওলাহ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। 'সিয়ারুল্‌ মুতাআখ্‌খিরীন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ ১১৪৭ হিজরীতে পানিপথ যুদ্ধ জয়ের পর শাহ আবদালী পানিপথ থেকে দিল্লীতে এসে কিছু দিনের জন্য অবস্থান করেছিলেন এবং মসনদের জন্য শাহ আলমকে, উযীর পদের জন্য সুজাউদ্‌দওলাহ্‌কে এবং আমিরুল উমারার পদে নওয়াব নজীবুদ্‌দওলাহ্‌কে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

নওয়াব নজীবুদ্‌দওলাহ্‌ শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার অনুকরণে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

নওয়াব নজীবুদ্‌দওলাহ্‌র উচ্চ মর্যাদা এবং জ্ঞানের প্রতি আগ্রহের প্রমাণ শাহ আবদুল আযীযের উক্তি থেকে পাওয়া যেতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ

'নওয়াব নজীবুদ্দওলাহ্র দরবারে নয় শত আলিম অবস্থান করতেন। নিচে পাঁচ টাকা থেকে উর্ধ্বে পাঁচ শত টাকা করে তাঁরা প্রত্যেকে পেতেন।'

নওয়াব নজীবুদ্দওলাহ্র ন্যায় জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি তখন খুব কমই ছিল। সততা এবং ধর্মপরায়ণতায় তিনি সেকালের মহত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন তাঁর পুরাতন প্রভু নওয়াব দোন্দে খান রোহিলা এবং নওয়াব সুজাউদ্দওলাহ্র তাঁবেদারী করতেন, তখনো এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি জরাজীর্ণ রাজত্বকে সামলিয়েছিলেন। (তারীখ–ই–হিন্দদ্ ঃ যাকাউল্লাহ)

৯. সৈয়দ শাহ ইল্‌ম্‌ল্লাহর দায়েরা

সৈয়দ শাহ ইল্‌মুল্লাহ্ সম্রাট আলমগীরের যুগে একজন বিখ্যাত ধার্মিক এবং তরীকাপন্থী পীর ছিলেন। তিনি শায়খ আদম বনুরীর প্রধান খলীফা ছিলেন। সুতরাং তাঁর এবং শায়খ বনুরীর এবং মুজাদ্দিদ সাহেবের মধ্যে একটি মাত্র সিঁড়ি ব্যবধান ছিল। তিনি সুন্নতের অনুসরণকারী ছিলেন।

শাহ গোলাম আলী নক্‌শবন্দী দেহলবী প্রণীত দারুল মাআরিফে আছে ঃ তাঁর মৃত্যুর রাত্রিতে সম্রাট আলমগীর স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত রসূলে করীম (স.) ইন্তিকাল হয়েছেন। সম্রাট স্বপ্ন দেখে খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। দরবারের বিশিষ্ট আলিমদের কাছে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন ঃ 'তারিখ লিখে রাখা হোক। সম্ভবত শাহ ইল্‌মুল্লাহ্র ইন্তিকাল হয়ে থাকবে। কেননা তিনিই হচ্ছেন হযরত রসূলে করীমের সর্বাপেক্ষা নিকটতম আদর্শ।'

পরে সরকারী সংবাদ সরবরাহকারীদের মারফতে জানা গেল, সত্য সত্যই সে রাতে শাহ ইল্‌মুল্লাহ্র ইন্তিকাল হয়েছিল। সৈয়দ আহমদ শহীদ এই দায়রায় ১২০১ হিজরীর সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ মুহম্মদ ইরফান।

১০. শায়খ মুঈনুদ্দীন থাট্টভী

শায়খ মুঈনুদ্দীন থাট্টভী ওরফে মখদুম থাড়ু মখদুম মুহম্মদ হাশেম এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্র ওস্তাদ। তিনি শায়খ আবদুল হক দেহলবী সাহেবের

তরীকার বিরুদ্ধে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবীর তরীকা অধিকতর গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করার জন্য 'দারাসাতুল লবীব' গ্রন্থ্ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের 'দারাসাতুছ ছানিয়া আশার' অংশ বিশেষ মনোযোগের সংগে পাঠ করে দেখা উচিত। ইমাম বোখারী তাঁর তারীখ–ই–সগীর গ্রন্থের এক স্থানে ইমাম আবূ হানীফার সমালোচনা করেছেন। মুঈনুদ্দীন থাট্টুভী তাঁর গ্রন্থের উল্লিখিত স্থানে তার প্রতিবাদ করেছিল। এ পুস্তকটি লাহোরে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থ্টি আহলে হাদীসদের উদ্যোগে মুদ্রিত হয়েছিল। শায়খ আবদুল হকের তরীকা রদ করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত শায়খ আবদুল্লাহ্ 'জাবরু জাবায়াত আনিদ্দারাসাত' নামে একখানা গ্রন্থ্ প্রণয়ন করেন। সিন্ধুর দারুর রাসাদে এর একখানা পান্ডুলিপি রক্ষিত আছে। পূর্ণ বিবরণ শাহ মুঈনুদ্দীনের 'তোহ্ফাতুল কেরাম অ তারিখে সিন্ধ' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থ্টি মুদ্রিত এবং মাদ্রাসা–ই–মাযহারুল উলূমে এ গ্রন্থ্ মওজুদ রয়েছে।

তাঁর কবিতা ঃ

سگت را خون دادم که با من اُشنا گردد
ندانستم زبخت بد که او دیوانه خواهد شد

তরজমা ঃ তোমার কুকুরকে আমি হৃদয়ের নির্যাস দিয়েছিলাম যাতে সে আমার পোষ মানে। আমার দুর্ভাগ্য যে, সে যে উন্মাদ হয়ে যাবে তা আমি জানতাম না।

১১. শাহ্ আবদুল লতীফ ভাট্টাই

শাহ আবদুল লতীফ ভাট্টাই কর্তৃক সিন্ধী ভাষায় রচিত 'আর রিসালাহ্'র মর্যাদা মওলানা রূমের বিখ্যাত ফারসী–কাব্য গ্রন্থ্ মসনবীর অনুরূপ। হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে সমানভাবে এ গ্রন্থ্ পাঠ করে থাকে। এ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদও হয়েছে।

দারাসাতুল্ লবীবের প্রণেতা শাহ মুহম্মদ মুঈন এবং শাহ আবদুল লতীফ ভাট্টাই একই তরীকার সাধক ছিলেন। তাঁরা উভয়ই 'ওয়াহদাতুল্ ওয়াজুদের'

সমর্থক ছিলেন। শাহ মুহম্মদ মুঈন তাঁর মুমূর্ষু সময়ে অসীয়ত করেন যেন তাঁর জানাজা প্রস্তুত করে মসজিদে রাখা হয় এবং শাহ আবদুল লতীফ না আসা পর্যন্ত যেন তাঁর জানাজা না হয়। শাহ আবদুল লতীফ মরুভূমিতে ভ্রমণ করতেন। তিনি কোথায় অবস্থান করতেন কারো তা জানার কথা ছিল না এবং কিভাবে তিনি মৃত্যুর সংবাদ জানবেন, তাও কিছু স্থির ছিল না। কিন্তু জানাজা প্রস্তুত হওয়ার একটু পরেই তিনি এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। জানাজার নামাযও তিনিই পড়ান। তারপর তিনি বলেন ঃ আজ থেকে থাট্টার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ হলো।

ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন ঃ সিন্ধুর থাট্টায় বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চারশ কলেজ ছিল।

আল্লামা মাকরেসী ইপমহাদেশ সফরে এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন ঃ সম্রাট মুহম্মদ শাহের আমলে একমাত্র দিল্লীতেই এক হাজার মাদ্রাসা ছিল। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুলার সরকারী কাগজপত্রের ভিত্তিতে লিখেছেন যে, বৃটিশ আমলের পূর্বে বাংলাদেশে ৮০ হাজার দেশীয় বিদ্যালয় ছিল। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, তখনকার গোটা জনসংখ্যার হিসাবে প্রতি চল্লিশজনের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। রেভারেন্ড ওয়ার্ড ১৮২১ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন ঃ উপমহাদেশের জেলাগুলিতে বিদ্যালয়ের কোন অভাব নেই, গড়ে প্রতি একত্রিশ জন ছাত্রের জন্য সেখানে একটি করে বিদ্যালয় রয়েছে।

১২. পানিপথের যুদ্ধ

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ ১১৪৪ হিজরীতে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা দু'ভাগে ভাগ করা যায়। তার প্রথম অংশ হচ্ছে ঃ

শাহ সাহেব বলেন ঃ আমি দেখতে পেলাম কাফির রাজা কর্তৃক মুসলমানদের শহরসমূহ অধিকৃত হয়েছে। এ স্বপ্নের তাৎপর্য তিনি এই বুঝেছিলেন যে, দিল্লীর লালকেল্লার উপর মারাঠাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সিয়ারুল মুতাআখ্‌খিরীন প্রণেতা লিখেছেন যে, যিলহজ্জের উনিশ তারিখ বুধমন্ত ভাও লালকেল্লা দখল করেছিল এবং শাহী মহল এবং সকল সরকারী দালান-কোঠাও তাদের দখলে এসে গিয়েছিল।

শাহ সাহেব তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, আমি দেখলাম যেন কাফির সৈন্যরা মুসলমানদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করে নিচ্ছে।

স্বপ্নের এ অংশ এভাবে কার্যে পরিণত হয়েছিল যে, মারাঠারা লালকেল্লা দখল করার পর ব্যাপকভাবে লুটতরাজ চালিয়েছিল। সিয়ারুল্ মুতাআখ্খিরীনের বর্ণনা থেকে তার আভাস পাওয়া যায়। ভাও এতখানি ইতর এবং সংকীর্ণচেতা ছিল যে, দেওয়ানে খাসের ছাদের রৌপ্য এবং কদম রসূল, নিজামুদ্দীন আউলিয়ার মাজার এবং মুহম্মদ শাহের সমাধির স্বর্ণ ও রৌপ্যের ঝাড় লুন্ঠন করেছিল এবং শামাদান চূরমার করেছিল। এসব সোনা–রূপা গলিয়ে হস্তগত করেছিল।

ভাও–এর নীচতার আরো পরিচয় আছে। মীর গোলাম আলী খাজানায়ে আমেরার ৪৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বালাজী রাও দিল্লী এবং দাক্ষিণাত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বাজরার রুটি ভক্ষণ করতো, আটার রুটিতে তার রুচি ছিল না। কাঁচা বেগুন, কাঁচা আম এবং কাঁচা গোময় বড়ো তৃপ্তির সাথে আহার করতো। তার কারণ হয়তো এই ছিল যে, ব্রাহ্মণদের পেশা ছিল ভিক্ষাবৃত্তি। ব্রাহ্মণদেরকে ভিক্ষা দেওয়া হিন্দুদের রীতি ছিল। সেজন্যই পুরুষাণুক্রমে ভিক্ষুকের নযরই তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং লোভ এবং স্বার্থপরতা ব্রাহ্মণদের একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ছিল কারণ যেজন্য বালাজী রাও রাজ্য এবং সিংহাসন লাভ করা সত্ত্বেও ভিক্ষুকের স্বভাব পরিত্যাগ করতে পারে নি।

তখন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে, কেউ যদি নিজের কোন গরজে ব্রাহ্মণ রাজ–কর্মচারীদের নিকট যেত, তখন তাদের নযর থাকতো,তারা কোন ভেট–ঘাট সংগে নিয়ে আসতো কিনা সেদিকে।

بدست خلق عالم کاسهٔ در یوزه می بینهم
گدا چون پادشاه گردد گدا سازد جهانے را

তরজমা ঃ পৃথিবীতে সবারই হাতে রয়েছে ভিক্ষার পাত্র, ভিক্ষুক যখন রাজ্যের মালিক হয়, তখন গোটা বিশ্বকে ভিক্ষুকে পরিণত করে।

ধনী বা দরিদ্র যে কেউ হোক না কেন–অড়হরের ডাল তাদের প্রধান ব্যঞ্জন ছিল। তাতে না তৈল ব্যবহৃত হতো, না ঘৃত ঢেলে দেওয়া হতো। শুষ্ক লঙ্কা, হিং এবং হরিদ্রা ব্যঞ্জনের সাথে ব্যবহার করা হতো এবং খুব বেশি পরিমাণে সেগুলি ব্যবহার করতো তারা। রন্ধনের সময় মরিচ তো দিতই, আহার করার সময়ও তারা কাঁচা মরিচ খেতো।

শাহ সাহেব তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা প্রসংগে আরো লিখেছেন যে, 'কাফির দখলকারীরা খাস আজমীর শহরে কুফরী নিশান উড়িয়েছিল এবং সেখানে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল।' (অর্থাৎ দিল্লীর মূল প্রাণশক্তিই ছিল আজমীর। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী সেখান থেকেই ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেছিলেন, যার ফলে দিল্লী বিজিত হয়েছিল।) সেই দিল্লী সত্য সত্যই কাফিরদের দখলে চলে গিয়েছিল। তারপর তারা সেখানে হিন্দুরাজ ঘোষণা করে দিয়েছিল এবং ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

সিয়ারুল্ মুতাআখ্খিরীনের প্রণেতা লিখেছেন যে, ভাও শাহ্ জাহানাবাদের দুর্গ রক্ষার ভার নারদ শঙ্কর ব্রাহ্মণের হাতে সোপর্দ করে নতুন একটি সেনাবাহিনী সেখানে প্রেরণ করেছিল।

মোট কথা, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। কাফিরগণ মুসলমানদের উপর জয়লাভ করেছিল এবং তাঁদের রাজধানীও দখল করেছিল।

স্বপ্নের পরবর্তী অংশের সম্পর্ক রয়েছে পানিপথের যুদ্ধের সাথে। এর পরে আহমদ শাহ আবদালী উপমহাদেশ আক্রমণ করে মারাঠা উত্থানকে পানিপথের ময়দানে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। সিয়ারুল্ মুতাআখ্খিরীনে লিখিত আছে ঃ বিশ্বাস রাও ভাওসহ দাক্ষিণাত্যের সৈন্যবাহিনী এবং অন্যান্য মারাঠা বাহিনী ও সেনাপতিরা সেই যুদ্ধে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। এভাবে মারাঠাদের শক্তি এমনভাবে সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল যে, উত্তর উপমহাদেশে তাদের কোন নামনিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। অতপর সমগ্র রাজত্বকালের মধ্যে মারাঠাদের একটি প্রাণীকেও কোন স্থান থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেখা যায়নি।

এ হচ্ছে স্বপ্নের সেই অংশ যেখানে তিনি দেখেছিলেন, 'আমি যেন যুগ-সংস্কারক অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য আমিই উপলক্ষ।' শাহ্‌ ওয়ালীউল্লাহ্‌ প্রকৃত প্রস্তাবে এ ব্যাপারে যেভাবে উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তা এই ঃ ভাও তাঁর রাজ্য সুদৃঢ় করার জন্য অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্‌দওলাহ্‌র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। ভাও নবাব সুজাউদ্‌দওলাহ্‌র কাছে জনৈক ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করেছিল। তার জওয়াবে নবাব সুজাউদ্‌দওলাহ্‌ জানান, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেরা কিছুকাল ধরে উপমহাদেশে ক্ষমতা লাভ করেছে। তার ফলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা কিছু লাঘব হয়নি এবং তারা কারো মানমর্যাদারও রক্ষক নয়। নিজেদের মতলব হাসিলই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। জনসাধারণ তাদের হাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কাজেই তারা নিরুপায় হয়ে নিজেদের জানমাল ও ইজ্জত-আবরু রক্ষার তাকিদে খুব অনুনয়-বিনয় করে বিদেশ থেকে আহমদ শাহ আবদালীকে আমন্ত্রণ করে এনেছিল। তারা মারাঠাদের নির্যাতনের চেয়ে আহমদ শাহের আক্রমণ সহ্য করতে রাজী। সিরাতুল মুতাআখ্‌খিরীনের গ্রন্থকার এর পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে লিখেছেন ঃ নবাব নজীবুদ্‌দওলাহ্‌ এবং অন্যান্য আমীর-উমারা হিন্দু মারাঠাদের উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। ইমাদুল মুল্‌ক তো মারাঠাদের হাতে নিজের রাজ্যের বিলুপ্তি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। কাজেই তাঁরা সবাই মিলে আহমদ শাহ আবদালীকে পত্র লিখলেন এবং তাঁকে উপমহাদেশে অভিযানের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

স্বপ্নের পরবর্তী অংশে উল্লেখ আছে যে, দু'টি দল যুদ্ধে লিপ্ত হলো। কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে আপনার মত কি? আমি তার কোন জওয়াব দেইনি।

পানিপথের যুদ্ধে মুসলমানদের একটি দল মারাঠাদের পক্ষে যোগদান করেছিল এবং তাদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। মারাঠা পক্ষীয় এই মুসলিম বাহিনীতে আরব এবং উপমহাদেশীয় এই উভয় জাতীয় লোক ছিল। উপমহাদেশের ইতিহাস আমার বক্তব্যের সাক্ষী। এমন কি, মারাঠা গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়কও ছিলেন ইবরাহীম গারদী নামক জনৈক

মুসলমান। এ ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দেয় এবং অত্যন্ত যোগ্যতা ও শৃংখলার সাথে কামান থেকে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। বস্তুতপক্ষে তার গোলন্দাজ বাহিনীই মারাঠাদেরকে কিছু সময়ের জন্য রক্ষা করে।

১১৭৪ হিজরীর ৬ই জমাদিউল আউয়াল (১৭৬১ জানুয়ারি) বুধবার ভাও পানিপথের ময়দানে তার সেনাবাহিনী সন্নিবেশ করে। ইবরাহীম খানকে গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক করে পুরোভাগে প্রেরণ করা হয়। একদিকে মারাঠা বাহিনী 'হর হর রবে' অগ্রসর হলো, অন্যদিকে ইবরাহীম খান গারদী কামান থেকে প্রচন্ড বেগে গোলাবর্ষণ করতে লাগলো। ভাও তার রাজকীয় বাহিনীকে সম্মুখে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিল। তারা অশ্ববল্গা হাতে আবদালীর সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পরে স্বপ্নের সে অংশ বাস্তবে পরিণত হলো, যেখানে তিনি দেখেছিলেন, 'লোকেরা হিন্দু রাজাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে এবং অবশেষে তাকে হত্যা করেছে।'

তারীখে হিন্দের প্রণেতা সৈয়দ হাশেমী লিখেছেন ঃ দিল্লীর সিংহাসন দখল করার পরে ভাও তার ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বাস রাওকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে উপমহাদেশে ব্রাহ্মণ-রাজ প্রতিষ্ঠার বিষয় ঘোষণা করার আশা করেছিল। কিন্তু পানিপথের যুদ্ধের ফলাফলের জন্য সে ঘোষণা স্থগিত রাখাই সমীচীন মনে করেছিল। কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে দিল্লীর সিংহাসনের অভিলাষী এবং সিংহাসন সোপর্দকারী ভাও উভয়ই নিহত হয়েছিল।

সিয়ারে মুতাআখ্খিরীনের লেখক এ ঘটনা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ মারাঠা প্রধানদের মধ্যে বালাজী রাও-এর পুত্র বিশ্বাস রাও তরুণ যুবক ছিল। সে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। তৎপর বালাজী রাও-এর চাচাতো ভাই মারাঠাদের সর্বাধিনায়ক রাও নিহত হয়। অসংখ্য মারাঠা সর্দার ও সেনানায়কের মধ্যে মাত্র দু'তিন শত চাকর-বাকর ছাড়া বাকি সকলে এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। এ নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বালাজী রাও বেশি দিন বেঁচে থাকে নি। নিজ সন্তান এবং ভ্রাতা হারিয়ে বালাজী রাও মাত্র ৫ মাস ১৭ দিন বেঁচেছিলেন। ইবরাহীম খান গারদী যুদ্ধের ময়দানে বন্দী হয়। তরবারির আঘাতে তার মস্তক

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ হচ্ছে স্বপ্নের সেই অংশের ব্যাখ্যা, যেখানে তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহ্ তাঁর কোন বিশেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমাকে উপলক্ষরূপে গ্রহণ করেছেন।'

শাহ সাহেব স্বপ্নে এ–ও দেখেছিলেন যে, তিনি আজমীর পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। আবদালী তাঁর বাহিনী নিয়ে নগরের পর নগর দখল করে দিল্লীতে উপনীত হন। তারপর তিনি সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারীদেরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে সোজা কান্দাহার মুখে রওয়ানা হয়ে যান। দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন নি।

১৩. মাহদী আবির্ভাবের ধারণা

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ 'ইযালাতুল্ খিফা' গ্রন্থে ইবনে মাজা বর্ণিত বিখ্যাত হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এই হাদীসে খোরাসান থেকে আবূ মুসলিম খোরাসানীর আবির্ভাবের প্রতি ইংগিত আছে বলে মনে হয়। এই খলীফাকেই মাহদী বলা হয়েছে এবং তাঁর সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। ইবনে মাজা বর্ণিত হাদীসটি হচ্ছে এই ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ একদিন আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)–এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় বনী হাশেম বংশীয় কয়েকজন যুবক হযরত (স.)–এর কাছে আসলেন। তাঁদের দেখামাত্র হযরতের চোখে পানি দেখা দিল এবং চেহারার রং পরিবর্তিত হলো। ইবনে মাসউদ বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সমীপে আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনার চেহারা চিন্তাক্লিষ্ট দেখছি। আপনার অনভিপ্রেত কিছু ঘটেছে কি? 'রসূলুল্লাহ (স.) বললেন ঃ আহলে বাইতের জন্য আল্লাহ্ দুনিয়া থেকে আখিরাতকেই বেশি পছন্দ করছেন। আমার পরে আহ্লে বাইত ভীষণ সংকটের সম্মুখীন হবে, তারা গৃহচ্যুত হবে এবং এক শহর থেকে অন্য শহরে আশ্রয়ের জন্য ঘুরে ফিরবে। পূর্বদিক থেকে কালো পতাকাধারী লোকগণের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত আমার আহলে বাইতের এ অবস্থাই চলতে থাকবে। তারা অবশ্যই মংগলের জন্যই বের হবে, কিন্তু তা আসবে না। তারা তখন যুদ্ধ করবে এবং জয়ী হবে এবং তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তারা আমার আহলে বাইতের কোন একজনের হাতে সব ন্যস্ত

করবে। সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবে, যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা জুলুম ও অত্যাচারে সারা পৃথিবী পূর্ণ করেছিল। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ সে যুগের সাক্ষাত পাও তবে বরফাচ্ছাদিত পথ হামাগুড়ি দিয়ে অতিক্রম করতে হলেও তার সন্নিধানে যেয়ো।'

ইবনে মাজা 'সুবান' (রা.)–এর বরাত দিয়ে বলেছেন ঃ এমন তিন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যারা সকলেই হবে খলীফা–তনয়। তারা পরস্পর যুদ্ধ করবে। তাদের একজনের হাতে যখন সম্পদ আসবে তখন কালো পতাকাধারীদের আবির্ভাব হবে এবং তোমাদের সকলকে হত্যা করবে। বর্ণনাকারী বলছেনঃ হযরত রসূলে করীম (স.)–এর পরে যা বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই। হযরত (স.) তারপর বললেন, 'যদি তোমরা তার সাক্ষাৎ পাও তবে তার বাইয়াত গ্রহণ করবে এবং বরফাচ্ছাদিত পথ অতিক্রম করে আসতে হলেও তার সন্নিধানে যাবে। কেননা, সে–ই হবে আল্লাহ্র খলীফা–মাহদী।' ইবনে মাজা এ মর্মে আরও একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আবদুল্লাহ বিন হারেস বিন জযর যুবাইদী বলেছেন, হযরত (স.) বলেছেন ঃ পূর্বদিক থেকে লোকেরা বের হবে, যারা মাহ্দীর জন্য ময়দান তৈয়ার করবে।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ উপরোক্ত তিনটি হাদীসের আলোচনা প্রসংগে ইযালাতুল্ খিফাতে লিখেছেন, 'আমার মতে বনু আব্বাসীয় খলীফা মাহ্দীই হচ্ছেন উপরোক্ত হাদীসত্রয়ের লক্ষ্য। আখেরী যমানায় যে মাহ্দী আবির্ভূত হবেন সে মাহদী নন। উল্লিখিত হাদীসে যে মাহদীর কথা বলা হয়েছে, তাঁকে আল্লাহ্র খলীফা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে সহায়তা করার জন্য বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, বনু আব্বাসীয়দের ভাগ্যে খিলাফত নির্দিষ্ট ছিল। তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম ঘটার উপায় ছিল না। অর্থাৎ অনেকেই খিলাফত অর্জনের জন্য চেষ্টা করে ব্যর্থ হবে এবং গোলযোগ ও বিশৃংখলা ছাড়া কোন ফল হবে না। কিন্তু বনু আব্বাস ব্যর্থ হবে না। সুতরাং বনু আব্বাসীয় মাহদীকে এজন্যই খলীফাতুল্লাহ্ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নিকট থেকেই তাদের ভাগ্যে খিলাফত লিখিত ছিল। এ ফয়সালা ছিল অপরিবর্তনীয়।'

বস্তুতপক্ষে শরীয়তের পথে কোন বিরোধ যাতে না থাকে, রাজ্যে বিশৃংখলার অবসান হয় এবং খিলাফত স্থিতিশীল হয়, তাই কাম্য। পতনশীল খিলাফতের অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন খলীফার চেয়ে স্থিতিশীল খিলাফতের অপেক্ষাকৃত ন্যূন যোগতাসম্পন্ন খলীফার খিলাফত অধিকতর কাম্য। অবশ্যই স্থিতিশীলতা বিশৃংখলা এবং অশান্তির চেয়ে শ্রেয়।

আমার মতে আখেরী যমানায় মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদীস যদি সত্য হাদীস বলেও প্রমাণিত হয়, তবু তাঁর আবির্ভাব হবে এমন সময়, যখন কিয়ামত দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হবে। তখন শরীয়তের কার্যকারিতা এবং প্রভাব বিস্তারের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। আইন–কানুন মোতাবেক সমাজকে পরিচালনা করার অবকাশও থাকবে না। কাজেই তখনকার মাহদীর আবির্ভাবের সাথে মুসলমানদের কল্যাণের সম্পর্ক ধারণা করা ঠিক হবে না। অবশ্য মাহদীর আগমন সম্পর্কে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ যে সমস্ত হাদীসের আলোচনা করেছেন, সেগুলি তৃতীয় শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা সে হাদীসগুলি মেনে নিচ্ছি, কেননা মৌলিক নীতির দিক থেকে সেগুলির সংগে আমাদের বিরোধ নেই।

ইমাম আবূ দাউদ বিলাল বিন্ আমরের বরাতে রিওয়ায়েত করেছেন : তিনি বলেন যে, হযরত আলীকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'মাওরাউন্নাহার থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে, সে হারেস নামে খ্যাত হবে, তার সামনে সামনে আর একজন লোক থাকবে, তার নাম হবে মনসুর। সে আমার এ উক্তি বাস্তবায়িত করার জন্য ক্ষেত্র পস্তুত করবে, যেমন রসূলুল্লাহ্র জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে কোরাইশরা উপলক্ষ হয়েছিল। তখন প্রত্যেকটি মু'মিনের পক্ষে ফরয হবে তাঁকে সাহায্য করা।'

বর্ণনাকারী বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ্র উদ্দেশ্য হয়তো এই যে, সেই ব্যক্তির আহ্বানে প্রত্যেক মু'মিনের সাড়া দেওয়া তখন কর্তব্য হবে।

আমার মতে সবগুলি হাদীসেরই ইংগিত আব্বাসীয় খলীফা মাহদীর প্রতি। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ বলেছেন, 'আহলে বাইত' অর্থে এখানে বনু হাশেমকে বুঝান হচ্ছে এবং দুনিয়া আদল–ইনসাফে পরিপূর্ণ হবে–হাদীসের এ অংশের অর্থ

সেই মাহদী সুন্নাহর অনুসরণ করবেন এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বনু উমাইয়া খলীফা ওমর ইব্নে আবদুল আযীযের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।'

আস সাইউতী তারীখুল খুলাফাতে লিখেছেন ঃ সুফিয়ান সওরী বলতেন যে, আব্বাসীয়দের মাহদী খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের তুল্য।

অন্য কথায় মাহদী সেই সব স্বৈরাচারী শাসনকর্তাদের ন্যায় হবেন না, যারা নিজদেরকে আইন–কানুনের উর্ধ্বে মনে করে। আমার মতে এই আব্বাসীয় খলীফাই মাহদী সম্পর্কিত হাদীসের লক্ষ্য, যে হাদীসে আহলে বাইত থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে।

এই সম্পর্কিত আরো একটি হাদীস যা আবূ দাউদ আসেম থেকে, আসেম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত (স.) বলেছেন, 'পৃথিবীর আয়ু যদি মাত্র একটি দিনও বাকি থাকে তবু আল্লাহ্ তায়ালা দিনটিকে এত দীর্ঘায়িত করে দেবেন যে, আমার অথবা আহলে বাইতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে; আমার নামের অনুরূপ তার নাম হবে। আমার পিতার নামে তার পিতার নাম হবে। সে জুলুম অত্যাচারে জর্জরিত পৃথিবীতে আদল–ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে।' ঘটনাক্রমে আব্বাসী মাহদীর নাম ছিল আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহম্মদ, সে আহলে বাইত অর্থাৎ বনু হাশেম গোত্রীয় ছিল। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ এই মাহদীর কথাই বলেছেন এবং এই মাহদীই শেষকালে আবির্ভূত হবেন বলে বলা হয়েছে।

হযরত ফাতিমা (রা.) এবং আলী (রা.)–এর বংশধর থেকে মাহদী আসবেন, সাধারণভাবে এ কথাই খ্যাত। সুতরাং সূফী–সাধকেরা এ কথার উপর খুব জোর দিয়েছেন এবং বাগদাদের পতনের পরে যখন অব্বাসীয় খিলাফতের নাম–নিশানা পর্যন্ত মুছে গেল তখন হযরত ফাতিমার বংশধর থেকে মাহদী আবির্ভূত হবেন–একথার উপর অধিকতর জোর দেওয়া হতে লাগলো। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই, যে সমস্ত হাদীসে হযরত ফাতিমার বংশধর থেকে মাহদী আসবেন বলে উল্লেখ আছে, সেগুলি সূত্রের দিক থেকে দুর্বল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য নয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবূ দাউদের মতে বারো ইমামের একজন মাহদী

হবেন। আমারও তাই ধারণা। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই 'মাহদী' অধ্যায়ে তিনি উক্ত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। প্রসংগত আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইর এবং সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিষয়ের প্রতিও ইংগিত করা হয়েছে। ইমাম মালিক আবদুল্লাহ ইবনে যোবাইরকে বারো ইমামের একজন বলে গণ্য করতেন এবং তাঁর মোকাবিলায় আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খিলাফত অবৈধ বিবেচনা করতেন। সুতরাং আহলে বাইত থেকে ইমাম মাহদী হওয়ার হাদীসই তিনি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছেন। এখানে অবশ্য তিনি আহলে বাইতের ব্যাখ্যা করেন নি। তারপর যে হাদীস উল্লেখ করেছেন, তাতে মাহদী হযরত ফাতিমা (রা.) এবং হযরত হাসানের বংশ থেকে আসবেন বলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই অধ্যায়ের শেষের দিকে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে তার ইংগিত রয়েছে মনসুরের পুত্রের দিকে এবং তিনি হচ্ছেন আব্বাসীয়দের তৃতীয় খলীফা। হাদীসগুলি বর্ণনার অনুক্রম লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, পাঠক যাতে পরে উল্লিখিত হাদীসকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করে, লেখকের উদ্দেশ্য ছিল তাই।

শায়খ আবূ তালিব শামসুল হক তাঁর 'আওনোল মাবূদ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শিয়া সম্প্রদায় বিশেষ করে তাদের ইমামিয়া সম্প্রদায় মনে করে যে, হযরত রসূলে করীম (স.)–এর পর সত্য ইমাম হচ্ছেন হযরত আলী (রা.)। তারপরে যথাক্রমে হযরত হাসান, হোসাইন, যইনুল আবেদীন, মুহম্মদ বাকের, জাফর সাদেক, মূসা কাযেম, আলীরেজা, মোহাম্মদ মুত্তাকী, আলী নকী এবং হাসান আসকারী ছিলেন। হাসান আসকারীর পুত্রই ছিলেন মাহদী, যাঁর জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে। শিয়ারা বলছেন, তিনি মাহদী এবং তিনি তাঁর শত্রুদের ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন। একদিন তিনি আবির্ভূত হবেন। তাঁর আবির্ভাব হলে অত্যাচার–অনাচারে জর্জরিত পৃথিবী আবার ন্যায় ও সুবিচারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাদের কাছে এরূপ দীর্ঘ জীবন এবং আয়ুর এহেন দৈর্ঘ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আমার মতে আহলে সুন্নাহ এবং শিয়াদের মধ্যে আসল বিরোধ হচ্ছে এই : কুরআন হযরত রসূলুল্লাহ্ (স.)–এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তাতে এ সুসংবাদ রয়েছে যে, কুরআনের ধর্ম সকল ধর্মের উপর জয়ী হবে।

বাস্তবে হলো এই যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অধিকাংশ দেশ বিজিত হয়। পরে বনু উমাইয়া, বনু আব্বাস এবং উপমহাদেশের বাদশাহ্রা ইসলামী রাজত্বের সীমা বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু শিয়াদের মতে এ সব খিলাফত এবং রাজত্ব বৈধ নয়। কেননা তাদের মতে কুরআনে ঘোষিত সকল ধর্মের উপর কুরআনের ধর্ম জয়ী হওয়ার ওয়াদা পূর্ণ হয় নাই এবং হযরত ফাতিমার বংশধরদের মধ্য থেকে আবির্ভূত কোন ব্যক্তির হাতেই শুধু সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে।

এই হচ্ছে মূলকথা, যার উপর ভিত্তি করে 'মাহ্দী' আগমন সম্পর্কিত বিশ্বাস শিয়াদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে।

বাকি থাকলো আহলে সুন্নাহ্র কথা। তাদের মতে মুহাজির এবং আনসারদের দ্বারাই কুরআনের উপরোক্ত ঘোষণা পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁরা হযরত আলী এবং তাঁর বংশধরগণকেও সেই মুহাজির এবং আনসারদের দলভুক্ত বলে মনে করে থাকেন। এছাড়া হযরত (স.)–এর কতিপয় হাদীসে প্রতারক দজ্জালের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে। সত্যানুসারী উম্মতের কথা এবং মাহ্দী আসার কথারও উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা অবিশ্বাসী এবং বাতিলপন্থিগণ কর্তৃক সৃষ্ট বিশৃংখলা দূর করে সত্য এবং শান্তি স্থাপন করবেন। এও বলা হয়েছে যে, এ সব লোক বনু হাশেমসহ কোরাইশদের অন্যান্য গোষ্ঠী থেকেও আবির্ভূত হবেন। কিন্তু বিপদ এই যে, বিদ্বেষের বশবর্তী চরমপন্থিগণ ইমাম এবং মাহ্দীকে নবুয়তের মর্যাদা দিয়ে থাকেন এবং এভাবে হযরত (স.)–এর পরে তারা নবীর আবির্ভাবে বিশ্বাস করে। সুতরাং এ সব বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা–ভাবনা করে অগ্রসর হওয়া উচিত। কোনক্রমেই ভ্রান্তপথে যাওয়া সংগত নয়।

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ ফুয়ূযুল হারামাইন গ্রন্থে লিখেছেন যে, শিয়াদের সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (স.)–এর নিকট আমি ধ্যান যোগে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখন আমার অন্তরে এই ধারণা জাগ্রত হলো যে, তাদের মত ভ্রান্ত এবং তার প্রমাণ এই যে, তারা ইমাম মেনে থাকে। তন্ময়তা এবং আকর্ষণ থেকে সহজ অবস্থায় ফিরে আসার পর আমার জ্ঞান হলো যে, তাদের মতে ইমাম নিষ্পাপ এবং ইমামের অনুসরণ ফরয এবং তারা এও বিশ্বাস করে

যে, তাদের ইমামের প্রতি গোপনে ওয়াহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং হযরত রসূলে করীম (স.)–এর ইংগিতের তাৎপর্য এই বোঝা গেল যে, ইমাম মানার অর্থ খতমে নবুয়ত অস্বীকার করা।

১৪. চারটি বুনিয়াদী স্বভাব

ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ 'হাময়াত' গ্রন্থে লিখেছেন,–এ দীনের কাছে স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়েছে যে, আত্মশোধনের জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে চারটি মৌলিক স্বভাব অর্জন। এই চারটি স্বভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক সত্য ধর্মে এই চারটি স্বভাবের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। এই চারটির সমষ্টিগত নাম নেকী বা পুণ্য। গুনাহ বা পাপের অর্থ বিশ্বাসে, কর্মে এবং চরিত্রে উপরোক্ত চারটি স্বভাবের বৈপরীত্য। উক্ত চারটি স্বভাবের মধ্যে একটি হলো পবিত্রতা। পবিত্রতা অর্জনের প্রেরণা প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। এখানে পবিত্রতার অর্থ ওযূ–গোসল নয়, বরং পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে ওযূ–গোসল দ্বারা মানসিক ঔজ্জ্বল্য এবং প্রশান্তি। ধূলাবালু মাখা অকর্তিত কেশধারী এবং মলমূত্র ও বায়ুতে উদর পরিপূর্ণ ব্যক্তির মনমেজাজ স্বভাবতঃই আনন্দ এবং স্ফুর্তিহীন হবে, কিন্তু সে যখন ক্ষৌরকর্ম করিয়ে, স্নানাদি সেরে নতুন পোশাক পরিধান করবে, সুগন্ধি মাখবে তখন তার দেহমনে আনন্দ এবং স্ফুর্তি আসবে।

অর্থাৎ সার কথা হচ্ছে এই যে, পবিত্রতা হচ্ছে সেই মানসিক প্রসন্নতা যা জ্যোতি বা প্রেম নামে আখ্যায়িত হয়।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে বিনয় বা বিনম্র ভাব অর্থাৎ পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং কৃতজ্ঞতা। এর মোটামুটি পরিচয় হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায়, পার্থিব কোলাহল ও ঝঞ্ঝাট থেকে পৃথক হয়ে সৃষ্টিকর্তার মহান গুণাবলী এবং তাঁর অসীম কুদরতের প্রতি মনোনিবেশ করলে মনে যে ভীতি–বিহ্বলতার ভাব উপস্থিত হয়, এই ভীতি–বিহ্বলতাই বিনয় এবং আত্মনিয়োগের রূপ গ্রহণ করে। অন্য কথায় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি যখন সৃষ্টির এই গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটনে অক্ষম হয় এবং নিজেকে আর একটি মহান শক্তির সম্মুখে সম্পূর্ণ অসহায় দেখতে পায়,

তখন তার সেই অসহায় অবস্থা তার চেয়ে শক্তিমান আর একটি শক্তির আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে। মন যখন এ রূপে অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে এবং এ অবস্থা যখন তার মূল সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হয় তখন তার এবং ভাবজগতের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়, যার ফলে ভাবলোকের তত্ত্ব তার নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়।

তৃতীয় স্বভাব হচ্ছে উদারতা বা মহানুভবতা। এর তাৎপর্য হলো এই যে, ভোগ-বাসনা, প্রতিহিংসা, কার্পণ্য, লোভ প্রভৃতি দ্বারা পরাভূত না হওয়া।

এরই সাথে শ্লীলতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, ক্ষমা, দানশীলতা, পরিতৃপ্তি এবং সংযমও এসে যায়।

চতুর্থ স্বভাব হচ্ছে ভারসাম্য বা ন্যায়নিষ্ঠা। রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনের প্রাণবস্তু হচ্ছে এই। শিষ্টাচার, পরিমিতাচার এবং স্বাবলম্বন, সুষ্ঠু রাষ্ট্র এবং সমাজনীতি প্রতিষ্ঠা এ সবই হচ্ছে ভারসাম্য বা ন্যায়নীতির অংগ। নিজ চাল-চলন আচার-ব্যবহারের প্রতি সতর্ক থাকা, উত্তম এবং উৎকৃষ্ট আচার-আচরণে অভ্যস্ত হওয়া এবং সেদিকে মনোযোগ রাখার নামই হচ্ছে শিষ্টতা। আয়, ব্যয়, ক্রয়, বিক্রয় এবং অন্যবিধ সমস্ত ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ করে কাজ করাই হচ্ছে পরিমিতাচার। যথাবিহিত সংশোধন, কাজকর্ম যথাযোগ্যভাবে সম্পন্ন করার নাম স্বাবলম্বন। উত্তম বেসামরিক এবং সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্রনীতি। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করা, পারস্পরিক দাবি পূর্ণ করা এবং ঐক্য-সখ্যে জীবন যাপন করা হচ্ছে সুন্দর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা।

মোট কথা, বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। এ বিষয় বিস্তারিত জানার জন্য 'হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্' পাঠ করে দেখুন।

১৫. হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্ গ্রন্থের উক্তি

হুজ্জাতুল্লাহিল্ বালিগাহ্ গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ লিখেছেন যে, পারসিক এবং রোমকরা কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করার পরে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছিল। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল এবং অনাচার ও অন্যায় সমাজ জীবনকে কলুষিত

করেছিল। ইহকালের সুখ ভোগই তাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। তার ফলে তারা পার্থিব ধনদৌলত এবং পুঁজিকেই গর্বের বস্তু জ্ঞান করতো। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে সুখ–সমৃদ্ধির এবং ভোগ–বিলাসের নিত্য–নতুন কলাকৌশল এবং সাজসরঞ্জাম নির্মাণকারী দক্ষ কারিগরদের দেশে একত্র করা হয় এবং নির্দেশমতো কার্যে লিপ্ত হয়। এই ভোগ–বিলাসের উপকরণ উৎপাদনে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীরা অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের সাজ–সজ্জার বিলাস এত দূর চরমে উঠেছিল যে, আমীর এবং ধনী শ্রেণীর ব্যবহার্য কোমরবন্দ এবং মস্তকাবরণ এক লাখ দিরহামের কম মূল্যে হলে অথবা শীতল ও উষ্ণ চৌবাচ্চা সম্বলিত গোসলখানা এবং সুদৃশ্য পাইনকুঞ্জ বেষ্টিত প্রাসাদ না থাকা খুবই লজ্জার বিষয় বলে গণ্য হতো। তা ছাড়া বাহুল্য সাজসজ্জা, বহুমূল্য যানবাহন, দাস–দাসী ও সুন্দরী পরিচারিকা প্রভৃতি রাখা হতো। রাতদিন নাচগানের আসর তাদের বিলাস জীবনকে মুখর করে রাখতো। এ ছাড়া আরও যে সব ভোগ–বিলাসের মধ্যে তারা ডুবেছিল বর্তমানের রাজা–বাদশাহ্‌দের দরবারে আজো তার নযীর দেখতে পাওয়া যায়। এসবের উল্লেখ পুনরুক্তির শামিল।

মোট কথা, এই ভ্রান্ত বিলাসিতাই তাদের সমাজ জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, নবাব এবং আমীর–উমারাদের মধ্যেই এই ভোগস্পৃহা সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সারা দেশময় অভিশাপ এবং মহামারীর মতো তা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট–বড় সবাই এই ভোগ–বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল এবং এর ফলে তাদের সমাজ জীবন সমূলে ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিণাম দাঁড়িয়েছিল এই যে, রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই মানসিক শান্তি এবং ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। নৈরাশ্য এবং হতাশা দিন দিন তাদের মধ্যে বেড়ে চলছিল। দেশের বিরাট এক অংশ দুঃখ–দুর্দশা, বিপদ ও মুসীবতে বেষ্টিত হয়ে পড়েছিল। তার কারণ ছিল এই যে, ভোগ–বিলাসের জমকালো উপকরণ যোগান দিতে গিয়ে বিপুল ব্যয় এবং আমদানীর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সবার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না, এজন্য বাদশাহ্ আমীর–উমারারা তাদের চাহিদা মিটাবার জন্য নির্মম শোষণ শুরু করে

দিয়েছিল। সেজন্য কৃষক ব্যবসায়ী, বণিক এবং এ ধরনের অন্যান্য উৎপাদনকারীর উপর নিত্য নতুন করভার চাপিয়ে তাদের মেরুদন্ড ভেংগে দেওয়া হয়েছিল। এ কর দিতে অস্বীকার করলে নির্মম শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। তাদেরকে ক্ষেতের পানি সেচে এবং গরু-মহিষের ন্যায় হালচাষে জুড়ে দেওয়া হতো। কারখানার শ্রমিক এবং মজুরদেরকে এমন নির্মমভাবে নির্যাতন করা হতো যে, তারা নিজেদের জন্য জীবিকা উপার্জন করায় অক্ষম হয়ে পড়তো। মোট কথা, জুলুম এবং দুর্নীতি চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌছেছিল। এই দুরবস্থা এবং দারিদ্র্যের চাপে পারলৌকিক চিন্তা এবং আল্লাহ্র সংগে বন্দেগীর সম্পর্ক স্থাপন করার অবকাশ জনসাধারণ পেতো না। এই কলুষিত সমাজ ব্যবস্থার আরও একটি অবাঞ্ছিত দিক ছিল এই যে, যে সব শিল্পের উপর পৃথিবীর সভ্যতা নির্ভরশীল, তা ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হতে লাগলো। তার বদলে আমীর-উমারা এবং ধনীশ্রেণীর মরজী এবং ভোগ-বিলাসের যোগান দেওয়াই প্রধান কাজ এবং জীবিকা উপার্জনের প্রধান উপায় বিবেচিত হতে শুরু করলো। জনসাধারণের কাছে দুর্নীতি দৃষ্টান্তে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের বেশির ভাগই রাজ-সরকারের সংগে কোন না কোন সূত্র স্থাপন করে নিয়েছিল। যেমন, তারা নিজেরা কেউ জিহাদে শরিক না হ'লেও বাপ-দাদা জিহাদে যোগদান করেছিল, সেই সুবাদে রাজদরবার থেকে বৃত্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করে নিত। অন্যেরা রাজ্যের পন্ডিত ও চিন্তাশীলতার সুবাদে বৃত্তি ভোগ করতো। কেউবা বাদশাহ্র দরবারে কেচ্ছা-কাহিনী শুনিয়ে সভা-কবিরূপে ভাতা ভোগ করত। শ্রেণী বিশেষ আবার, সূফী-ফকির হয়ে দোয়া-দরূদের বদৌলতে জীবিকার সংস্থান করতো। মোট কথা, জীবিকা উপার্জনের উৎকৃষ্ট সব উপায়ের বিলুপ্তি ঘটেছিল। তার পরিবর্তে রাজ্যের এক বিপুল সংখ্যক লোক চাটুকারিতা, মোসাহেবী, বাকচাটুতা এবং দরবারে মুসাহেবরূপে জীবিকা উপার্জন করতে বাধ্য হয়েছিল। এগুলি এমন নিকৃষ্ট ধরনের বৃত্তি ছিল, যা উন্নত চিন্তাধারা, উন্নত মানসিক গুণাবলীর সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যকে মিটিয়ে ইতর ও ঘৃণ্য মানসিকতা নিয়েই তৃপ্ত থাকতে বাধ্য করেছিল। এই কলুষিত আবহাওয়া যখন মহামারীরূপে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক হয়ে পড়লো এবং লোকের মানসিকতাও এই ব্যাধিতে সংক্রমিত হয়ে

পড়লো, তখন ইতরতা ও নীচতায় লোকের অন্তর ছেয়ে গেল। এর ফলে জনসাধারণ নৈতিক চরিত্রের প্রতি বিমুখ এবং বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছিল। তাদের মনুষ্যত্বে ঘূণ ধরে গেল। এই সবই ছিল পারসিক ও রোমক প্রভৃতি কলুষিত অন-আরব সমাজ ব্যবস্থার বিষময় কুফল।

অবস্থা যখন বিভীষিকাময় দৃশ্যের রূপ গ্রহণ করলো এবং প্রতিকার অসম্ভব হয়ে পড়লো তখন এই কলুষিত ব্যবস্থা সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে এসেছিল। এক নিরক্ষর নবী প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র পয়গাম নিয়ে এলেন এবং পারস্য ও রোমের সাম্রাজ্য উৎখাত করে এবং তাদের ভ্রান্ত ও বিকৃত রীতিনীতি উচ্ছেদ করে সত্যের ভিত্তিতে নতুন এক সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জনসাধারণের প্রতি নির্যাতন ও শোষণ এবং ভোগ-বিলাসের বিভিন্ন উপকরণ, উপায় এবং পার্থিব জীবনে অনাবশ্যক বাহুল্যতার প্রশ্রয় সরাসরি অবৈধ ঘোণণা করে অন-আরব রাষ্টগুলির ভ্রান্ত ও বিকৃত রীতিনীতিগুলি তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। সুতরাং পুরুষের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার এবং রেশমী মিহি বস্ত্র পরিধান এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। গগনচুম্বী রাজপ্রাসাদ, উচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ এবং বাহুল্য ও অনাবশ্যক জাঁকজমক ও সাজসজ্জাই সেই সব বিকৃত সমাজ জীবনের প্রাথমিক ধাপ। তার মধ্যেই সমাজ জীবন ধ্বংসের অংকুর নিহিত ছিল।[1] তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা পারস্য এবং রোম-সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়েছিল। এই প্রসংগে তিনি যে ইংগিত দিয়েছিলেন, তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। তা ছিল এই যে, কিস্‌রা ধ্বংস হবে, তার নামচিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না এবং কায়সরের ধ্বংসের পরে তার নাম নেবার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।

১৬. ইমাম আবদুল আযীযের স্বপ্ন

'আমালী-আযীযীয়া' গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ একদিন স্বপ্নে দেখলাম যেন এক ময়দানে শুভ্র ফরাশ পাতা, তার উপর বহুলোক উপবিষ্ট রয়েছেন। ওঁদের সবার

১. মওলানা হিফজুর রহমান কর্তৃক লিখিত 'আল ফুরকান' উর্দু থেকে মূল লেখক কর্তৃক গৃহীত।

চেহারা জ্যোতির্ময় এবং পোশাক জাঁকজমকপূর্ণ । তাঁরা সবাই হযরত আলী (রা.)–র আগমনের প্রতীক্ষা করছেন। আমিও সেই উদ্দেশ্যেই ফরাশের উপর স্থান নিলাম। সহসা পশ্চিম দিক থেকে হযরত আলী (রা.) আবির্ভূত হলেন এবং আমার দিকেই অগ্রসর হলেন। তাঁর উপস্থিতিতে তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য সকলেই দাঁড়ালেন এবং তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ফরাশের প্রান্তে এলেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু মর্যাদাবান বহু লোক ঠেলে ফরাশের প্রান্তে আসতে পারলাম না। সুতরাং আমি ফরাশের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হযরত আলী (রা.) ভিড় অতিক্রম করে আমার দিকেই অগ্রসর হলেন এবং আসন পেতে ফরাশের উপর উপবেশন করলেন। আমি একান্ত বিনীতভাবে তাঁর সম্মুখে দুই হাঁটুর উপর বসেছিলাম। তিনি আমাকে স্নেহ প্রদর্শন করলেন এবং একমাত্র আমার সাথে ছাড়া আর কারো সাথে কথা বললেন না। আমি এই সুযোগকে অমূল্য মনে করেছিলাম এবং যে সব প্রশ্ন ছিল, সেগুলি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন।

সর্বপ্রথম তিনি আমাকে বললেন, 'আমি শুনতে পেয়েছি কে এক ব্যক্তি পোশতু ভাষায় এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছে, যার মধ্যে এমন কিছু কথা রয়েছে যা আমার পক্ষে অবমাননাকর। তুমি সে বিষয় কিছু জান কি?' আমি বললাম, 'দীন গোলাম পোশতু ভাষা জানে না, কাজেই সে বিষয় সম্বন্ধে আমি কোন খবর রাখি না। আপনার হুকুম তামিলের জন্য এখন সে বিষয় সংবাদ নেব।'

এরপরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ফিকহ–ভিত্তিক মযহাবগুলির মধ্যে কোন্‌টি আপনার প্রিয় ?' তিনি উত্তর করলেন, 'কোনটিই আমার কাছে তেমন পছন্দসই নয় এবং কোনটিতেই আমাদের পরিচয় সুস্পষ্ট নয়। কেননা সবগুলি মযহাবেই ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে।'

অতপর আমি তাসাউফের তরীকাগুলির মধ্যে তাঁর কাছে অধিকতর পছন্দসই কোন্‌টি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'এগুলির অবস্থাও তদ্রূপ, কেননা এগুলির মধ্যেও ভালমন্দের মিশ্রণ ঘটেছে। আমার মতে সবগুলিতেই যথেষ্ট গলদ ঢুকেছে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের জন্য আমাদের সময়ে যে খাঁটি তরীকা অনুসরণ করা হতো, তা তিনটি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এই তিনটি

কাজ সকলের উপরই প্রযোজ্য ছিল। এ তিনটি কাজ হলো ঃ যিক্র, তিলাওয়াত এবং নামায।' এই বলার সাথে সাথে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং যেদিক থেকে এসেছিলেন সেদিকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। যাঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন, তারা বিস্মিত হলেন।

'আত্ তাহমীদ' (মওলানা সিন্ধীর অপ্রকাশিত গ্রন্থ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ ১১৮৭ হিজরী অথবা ১১৮৮ হিজরীর রজব মাসে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিবকে শাহ আবদুল আযীয স্বপ্নযোগে দেখেন। তিনি ইমাম আবদুল আযীযকে সমাজ সংস্কার এবং সংগঠনের প্রতি মনোযোগ দিতে আজ্ঞা করেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী তিনি গণ–আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের ফলে জনসাধারণের সহযোগিতায় একটি সামরিক সরকার গঠিত হতে পেরেছিল।

এই স্বপ্ন প্রসংগে সীরাতে সৈয়দ আহমদ শহীদ গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ সেদিন ভোরে তিনি সবার আগে হযরত শাহ গোলাম আলী মোজাদ্দেদী মাযহারীর (মৃত্যু ১২৪০ হিজরী) নিকটে চলে গেলেন। তিনি মীরযা মাযহার জানেজানাঁর খলীফা। শাহ সাহেব তাঁর নিকটে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

শাহ গোলাম আলী বললেন, 'সৈয়দ হাসান রাসূল নোমার মৃত্যুর পর মনে হচ্ছে এ দেশের জনসাধারণের হিদায়েতের প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র মনোযোগ হ্রাস পেয়েছে। স্বপ্নের তাৎপর্য, মনে হচ্ছে–আপনার (অথবা আপনার কোন মুরীদের) দ্বারা পুনরায় দেশ হিদায়েত হবে।' শাহ সাহেব বলেন, 'আমার ধারণায়ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা এই।'

মওলানা নূরুল হক সাহেব লিখেছেন–মওলানা শায়খ আম (عم فيضهم) আমাকে ১৯৪০ সালের ২৬ শে জুন বলেছিলেন যে, এই স্বপ্ন ইমাম আবদুল আযীযের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তাঁর যুগে রসূলুল্লাহ্ পর্যন্ত যোগাযোগ স্থাপনের উপলক্ষ তিনি ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন না। আমার বিবেচনায় তাঁর 'অথবা তাঁর কোন মুরীদের দ্বারা' এ অংশ মীর গোলাম আলী সাহেবের বরাত দিতে প্রবিষ্ট করানো হয়েছে। সৈয়দ আহমদ শহীদের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য। নতুবা মূল স্বপ্নের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

দ্রষ্টব্য ঃ সৈয়দ হাসান রসূল নোমার বিষয় 'খাজিনাতুল্ আসফিয়ায়' সংক্ষেপে উল্লেখ আছে। ১১০৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে তাফহীমাতে ৪৪/২ খুৎবায় লিখেছেন ঃ মীর আবুল আলার অনুসরণকারীদের মধ্যে খাজা মুহম্মদ নামক জনৈক দরবেশ বাহারগঞ্জের নিকটে বসবাস করতেন। তাঁর সৈয়দ হাসান রসূল নোমার সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। কথিত আছে, একদিন সৈয়দ হাসান রসূল নোমা কাওয়ালী সংগীত শুনছিলেন। কাওয়ালীর কথাগুলোতে হযরত রসূলুল্লাহ্র সংগে আত্মিক যোগ স্থাপনের বিষয় ছিল। তিনি সংগীতের কথার সংগে সংগতি রক্ষার্থে নিজেকে একটি শিকের সংগে শক্ত করে বাঁধলেন এবং ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে সংগীতটি আবৃত্তি করতে লাগলেন। এভাবে তিনি নিজেকে কায়মনোবাক্যে রসূলুল্লাহ্য় সমর্পিত করলেন।

১৭. নাদির শাহের অভিযান

সম্রাট মুহম্মদ শাহের আমলে আমীরুল্ উমরা শাম্সামউদ্দাওলাহ্র (মৃত্যু ১১৫১ হিঃ) অব্যবস্থার দরুন কাবুল প্রদেশ এবং সীমান্ত অঞ্চলের শান্তি–শৃংখলা ব্যাহত হয়েছিল। ফলে উপমহাদেশকে এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সে বিপদ ছিল নাদির শাহের আক্রমণ। কাবুলের সুবেদার নাসির খান যদিও খুবই ভাল মানুষ ছিলেন, কিন্তু শিকার করা এবং ইবাদত–বন্দেগী ছাড়া আর কোন ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ছিল না। নাদির শাহ তখন ইরানের সিংহাসন দখল করেছিলেন। তিনি ইরান থেকে এসে কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করেন। দীর্ঘ এক বছর কাল থেকে এ অবরোধ অব্যাহত থাকে। সেখানে তিনি কান্দাহারের বাইরে নাদিরাবাদ নামে একটি নতুন শহর পত্তন করেন। অতপর একদিন তিনি কান্দাহার আক্রমণ ও দখল করেন। কাবুলের সুবাদার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে শুধু এতটুকু করলেন যে, তিনি কাবুল থেকে পলায়ন করে পেশওয়ারে চলে এলেন। নাদির শাহ কান্দাহার থেকে গজনী এবং কাবুলের দিকে ধাবমান হলেন এবং কাবুল দখল করে সেখানে দীর্ঘ সাত মাস অবস্থান করলেন। কাবুল হস্তগত হওয়ার পর নাদির বাহিনী জালালাবাদ এবং সেখান থেকে পেশওয়ার

অভিমুখে অভিযান চালান। পেশওয়ার অতিক্রম করে দুর্ধর্ষ নাদির বাহিনী পাঞ্জাবে প্রবেশ করে। নাদির শাহের আগমনের খবর লাহোরে পৌছামাত্র দেশময় আতংক ছড়িয়ে পড়লো। ১১৫১ হিজরীর ১৫ যিলকাদাহ্ দিল্লীর নিকটে নাদির শাহের সংগে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে শামসামউদ্দওলাহ্ নিহত হলেন। অযোধ্যার ওয়ালী বুরহানুল্ মুলুক্ সায়াদাত খান এবং আসফজাহ্ মিলে কয়েক কোটি টাকা দিয়ে নাদির শাহের সংগে সন্ধি করলেন। ১০ই যিলহজ্জ মুহম্মদ শাহ এবং ১১ই যিলহজ্জ নাদির শাহ দিল্লীর কেল্লায় উপস্থিত হলেন। ঈদুল আযহার দিন দিল্লীর জামে মসজিদে এবং অন্যান্য মসজিদে নাদির শাহের নামে খুৎবা পড়া হলো।

১১ই যিলহজ্জের ঘটনা

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে রটনা করা হলো যে, নাদির শাহের মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে, শহরে টহলরত নাদির শাহ বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের উপর আক্রমণ আরম্ভ হলো। নগরবাসীরা নাদির শাহী সেনাদেরকে হত্যা করতে লাগলো। ১২ই যিলহজ্জের ভোর পর্যন্ত এই হাঙ্গামা চললো। নাদির শাহ খবর পেয়ে পরদিন ভোরে দুর্গ পরিত্যাগ করে বাইরে এলেন এবং পাইকারী হত্যার নির্দেশ দিলেন। অর্ধদিন এভাবে নির্বিচারে হত্যাকান্ড চলার পর শহরবাসী আত্মসমর্পণ করলো। নাদির শাহ এবার দেশের দিকে ফিরে চললেন। তিনি সিন্ধু এবং কাবুল প্রদেশ ইরানের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এবং পাঞ্জাবের কোন কোন অংশ যা দ্বারা কাবুলের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে তাও নিজ দখলে নিয়ে গেলেন। ১১৫২ হিজরীর সফর মাসের ৭ তারিখে তিনি শাহজাহানাবাদ থেকে ইরান রওয়ানা হয়ে গেলেন। (সিয়ারুল্ মুতাআখ্খিরীন)

১৮. মীর আবিস

আফগানিস্তানে আফগানদের জাতীয় সরকারের সূচনা হয় মীর আবিসের সময়ে। মীর আবিস কান্দাহারের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ইরানে আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তার ফলে ইরানে আফগানদের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। নাদির শাহের উত্থান তারই প্রতিক্রিয়া। মীর আবিসের সাথে ইরানের সম্পর্ক ভালো ছিল

না। কিন্তু সম্রাট মুহম্মদ শাহের সাথে তাঁর সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। মুহম্মদ শাহ মীর আবিসের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মীর আবিসও মুহম্মদ শাহের অনুগত বন্ধু ছিলেন।

এই প্রসংগে সিয়ারে মুতাআখ্‌খিরীনের শিয়া মতাবলম্বী লেখক যিনি ইরানীদের সমর্থক ছিলেন, লিখেছেন–আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইরানের সফুবী সুলতানগণ কোন ব্যাপারে উপমহাদেশীয় সম্রাটদের কাছে সাহায্য চায় নি। এ সত্ত্বেও সফুবী সুলতানদের মধ্যে শাহ ইসমাঈল সফুবী শাহ তাহাসফ বাবুর এবং তাঁর পুত্র হুমায়ুনের সাথে যে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার করেছিলেন তা সবার কাছে বিদিত। যদিও সফুবী সুলতানরা উপমহাদেশের মুঘল বাদশাহদের কাছে কোন কিছুর প্রত্যাশী ছিলেন না, তবু তাঁরা তাঁদের দরবারে দূত প্রেরণ এবং অভিনন্দনবাণী ও শোকরান প্রেরণ করে থাকতেন। কিন্তু উপমহাদেশের সম্রাটগণ এই সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহারের প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না।

ইরানে এক সময় বিশৃংখলা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় তাহাসফ পিতা-পিতামহের তখত দখল করেন এবং আক্রমণকারী আফগানদেরকে ইরান থেকে বহিষ্কার করেন। কিন্তু এসব ঘটনায় মুহম্মদ শাহ নীরব ভূমিকা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি দ্বিতীয় তাহাসফকে তাঁর সাফল্যের জন্য কোন অভিনন্দন বাণী পাঠান নি। এর প্রত্যুত্তরে সুলতান তাহাসফ আফগানরাজ মীর আবিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। কান্দাহারের শাসনকর্তা মীর আবিসের পুত্র হোসাইন মুলতান পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন। মুলতানের চতুর্দিকে তারা ভীষণ অত্যাচার এবং লুটপাট চালিয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমাঞ্চলের আফগানরা ইরান অক্রমণ করেছিল। তাদের অধিনায়ক ছিলেন মাহমুদ খান। ১১৩৪ হিজরীতে তিনি ইস্পাহান জয় করেন এবং ইরানের বাদশাহ হোসাইন শাহ সফুবীকে বন্দী করেন এবং রাজধানী দখল করে ইরানের বাদশাহ হয়ে বসেন। তিন বছর রাজত্ব করার পর ১১৩৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। এর পরে আশরাফ নামে তাঁর এক আত্মীয় স্থলাভিষিক্ত হন। ইরান সম্রাট বন্দী থাকলেও তাঁর পুত্র শাহ্‌জাদা তাহাসফ ইরান থেকে পালিয়ে গিয়ে আফগান কর্তৃক অধিকৃত পশ্চিম ইরানের জেলাগুলি

অধিকার করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭২৭ খৃস্টাব্দে তিনি ভাগ্যগুণে নাদিরের ন্যায় একজন গুণী এবং স্বাধীনচিত্ত বীর পুরুষের সাহচর্য লাভ করেন। তাঁর আসল নাম নাদির কুলী খান। পিতার নাম ইমাম কুলী খান। তিনি মামুলী ভবঘুরে সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। অনেকে তাঁকে চামড়াওয়ালা বলতো। নাদিরের পুত্রের সাথে যখন মুহম্মদ শাহের কন্যার বিয়ে হয়, তখন পাত্রী পক্ষের রীতি অনুসারে পাত্রের ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। নাদির তার জবাবে বললেন ঃ

بگو داماد شما پسر نادر شاه است و نادر پسر شمشیر تا همچنین تا هفتاد بار شمار

বল, তোমাদের জামাতা নাদির শাহের পুত্র এবং নাদির শমশীরের (তরবারির) পুত্র ; এভাবে একে সত্তর বার গণনা কর।

নাদিরের জন্ম হয়েছিল ১১০০ হিজরীতে। তাঁর বীরত্ব, প্রতিভা এবং বিচক্ষণতা ছিল বিস্ময়কর। দেশের পর দেশ এবং রাজ্যের পর রাজ্য তিনি জয় করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি ইরানকে ১১৪৩ হিজরীতে পাঠান দখলকারীদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছিলেন। ইরানের বাদশাহ এর বিনিময়ে নাদির খানকে খোরাসান, মাজেন্দারান, সিস্তান, কেরমান প্রভৃতি প্রদেশ দান করেন। ১১৪৮ হিজরীতে নাদির ইরানের পরিসর এত দূর প্রসারিত করেন যে, ইরান তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। ১১৫০ হিজরীতে সফুবী বংশের পতন হয়। এবার নাদির শাহ–ই ইরানের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বসেন এবং ১১৫২ হিজরীতে ঝঞ্ঝার গতিতে উপমহাদেশ আক্রমণ করেন (তারীখে যাকাউল্লাহ্ ২৪৮/৯)।

১৯. আহমদ শাহ আবদালী

১১৬০ হিজরীতে নাদির শাহ তাঁর কর্মচারীদের হাতে নিহত হন। আহমদ শাহ দুররানী নাদির শাহের সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি উচ্চপদ ও মর্যাদা লাভ করেন। নাদিরের মৃত্যুর পর আহমদ শাহ দুররানী কাবুল এবং

কান্দাহার দখল করেন। নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং খুৎবা পাঠ করান। নাদির শাহের যুগে নাসির খান ছিলেন কাবুলের সুবেদার। আহমদ শাহ আবদালী তাঁকে তাঁর পূর্ব পদে বহাল রাখেন। কিন্তু পাঁচ শ দুররানী সৈন্য তাঁর ওখানে প্রেরণ করেন। এবং রাজ–সরকারের দেয় পাঁচ লাখ টাকা তলব করলেন। নাসির খান কাবুল ফিরে এসে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন। আহমদ শাহ নাসির খানকে শায়েস্তা করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। নাসির খান পলায়ন করে পেশওয়ার চলে যান। আহমদ শাহ সীমান্তে পৌঁছে জানতে পারেন যে, সীমান্ত এবং পাঞ্জাবের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সুতরাং তিনি সেনাবাহিনীসহ লাহোরের দিকে অগ্রসর হন। মুহম্মদ শাহ সংবাদ পেয়ে আহমদ শাহের বিরুদ্ধে দিল্লী থেকে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু আহমদ শাহ লাহোর অধিকার করে সাতলেজ নদীর তীরে উপস্থিত হন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা বারো হাজারের অধিক ছিল না। তার কারণ, তিনি সংখ্যাধিক্যের চেয়ে সৈন্যদের শক্তি–সামর্থ্যের উপর অধিকতর আস্থা রাখতেন। ১১৬১ হিজরীর ১৩ই রবিউল আউয়াল তারিখে তিনি সিরহিন্দ অধিকার করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হন। ১৫–২৭ রবিউল আউয়াল তারিখে সাতলেজের তীরে উভয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সম্রাট মুহম্মদ শাহ নাদির শাহের শক্তি–সামর্থ্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। সুতরাং সম্রাটের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। দুররানীকে লাহোর ও মুলতান এই দু'টি প্রদেশ ছেড়ে দিয়ে তাঁর সাথে সন্ধি করে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। আহমদ শাহ পুত্র মুঈনুল মূলক কমরুদ্দীন খানের হাতে প্রদেশদ্বয়ের ভার ন্যস্ত করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১১৭০ হিজরীতে সেপ্টেম্বর মাসে আহমদ শাহ আবদালী পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করেন। এবার তিনি দিল্লী এমনভাবে লুণ্ঠন করেন যে, নাদির শাহকেও অতিক্রম করে গেলেন। আহমদ শাহ যদিও নাদির শাহের ন্যায় রক্তপিপাসু ছিলেন না কিন্তু তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল ভীষণ হিংস্র। তারা দু'মাস ধরে যথেচ্ছা লুণ্ঠন চালিয়েছিল। ১১৭১ হিজরীতে আহমদ শাহ ইরান প্রত্যাবর্তন করেন। (তারিখে যাকাউল্লাহ)

২০. হিন্দুস্তানের আফগান প্রদেশ

হিন্দুস্তান একটিমাত্র দেশের নাম নয়। এ হচ্ছে বহুদেশ সমন্বিত একটি বিরাট ভূখন্ড। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস লিখতে গিয়ে শায়খ মুহম্মদ কাসেম লিখেছেন, হিন্দুস্তান এক জাতির বাসভূমি নয়। এখানে বিভিন্ন জাতি বসবাস করে। গোত্র, ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে তারা একে অন্য থেকে পৃথক। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাস্‌উদী লিখেছেন, জ্ঞানী ও গবেষকদের মতে অতীতে হিন্দুস্তান জ্ঞানগরিমায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী দেশ ছিল। কালক্রমে এখানে রাজার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দেশের প্রথম রাজার নাম মহাব্রহ্মা। মহাব্রহ্মা তাঁর সভায় গুণীজ্ঞানীদেরকে একত্র করেছিলেন। তাঁরই যুগে 'সনদে হিন্দ' গ্রন্থ্ এবং 'দহ্‌রোদ্দহর' নামে তার ভাষ্য লিখিত হয়। এর পরে 'মাহসবতী'র ন্যায় গ্রন্থাদি লিখিত হয়েছিল। বাত্‌লিমুসের উৎস এই গ্রন্থ্। ব্রহ্মার পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ আছে। কারো কারো মতে তিনিই হযরত আদম (আ.)। তাদের মতে হযরত আদম পয়গম্বররূপে প্রেরিত হয়েছিলেন। কারো কারো মতে ব্রহ্মা জনৈক রাজার নাম। শেষোক্ত মতই অধিকতর প্রসিদ্ধ।

হিন্দুস্তান এক অতি বিশাল ভূখন্ড। বহু বিস্তৃত মাঠ, প্রশস্ত নদী এবং পাহাড়-পর্বতে এ ভূ-ভাগ পরিপুর্ণ । এর এক প্রান্ত খোরাসানের সাথে এবং অপর প্রান্ত তিব্বতের সাথে মিলিত। এ সমস্ত দেশ পর্বতশ্রেণী দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দেশগুলোর মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়ে থাকে এবং এরা বিভিন্ন ভাষাভাষী।

'কাসফুজ জুনুন' প্রণেতা চলপীর মতে ঃ হিন্দুস্তানের অধিবাসিগণ উন্নত চিন্তা-গবেষণার জন্য খ্যাত। তারা গণিত, জ্যামিতি, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু গবেষণা করেছে, এদেশের জনসাধারণ গ্রহ-নক্ষত্রকে সম্মান করে। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি বিষয়ে এদেশের লোকের স্বকীয় মতামত বিদ্যমান।

আজাদ বিলগ্রামী তাঁর 'সুব্জাতুল ওয়াজান' গ্রন্থে লিখেছেন, হিন্দুস্তান বলতে দিল্লী, সিন্ধু, দাক্ষিণাত্য এবং শিলং পর্যন্ত ভূ-খন্ডকে মনে করা হতো।

হিন্দুস্তান এবং খোরাসানের মধ্যবর্তী দেশ কাবুল। যুগ যুগ ধরে এদেশ হিন্দুস্তানের শামিল ছিল। আবার হিন্দুস্তান বলতে কখনো কখনো শুধু দিল্লীর অধীনস্থ সাম্রাজ্যকেই বুঝাতো।

আমার (উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী) মতে যে সমস্ত নদনদী সিন্ধু নদে এসে মিলিত হয়েছে তার উপকূলবর্তী দেশসমূহ--কাবুল, হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণাঞ্চল এবং পোশতু ভাষাভাষী কান্দাহার এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সবই হিন্দুস্তানের অন্তর্গত। পোশতু ভাষা সংস্কৃত ভাষারই সন্তান। আমার মতে রাষ্ট্র বিভিন্ন হলেও এ ভূ-ভাগকে হিন্দুস্তানের বহির্ভূত মনে করার কোন কারণ নেই। ঐতিহাসিক দলিল আমার এ মতের অনুকূলে। এ কথা সত্য যে, অনেক মুসলিম ঐতিহাসিক এই অঞ্চলকে হিন্দুস্তানের বাইরের দেশ বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এটা তাঁদের ভুল। তাঁরা কখনো এ অঞ্চলের ভাষা এবং স্থানের নাম সম্পর্কে গবেষণা করে দেখেন নি। মওলবী যাকাউল্লাহ তাঁর লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আরবীতে অন্যান্য জাতির নামের আরবীকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণে বহু নামের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করা মুশকিল হয়েছে। ইংরেজরা এ ব্যাপারে বহু কালি-কলম খরচ করেছেন। কিন্তু তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন। আরবী এবং সংস্কৃত উভয় ভাষাতে পন্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই শুধু এ ব্যাপারে যথার্থ অনুসন্ধান কার্য চালানো সম্ভব। সংস্কৃত ভাষাবিদদের পক্ষে আসল নাম কি ছিল, তা নির্ণয় করা এবং আরবী ভাষায় জ্ঞানের সাহায্যে কি প্রক্রিয়ায় এর আরবী রূপান্তর ঘটেছে, তা স্থির করা যেতে পারে। কোন ইতিহাসে লেখা আছে কাবুলের রাজাদের পদবী ছিল রনবিতল। অনেকে তাদের জনবিল লিখেছেন, কেউ বা জিবন, কেউ রতবিল, আবার কেউ রনবিলও লিখেছেন। আসলে এটি একটি অর্থবোধক হিন্দু নাম। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিব্বতের পার্বত্য এলাকা থেকে যে তুর্কীরা কাবুলে এসেছিল, তাদের ধর্ম ছিল বৌদ্ধ। এই তুর্কীদের হাত থেকে ব্রাহ্মণদের হাতে এবং তাদের হাত থেকে রাজপুতদের হাতে রাজত্ব হস্তান্তরিত হয়। তখন কাবুলের রাজার নাম ছিল রামপাল। রামপাল নামকেই তারা বিকৃত করে রনবিল বলতে থাকে।

২১. হানাফী ফিক্‌হ

ইমাম আবূ হানীফার রাজনৈতিক আদর্শ ছিল বৈপ্লবিক। ইরানী চিন্তাধারায় সহজে গৃহীত হয়, এমনভাবেই তিনি ফিক্‌হ শাস্ত্রকে পুনর্গঠন করতে চেষ্টা করেছিলেন। কুরআন এবং সুন্নাহ্ থেকে ইজতিহাদ করা আরব চিন্তাধারার অনুকূল। তারা বাল্যকাল থেকেই কুরআন বুঝতে শেখে। হাদীস এবং 'আসার' সম্পর্কেও বাল্যকাল থেকেই তাদের ধারণা হয়। তারা সমস্ত বিষয় কুরআন এবং সুন্নাহ্ থেকে ইজতিহাদ করে নিত। অবশ্য জটিল বিষয়ে তারা বিশিষ্ট ইমাম বা মুজতাহিদের মত মেনে নিত। কিন্তু খিলাফত ইরানীদের হাতে চলে যাওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইরানী শাসকগণ কুরআন ও সুন্নাহ্ আরবদের ন্যায় সহজে উপলব্ধি করতে অভ্যস্ত ছিলেন না বিধায় প্রত্যেকটি বিষয়কে তাঁরা জ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝতে চাইতেন। ইমাম আবূ হানীফার প্রতি সাধারণত এই অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, তিনি আহলে সুন্নাহ থেকে স্বতন্ত্র পথ গ্রহণ করেছেন। এখানেই ইমাম আবূ হানীফার স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। ইমাম আবূ হানীফা সাধারণ আলিমদের পথ থেকে স্বতন্ত্র পথে চলেছেন বলে, যে যে বিষয়ে তাঁকে সন্দেহ করা হয়ে থাকে, সেগুলি সবই ইবরাহীম নখয়ী থেকে আগত। ইবরাহীম নখয়ী আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (র.)–এর শাগরিদদের মধ্যে একজন সর্বজনমান্য ইমাম। সুফিয়ান বিন সাঈদ সওরীও তাঁরই পন্থী একজন বিশিষ্ট মুজতাহিদ। পরে ইবরাহীম নখয়ীর সাথে ইমাম বুখারীরও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। ইমাম বুখারী ইসহাক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক থেকে, তিনি সুফিয়ান সওরী থেকে, তিনি ইবরাহীম নখয়ীর শাগরিদ অর্থাৎ মনসুর আমাস হাম্মাদ এবং হাকাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। প্রথমোক্ত দু'জন হাদীসে এবং শেষোক্ত দু'জন ফিক্‌হায় তাঁর ওস্তাদ ছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফার বৈশিষ্ট্য এখানে যে, তিনি ইব্‌রাহীম নখয়ীর ফিক্‌হ পুনর্গঠন করেন এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন মত ইজতিহাদ করার নীতি নির্ধারণ করেন। ইমাম আবূ হানীফা এ কাজ না করলে ইরানী ফকীহ্ এবং ইরানী খিলাফত ইসলামী আইন কার্যকরী করতে পারতো না।

ইমাম আবূ হানীফার এ অবদানের জন্য মুসলিম সমাজ চিরদিন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু তাঁর বৈপ্লবিক রাজনীতি তাঁর ফিক্‌হ কার্যকরী হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ আলিমগণ ইমাম আবূ হানীফার নামে আত্মগোপন করতেন। তাঁরা ভয় করতেন, না জানি তাঁরা সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়ে যান। তবে এ সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলেন ইমাম আবূ ইউসূফ। তিনি আব্বাসীয় খলীফাদের সংগী হয়ে ইমাম সাহেবের রাজনীতি থেকে পৃথক থাকলেন। এভাবে আব্বাসীয় খিলাফত চালানোর জন্য যে সব আইন–কানুনের প্রয়োজন ছিল, তা হানাফী ফিক্‌হ গ্রহণ করে তাই পুনর্গঠন করলেন।

আসল কথা হলো এই যে, হযরত ওসমান (রা.)–এর যুগ পর্যন্ত বিধি–বিধান এবং আইন–কানুনের উৎস ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন। অবশ্য ফকীহ্‌রা ইজতিহাদ করতেন। কিন্তু তাঁদের মতবিরোধ কোন অনিষ্টকর রূপ গ্রহণ করতো না। তার কারণ ফকীহদের এলাকা নির্দিষ্ট ছিল। কেউ হয়তো পূর্বদেশে বসে এক প্রকার রায় দিতেন, পশ্চিম দেশের ফকীহ্ হয়তো ভিন্ন রায় দিতেন। লোকেরা তাঁদের মতের বিভিন্নতা সম্পর্কে জানতেই পারতো না। এজন্যই তখনকার ফকীহ্‌দের মতবিরোধ কোনরূপ জটিলতার সৃষ্টি করতো না। অবশ্য মদীনায় অথবা হিজায ভূমিতে এ ধরনের মত–বিরোধ দেখা দিলে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে, খলীফা নিজেই তার ফয়সালা করে দিতেন। ফলে মতবিরোধ কোন ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছতে পারতো না।

তার পরে এলো বনু উমাইয়ার যুগ। তাদের যুগে খিলাফতের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বিভিন্ন রাজ্য জয়ের প্রতি। ফকীহ্‌দের অবস্থাও প্রায় পূর্বের ন্যায়ই ছিল। অর্থাৎ রাজ্যের মধ্যে ফিকাহ্‌ঘটিত কোন মতান্তর দেখা দিলে তা নিয়ে বিরুদ্ধতা করা হতো না। অপর দিকে স্থানীয় গবর্নরগণের স্ব স্ব এলাকার জন্য কাযী নিযুক্ত করার অধিকার ছিল। কিন্তু যখন রাজধানীতে কোন বিরোধ দেখা দিত, তখন বনু উমাইয়ার খলীফাদের এতটুকু শিক্ষা অবশ্যই ছিল যে, তাঁরা বিভিন্ন ফকীহ্‌র মতামত শুনে একটিকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করতে পারতেন। আমি নিজে বনু উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আবদুল মালেকের কোন ফতোয়া দেখেছি, আজ পর্যন্ত কোন ফকীহ্ তার মুকাবিলা করতে পারেন নি। খলীফা যখন কোন বিরোধ

মীমাংসায় অক্ষম হতেন, তখন মদীনার ফকীহ্দের শরণাপন্ন হতেন এবং তাঁদের ফয়সালা গ্রহণ করা হতো। স্মরণীয় যে, বনু উমাইয়া শাসকগণ ইসলামের জ্ঞানকেন্দ্র দামেশ্কে স্থানান্তরিত করেন নাই। মদীনাকেই উৎস মনে করেন। কিন্তু আব্বাসীয় খলীফাগণ বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করার সাথে সাথে শিক্ষাকেন্দ্রও সেখানে নিয়ে যান। এজন্য তাঁদের খলীফা ইমাম মালেককে মদীনা ছেড়ে বাগদাদে গিয়ে হাদীস শিক্ষা দিতে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তিনি কি মদীনা ছেড়ে যেতে রাযী হতে পারতেন ? তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

আব্বাসীয় খলীফাদের যুগে খিলাফতের অবস্থা নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। তাঁদের যুগে মদীনার পরিবর্তে বাগদাদই হয়ে উঠে ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। আব্বাসীয় খলীফাদের মধ্যে ফকীহ্দের বিভিন্ন মতামত বিচার করে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যোগ্যতা ছিল না, যেমন বনু উমাইয়া খলীফাদের। সুতরাং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমস্ত প্রশ্ন কেন্দ্রে এসে জমা হতো। শাসনভার ইরানীদের হাতে চলে যায়। ফকীহ্দের ইজতেহাদ উপলব্ধি করার যোগ্যতার অভাব ছিল তাদের। সুতরাং কোন বিশেষ মতকে অগ্রাধিকার দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রাদেশিক গবর্নরদের ক্ষমতা এ সব ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং ফিকাহ্র প্রশ্নে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে তা সরাসরি কেন্দ্রে প্রেরণ করা হতো। এ অবস্থায় খলীফার প্রয়োজন ছিল এমন অভিজ্ঞ এবং বিদ্বান লোকের, যিনি সর্বদা তাঁর সন্নিধানে থাকবেন এবং শ্রেণীর মতবিরোধ মীমাংসা করতে সক্ষম হবেন। খলীফা মনসুর এ জন্য প্রথম দিকে মদীনার ফকীহ্দেরকে নিজের পক্ষভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সহযোগিতা লাভে তিনি অসমর্থ হন। অতপর খলীফা মনসুর ইরাকবাসী ফকীহ্দের শরণাপন্ন হন। তিনি ইমাম আবূ হানীফাকে এ কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক মতভেদের দরুন মনসুর ইমাম আবূ হানীফার সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হন। ইমাম আবূ ইউসুফই সাহসের সাথে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগকে সংগঠন করে তোলেন। এজন্যই তিনি মুসলিম জাহানের 'কাযীউল কুজ্জাহ্' খ্যাতি লাভ

করেছিলেন। তিনি আদালতগুলির স্তর বিন্যাস করে রাজধানীর বিচারালয়কে আপীলের সর্বোচ্চ আদালতরূপে গঠন করেন। কিন্তু এজন্য সর্বত্র একই কানূন প্রবর্তিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ইমাম আবূ ইউসুফ ইমাম আবূ হানীফার ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য একটি কার্যবিধি আইন প্রণয়ন করেন এবং ইমাম মুহম্মদ বিন্ হাসান শায়বানীর উপর আইন শিক্ষা দানের ভার অর্পণ করেন। তখন দাঁড়ালো এই যে, ইমাম মুহম্মদের কাছে শিক্ষালাভ করে যারা বের হতো, তারাই শুধু অঞ্চলের কাযীর পদের যোগ্য বিবেচিত হতো এবং তারাই নিযুক্ত হতো। এ কাযিগণ আবার তাদের শাগরিদদের মধ্য থেকে বাছাই করে ক্ষুদ্র কাযীর পদের জন্য লোক নির্বাচন করতো। এভাবে এই দুই মনীষী ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহম্মদ (র.)–এর প্রচেষ্টায় সমগ্র মুসলিম জাহান একই ধরনের কানুনের আওতায় এসে যায়। এটা ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। এ যুগে ইমাম আবূ হানীফার গুরুত্ব যেমন স্বীকার্য, তেমনি ইমাম আবূ ইউসুফ এবং মুহম্মদের গুরুত্বও বিস্মৃত হবার নয়। হানাফী ফিক্‌হ এবং হানাফী ইমামদের বিশেষত্ব এখানে।

আমাদের ধারণায়, ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহম্মদ উভয়ে মিলে যা করেছিলেন শাহ ওয়ালী উল্লাহ্‌র ফিক্‌হ, হাদীস এবং তাসাউফ প্রচলন করার কাজে ইমাম আবদুল আযীয একাই সে কাজ করেছিলেন। এ কথা সত্য যে, তাঁর দু'ভাই শেখ রফীউদ্দিন এবং শাহ আবদুল কাদের তাঁর সহকর্মী ছিলেন। কিন্তু চূড়ান্ত রায় দেবার মালিক শাহ্ আবদুল আযীযই ছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে সম্রাট আলমগীরের পরে হিন্দুস্তান আর একবার (হানাফী ফিক্‌হ) একই কানুনের শৃংখলার অধীনে থাকে। সারা হিন্দুস্তানে এমন কোন হানাফী মতাবলম্বী আলিম নেই, শাহ আবদুল আযীযের কাছে ঋণী নন। বিদ্রোহী সব সমাজেই দেখা যায়, কিন্তু সে জন্য সমাজ ব্যবস্থার সুষ্ঠুতার উপর কোন দোষারোপ করা যায় না।

২২. উপমহাদেশে শিয়া আন্দোলন

৩৯১ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ উপমহাদেশ আক্রমণ করেন। তিনি পেশওয়ারের অদূরে হুন্ডা নামক স্থানে লাহোরের শাসনকর্তা জয়পালকে

পরাজিত করেন। মুলতানের পার্শ্ববর্তী এলাকায় কেরামতা'র শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুলতানের বিখ্যাত মন্দির মুহম্মদ বিন কাসিম ধ্বংস করেন নাই, কেরামতা ওটি ধ্বংস করে সরকারী প্রাসাদে পরিণত করে। সুলতান মাহমুদ কেরামতাকে পরাজিত ও বিতাড়িত করে সে প্রাসাদকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এ ঘটনার অনেক পরে সম্রাট হুমায়ুন উপমহাদেশ থেকে পলায়ন করে ইরানে শাহ ইসমাঈলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি ইরানের বাদশাহ্‌র সাথে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে তাঁর নিকট থেকে সৈন্য লাভ করে যুদ্ধ করে নিজের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। সে চুক্তিটি মূলে কি ছিল ? সে চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ

'হুমায়ুন ইরানের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।' এজন্যই সম্রাট আকবরকে জাতীয় সরকার গঠন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হয়েছিল, যাতে দেশীয় সরকার গঠিত হয় এবং ইরান সরকারকে বলা চলে যে, যে সরকার তাঁদের সাথে আনুগত্যের ওয়াদা করেছিল, সে সরকারের অস্তিত্ব নেই, তৎস্থলে তার পরিবর্তে দেশীয় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; কথিত চুক্তির সাথে তার তিল পরিমাণ সম্পর্ক নেই। সম্রাট আকবর হিন্দুদের এ কারণেই সরকারে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য সরকারে হিন্দুদেরকে গ্রহণ করে আকবর নতুন কিছু করেন নাই। শের শাহ, ফিরোজ শাহ এবং নাসিরুদ্দীন হাসান পূর্বেই এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু জাতীয় সরকার সর্বপ্রথম সম্রাট আকবরই গঠন করেন।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই ঃ আবদুর রহীম খানে খানানের পুত্র বৈরাম খাঁর মাধ্যমে ইরানের শাহের সাথে হুমায়ুনের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। নতুবা ইরানের শাহ হুমায়ুনকে সাহায্য করতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক ছিলেন না। হুমায়ুন যখন স্বীকার করলেন যে, তিনি তাঁর রাজত্বে শিয়া মত প্রচলন করবেন এবং শিয়াদের প্রতিনিধি স্থানীয় বৈরাম খাঁকে তাঁর সাথে গ্রহণ করবেন, মাত্র তখনই তিনি ইরানের সাহায্য লাভ করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যভার সম্পূর্ণরূপে বুঝে নেওয়ার পর আকবর সর্বপ্রথম বৈরাম খাঁকে শাসনকার্য থেকে পৃথক করে দেন। বৈরাম খাঁ ইরানের পথে হজ্জে রওয়ানা হন। আকবর তাতে বাধা দিলেন এবং তাঁকে হত্যা করানো হলো। তারপর ইরান থেকে কোন

এজেন্ট উপমহাদেশে আসে নাই। আকবর ইরানী প্রভাবের মূলোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে ইসলামী সরকার খতম করে তার পরিবর্তে দেশীয় সরকার স্থাপন করেন। তখন না কোন সুন্নী খলীফা তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত, না কোন শিয়া বাদশাহ কর্তৃত্ব করতে পারত। উপমহাদেশ আকবরের ন্যায় আর একজন ন্যায়নিষ্ঠ বাদশাহ সৃষ্টি করে নাই। কানুনের চোখে তাঁর সন্তান এবং শত্রু এক বরাবর ছিল।

উত্তর উপমহাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ উপমহাদেশের গোলকুন্ডায় শিয়াদের কেন্দ্র ছিল। সেখানে তানাশাহী ক্ষমতাসীন ছিল। সম্রাট আলমগীর সেই শাসন উচ্ছেদ করেছিলেন। ১০৯৮ হিজরীর যিল্‌কদ মাসের শেষের দিকে আবুল হাসান বন্দী হয়ে দওলাতাবাদ কেল্লায় নীত হন। সিয়ারুল্ মুতাআখ্‌খিরীনের শিয়া লেখক লিখেছেন ঃ গোলকুন্ডার সুদৃঢ় দুর্গ এবং হায়দরাবাদ ভূ-খন্ডের সৌন্দর্য, তার আবহাওয়ার মনোমুগ্ধকারিতার কথা বর্ণনা করার সাধ্য কারো নেই। সেখানকার বাদশাহ আবুল হাসান স্বেচ্ছাচারিতা এবং আমোদ-প্রমোদে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ফলে দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও অনাচার ছড়িয়ে পড়ে। নৈতিক অধঃপতন ব্যাপক হয়ে পড়ে। সম্রাট আলমগীর নিজকে ধার্মিক বলে প্রচার করতেন এবং সংসারবিরাগীরূপে নিজকে জাহির করতেন। হায়দরাবাদকে তিনি দারুল জিহাদ বলে ঘোষণা করেন; সুতরাং সেখানকার অধিবাসীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হলো এবং শহর বিধ্বস্ত করা হলো। আলমগীরের আসল উদ্দেশ্য ছিল আবুল হাসানের জগদ্বিখ্যাত ধনভান্ডার হস্তগত করা, সেখানকার শিয়া আলিমদের নিধন করা এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে তাঁর অনুগত করা।

এরপরে সম্রাট মুহম্মদ শাহের রাজত্বের শেষের দিকে লক্ষ্ণৌ ছিল শিয়াদের কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে দিল্লীর উপর অধিকার বিস্তার করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চলছিল। এদের বাধা দেবার জন্য শাহ আবদুল আযীয 'তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া'র প্রাচীর খাড়া করেছিলেন। জনসাধারণ শিয়াদের প্রভাব কাটিয়ে উঠলে পরই শুধু তাদের 'ইজালাতুল খিফা' পড়তে দেওয়া যায়।

আবু জরআ রাবীর বরাতে 'আল-খতীব' বলছেন ঃ তিনি বলেছেন যে, হযরত (স.)-এর সাহাবাদের দোষত্রুটি বের করতে যাদেরকে দেখ, তাদেরকে যিন্দীক মনে করো। রসূল কি সত্য নয় ? কুরআন সত্য নয় কি ? কুরআন এবং রসূলের আহ্বান সবই আমরা সাহাবাদের মারফতে জানতে পেরেছি। সুতরাং যারা সাহাবাদের ছিদ্রান্বেষণ করে, মূলে তারা কুরআন ও সুন্নাহ্কেই বাতিল করতে উদ্যত। নিঃসন্দেহে তারা যিন্দীক। যিন্দীকের প্রধান ব্যক্তি শাকেরকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে বাদশা হারুন-অর-রশীদের দরবারে উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কেন তারা সর্বপ্রথমে তাদের শাগরিদগণকে সাহাবাদের অস্বীকার করতে এবং তকদীরের[২] তালিম দিয়ে থাকে ? তার উত্তরে সে বলেছিল যে, সাহাবীদের অস্বীকারের অর্থ অন্য কথায় তারা যে ধর্মমত অনুসরণ করে তার মূলোৎপাটন। কেননা অনুসরণকারীকেই যখন সন্দেহ করা হয় তখন তার প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কেও নিঃসংশয় হওয়া যায় না। (খতীব বাগদাদী ঃ পৃঃ ৩০৮/৪)

শেখ সাদীর সমকালীন তুরপুশতী হানাফী। তাঁর কথা তাবকাতুস সাব্কীতে উল্লেখ আছে। ইমাম ফয্লুল্লাহ তাঁর 'আল মুতামেদ' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পরিচ্ছেদে লিখেছেন যে, যারা হযরত আবূ বকরের খিলাফতের বিরুদ্ধতা করে তারা আসলে সাহাবাদের সকলকেই নিন্দা করে। সাহাবাদেরকে নিন্দা করা এবং তাঁদের সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করার অর্থ ধর্মের বুনিয়াদে আঘাত করা ; কেননা কুরআন, হাদীস এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান সাহাবাদের সূত্রেই আমরা লাভ করেছি।

তাদের ধারণা মতে, সাহাবাগণ যদি ভ্রান্তপথের অনুসারী হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের দ্বারা অনুসৃত ধর্ম কিরূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ? মোট কথা, সাহাবাদের প্রতি দোষারোপ করলে ধর্মই থাকে না। (আল্ ইওয়াকীত অল্ জওয়াহের ঃ পৃঃ ২২৬)

তকদীর-অদৃষ্ট।

২৩. মওলানা রফীউদ্দীন

মওলানা রফীউদ্দীন প্রণীত 'আস্‌রারুল্ মুহিব্বা'র একখানা প্রাচীন কপি লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজের লাইব্রেরীতে মওজুদ রয়েছে। ১৯৪১ সনের আগস্ট মাসে আমি এই পুস্তকটি পরীক্ষা করার সুযোগ পাই এবং প্রয়োজনীয় নোট গ্রহণ করি। গোটা পুস্তকের নকল নিয়ে আসারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সহসা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। আল্লাহ্ অন্য কোন সময় এ কাজের সুযোগ দিতেও পারেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, বিশ্বের সব জিনিসের মূলে প্রেমের (আকর্ষণ) অস্তিত্ব বিদ্যমান। আলোচনা প্রসংগে তিনি কুরআনের প্রেম সম্পর্কিত আয়াতগুলির বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয় সম্পর্কে শুধু ফারাবী এবং বুআলী সিনাই কিছু আলোচনা করেছেন। বুআলী সিনার কবিতা তাঁর সম্মুখেই ছিল। هبطت اليك من المكان الارفع الخ [৩]

উপরোক্ত কবিতার জওয়াবে মওলানা রফীউদ্দীন সাহেব সুললিত ছন্দে আরবীতে যে কবিতা লিখেছেন, তার আরম্ভ এই ঃ

عجبا لشيخ فيلسوف المعى خفيت عليه منارة من شرع

তরজমা ঃ সেই বিরাট দার্শনিকের পক্ষে বিস্ময়, সত্যের সেই আলোকস্তম্ভ তার কাছে রয়েছে গোপন।

উপসংহারে তিনি লিখেছেন ঃ

ثم الصلوة على النبى و اله و الحمد لله العلى الارفع

তরজমা ঃ নবী এবং তাঁর পরিবার–পরিজনের প্রতি দরূদ, এবং প্রশংসা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ আল্লাহ্‌র।

'রিসালা–ই–মুহিব্বার' তিনটি অংশ রয়েছে–তাহসিল, তাযয়ীল এবং তফসীল। (আবজদুল্ উলুম ঃ ২৫৪ পৃঃ)

রিসালা–ই–'তাকমীলুল্ আযহানের' বেশির ভাগ 'আবজদুল্ উলুমে' এসেছে। দেখ–১২৭, ১৩২, ২৩৫ এবং ২৭০ পৃঃ।

---

৩. الخ চিহ্ন দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কবিতার একটি অসম্পূর্ণ লাইন ; সুতরাং উহা অবোধ্য– অনুবাদক।

অন্য কথায় 'মনতেক' অধ্যায় ছাড়া গোটা বই প্রায় আবৃজদুল্ উলুমে এসেছে। এই বিভিন্ন কপি নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যেতে পারে ঃ

(১) পীর সাহেবুল্ ইল্ম–সিন্ধু কুতুবখানা থেকে আমি নকল করেছি এবং সে কপি আমার কাছে বর্তমানে রয়েছে।

(২) হাফিজ আবদুল আযীয পিতা মওলভী আহমদ সাহেব বাহ্ওয়ালপুর।

(৩) মওলভী আবদুত্ তাওয়াব মুলতানী।

(৪) মওলভী আবদুল আযীয অথবা মওলভী আবদুত্ তাওয়াবের কপি থেকে ওরিয়েন্টাল কলেজের ভূতপূর্ব হেড মৌলভী মওলানা নজমুদ্দীন সাহেব কর্তৃক নকলকৃত তাঁর নিজস্ব কপি।

(৫) মওলভী সুলতান মাহমুদ (মুলতান)।

শেখ মুহসেন তাঁর 'ইয়ানে জনী' গ্রন্থে শাহ রফীউদ্দীন প্রণীত গ্রন্থের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন তা হলো স্থানে স্থানে তার রহস্যময়তা। সেগুলি উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। গ্রন্থকার গুটিকয়েক শব্দ ব্যবহার করে বিশাল জগৎ সৃষ্টি করেছেন। আমার মতে এ উভয় বৈশিষ্ট্যই 'তাকমিলুল্ আয্হানে' পরিস্ফুট। উল্লিখিত গ্রন্থে চারটি অধ্যায় রয়েছে। মন্তেক, তাহসীল, উমুরে আম্মা এবং তাত্বীকুল আরা।

এ ধরনের স্বয়সম্পূর্ণ গ্রন্থ পূর্বে কখনো লিখিত হয়নি।

রিসালায়ে 'হামালাতুল্ আরশ্'–এর উল্লেখ শেখ মুহসেন 'ইয়ানিউল জানী'তে করেছেন।

বোম্বাইতে মুদ্রিত তফসীর–ই–আযীযীতে আয়াত ঃ

و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه –

'সেদিন আটজন তোমার প্রতিপালকের আরৃশ বহন করবে।' শাহ আবদুল আযীয এই 'রিসালা' নকল করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

ফাযেল ও কামেল ভাই শেখ মুহম্মদ রফীউদ্দীন (ইহ–পরকালে অবিচ্ছিন্ন সাফল্য এবং কল্যাণের অধিকারী) তাঁর কোন গ্রন্থে লিখেছেন যে, হামালাতুল

আর্‌শ্ বলতে তাঁদেরকেই বুঝায় যাঁরা ইব্‌দা, খল্‌ক, তদ্‌বীর ও তদল্লী[৪] আল্লাহ্‌র এই চারটি সিফতের বাহক। ৯৯ পৃঃ (মুহম্মদ নূরুল হক)

برادر فضائل اکئین کمالات اگین شیخ محمد رفیع الدین سلمه الله و زاده فی الدنیا و الدین فتوحا و برکاتا متواترا و متوالیا در بعضی تصنیفات خود چنین نوشته اند که حملة العرش حملی باشند که حامل کمالات اربع الهیه اند ـ ابداع ـ و خلق ـ و تدبیر و تدلی الخ ۹۹ع و الله اعلم ـ محمد نور الحق ـ

তফসীরে আয়াতে নূর।

শেখ মুহসেন ইয়ানিউল্ জানীতে এই রিসালার আলোচনা করেছেন ঃ

الله نور السموٰة و الارض ـ

'আল্লাহ্‌ই হচ্ছেন আসমান যমীনের নূর।'

'সাৎআৎ' নামক গ্রন্থে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ যে আলোচনা করেছেন শাহ রফীউদ্দীন সাহেবের উক্ত রিসালা তারই পরিপূরক। অন্যান্য গবেষণাকারী উক্ত আয়াতের যে সব ব্যাখ্যা করেছেন এই রিসালায় সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এতে একটি নতুন বিষয় এই রয়েছে যে, যাঁরা পদার্থের রহস্য নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদেরকে তিনি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর ওয়ালিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে পঞ্চম শ্রেণীর নেতা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, গবেষণা এবং জ্ঞানের ব্যাপকতার দিক থেকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য ছিল।

উপরোক্ত পাঁচটি শ্রেণী তিনি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। প্রাচীন মুহাদ্দিসবৃন্দ, কালাম শাস্ত্রবিদ্, তাসাউফপন্থী এবং দার্শনিক—এই শ্রেণী চতুষ্টয় মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌র পন্থা

---

৪. (১) ইবদা—সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। (২) খলক—সৃষ্টি। (৩) তদবীর—শৃংখলা ও পরিচালন। (৪) তদল্লী—ঘনিষ্ঠ।

ছিল ব্যাপকতর এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই পুস্তকের এক কপি রিয়াসাতে বাহওয়ালপুর আহমদপুর শারকিয়ার মওলভী আহমদ সাহেবের পুত্র মওলভী আবদুল আযীয সাহেবের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। আমার নিকটও মক্কা শরীফে এর একখানা নকল পাঠানো হয়েছিল। আমার অন্যান্য পুস্তকের সাথে সেখানিও পুনঃ দেশে আনা হয়েছিল কিনা, জানি না।

২৪. শায়খ খালেদ কুর্‌দী

হযরত শায়খ গোলাম আলী (ওরফে আবদুল্লাহ) মুজাদ্দিদী মুযহেরী ছিলেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। দিল্লীস্থ খানকায়ে মুজাদ্দিদিয়া তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। শাহ আবদুল গনী মুহাদ্দিস দেহলবীর মতে তাঁর দ্বারা যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করেছে পূর্ববর্তী অন্য কোন মশায়েখ দ্বারা ততখানি হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাঁর যে খলীফা ছিল না, উপমহাদেশে এমন কোন শহর প্রায় ছিল না। শুধু এক আম্বালাতেই তাঁর পঞ্চাশজন খলীফা ছিলেন। খালেদ কুর্‌দী ছিলেন এই আধ্যাত্মিক পুরুষের খলীফা। আল্লামা শামী তাঁর সম্পর্কে একখানা পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, উহার নাম 'সালুল হিসামিল হিন্‌দী ফী নুসরাতি মওলানা খালেদ আল্‌-নক্‌শ্‌ বন্দী'। পুস্তকটি মিসরে ছাপা হয়েছিল। সে পুস্তিকায় তাঁর ১৪২৪ হিজরীতে ইরানের পথে দীর্ঘ এক বছর পরে দিল্লীতে পৌছা, শাহ গোলাম আলী সাহেবের দরবারে পৌছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করা, কুতুব-ই-ইরশাদের (সূফী পন্থার বিশিষ্ট স্তর) মর্যাদায় ভূষিত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং সাধারণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া প্রভৃতি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। খালেদ কুর্‌দী যে দিন সন্ধ্যায় দিল্লী পৌছলেন, সে দিন তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলাচ্ছলে পীরের প্রশংসাসূচক একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিলেন।

তাঁর প্রথম কবিতাটি এই ঃ

كملت مسافة كعبة الآمال

حمد لمن قد من بالاكمال

من نور الافاق بعد ظلامها
و هدىٰ جميع الخلق بعد ضلال
اعنى شيخ غلام على القدم الذى
من لحظة يحيى العظام البال

দূর–দূরান্ত অতিক্রম করে আমার লক্ষ্যের কাবায় পৌছেছি।

সেই আল্লাহ্‌রই প্রশংসা, যিনি আমাকে এই সফলতার অনুগ্রহে বাধিত করেছেন।

যিনি অন্ধকারের পরে সারা বিশ্বকে করেছেন আলোকিত।

এবং পথভ্রান্তির পরে যিনি পথের সন্ধান দিয়েছেন সারা সৃষ্টিকে।

তিনি হচ্ছেন মহান হাদী শেখ গোলাম আলী।

যিনি নিমেষে জীর্ণ অস্থিকে করেন সঞ্জীবিত।

শেখ মুহসেন তাঁর 'ইয়ানিউল জানি' গ্রন্থে এ কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন। শেখ মুরাদ আল্ কাজানী 'রাশহাত' নামক পুস্তকের শেষে লিখেছেনঃ 'শেখ গোলাম আলী ১১৮৫ হিজরীতে বাটালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশসূত্র হযরত আলীর সাথে মিলিত হয়েছে। দিল্লীতে তিনি মীরযা জানে জানাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং সুদীর্ঘ পনর বছর কাল ধরে তাঁর সান্নিধ্যের কল্যাণ আহরণ করেছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি এরূপ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, দূর–দূরান্তর থেকে তাঁর কাছে হেদায়েত গ্রহণের জন্য লোক এসে হাযির হতো। তাঁর কাছে দীক্ষা লাভ করে তাঁরা দেশের সর্বত্র এবং আরব আজমে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। শেখ খালেদ কুরদী পৈতৃক দিকে হযরত উসমান (রা.) এবং মায়ের দিকে উমুবী সৈয়দদের সংগে মিলিত। তিনি শায়খ গোলাম আলীর (ওরফে আবদুল্লাহ্) কাছে নক্শ্বন্দিয়া মুজাদ্দেদীয়া তরীকা গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি শাহ আবদুল আযীযের দরবারের সংস্রবেও এসেছিলেন। তিনি সমকালীন আলিমদের মুকুট ছিলেন।'

শায়খ খালেদ কুর্দীর পীর শেখ গোলাম আলী তাঁকে শাহ আযীযের দরবারে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। শাহ আবদুল আযীয তাঁকে তাঁর জ্ঞান বিতরণ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ১২৪২ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

শাহ আবদুল গনী মুহাদ্দিস দেহলভী শায়খ খালেদ কুর্দীর একটি ফারসী কাব্য নকল করেছেন। তাতে মোট উনষাটটি কবিতা রয়েছে। তার সূচনা এবং গর্ভ এই ঃ

خبر از من دهید ان شاه خوبان را به پنهاني
که عالم زنده شد بار دگر از ابرنیسانی
امام اولیا سیاح بیدای خدا بینی
ندیم کبریا سیاح دریای خدا دانی
مهین راهنمایان شمع جمع اولیای دین
دلیل پشیوایان قید اعیان روحانی
چراغ افرینش مهر برج دانش و بیش
کلید گنج حکمت محرم اسرار سجانی
امین قدس عبد الله شاه کز التفات ار
دهد سنگ سیاه خاصیت لعل بدخشانی

مقطع

زجام فیض خود کن خالد در مانده را سیراب
که او لب تشنه مستسقی و تو دریای احسانی

আমার পক্ষ থেকে মাশুকের শাহেন শাহকে গোপনে এই খবরটি জানিয়ে দাও যে, বোশেখের বর্ষাধারায় এই মৃত ধরণী আবার জীবিত হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ্ দর্শনের ময়দানে বিচরণকারী আউলিয়াদের ইমাম, মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য প্রাপ্ত, আল্লাহ্র তত্ত্ব রহস্যের সাগরে ভ্রমণকারী, পথ প্রদর্শকদের প্রধান, দীনের আউলিয়াগণের মশাল, পথপ্রদর্শকদের ইমাম, তত্ত্বদর্শকদের কেবলা, সৃষ্টির চেরাগ, জ্ঞান ও তত্ত্বাকাশের চাঁদ, হেকমতের ভান্ডারের চাবি, আল্লাহ্তত্ত্বের রহস্যজ্ঞানী, পবিত্রতার আমানতদার শাহ্ আবদুল্লাহ (শেখ গোলাম আলী) যাঁর করুণা–দৃষ্টি পলকে কৃষ্ণ পাথরও হয়ে উঠে সমুজ্জ্বল মণি।

উপসংহার ঃ

শ্রান্ত ক্লান্ত খালেদকে তোমার ফয়েযের পেয়ালা দ্বারা পরিতৃপ্তি কর; কেননা, পিপাসায় তার ওষ্ঠ বিশুষ্ক আর তুমি হচ্ছ অনুগ্রহের সাগর।

হযরত শাহ আবদুল গনী মুহাদ্দিস দেহলভী মুহাজিরে মদনী 'তায্কিরায়ে শাহ গোলাম আলী' নামক পুস্তিকায় লিখেছেন ঃ মওলানা খালেদ শাহরযোরী কুর্দী উপমহাদেশের আলিমদের মধ্যে মওলানা শাহ আবদুল আযীযের প্রশংসা করেছেন। আমি মক্কা মুয়ায্যমায় খালেদ কুর্দীর মুদ্রিত পত্রাবলী দেখেছি। তিনি বৎসরে দিল্লীতে একখানা চিঠি লিখতেন এবং হাজীদের মারফত প্রেরণ করতেন। পত্রে শাহ ইসমাঈল শহীদ সম্পর্কে এমনভাবে উল্লেখ করতেন, যেমন কেউ তার অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা স্মরণ করে থাকে। মওলানা ইসমাঈল শহীদের উন্নত শিক্ষা–দীক্ষার কথাও তিনি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করতেন। এই পত্রে 'হাযরাতে সালাসা' বা হুজুরত্রয় শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হাযরাতে সালাসা বা 'হুজুরত্রয়' বলতে দিল্লীতে ইমাম আবদুল আযীয এবং তাঁর দুই ভাই মওলানা রফীউদ্দীন এবং মওলানা আবদুল কাদিরকে বুঝাতো।

২৫. শায়খ মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহ্হাব

শায়খ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব ইবনে সুলেমান ১১১৫ হিজরীতে নজদ প্রদেশের আইনিয়া নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামানুযায়ী তাঁর অনুসরণকারীরা ওহ্হাবী নামে পরিচিত। শেখ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব যখন তাবলীগ শুরু করেন, তখন তিনি দারিয়ায় গিয়েছিলেন। তথাকার আমীর মুহম্মদ বিন সউদ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ ছিল ১১৫৯ হিজরীর ঘটনা। এই

ঘটনার পর ওহ্হাবী আন্দোলন খুব বিস্তৃতি লাভ করে এবং নজদ থেকে আম্মান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ১২০০ হিজরীতে হিজায এবং ইয়ামনে ওহ্হাবী মতাবলম্বীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম শওকানীর ছাত্র মুহম্মদ বিন্ নাসির হাযেনী লিখেছেন ঃ শায়খ মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহ্হাব বিদ্বান এবং মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি তাঁর স্বভাবগত আকর্ষণ ছিল। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলি সাধারণ এবং বিদগ্ধজনের নিকট সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর বহু মতামত গ্রহণযোগ্য। কতকগুলি মতামত অবশ্য ভুল প্রমাণ করা যায়। মুহম্মদ বিন্ শেখ আবদুল ওহ্হাবের দু'টি মত মেনে নেওয়ার মতো নয়। তার একটি হলো, তিনি কতকগুলি ভ্রান্ত কথার উপর সারা জাহানকে কাফির বলে গণ্য করেছেন। আল্লামা দাউদ বিন্ সুলাইমান মওলানার উপরোক্ত মতের যথার্থ প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর আর একটি বাড়াবাড়ি ছিল এই যে, তিনি দলীল–প্রমাণ ব্যতিরেকেই নির্দোষকে কতল করার অনুমতি দিতেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দোয়া চায় বা নবী, বাদশাহ কিংবা কোন আলিমের মধ্যস্থতায় দোয়া প্রার্থনা করে, সে মুশরিক; চাই সে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করুক অথবা তা অস্বীকার করুক, চাই সে এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করুক অথবা না করুক। তার পরিণতি এই দাঁড়িয়েছিল যে, পৃথিবীতে মুসলমান বলতে আর কেউ অবশিষ্ট থাকলো না। সবাই কাফির গণ্য হলো। ওলী–আউলিয়াদের মাধ্যমে দোয়া করাও তিনি কুফরী বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। এতে যারা সন্দেহ পোষণ করবে, তারাও তাঁদের মতে কাফির বলে গণ্য হবে। এ সব বিষয়ে যারা তাঁর সংগে একমত ছিল না, তাদের সংগে জিহাদ করা তিনি জরুরী মনে করতেন এবং সম্ভব হলে তাদেরকে কতল করা সংগত বলে জ্ঞান করতেন। তাদের ধনসম্পদ লুট করা বৈধ মনে করতেন। এভাবে তিনি সারা দুনিয়ার মুসলমানকে কুফরীর পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। সুতরাং বলা চলে যে, শায়খ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব নজদী শরীয়তের একটি দিক ভালোই জানতেন, কিন্তু তিনি উদার দৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন না। মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব এমন কোন ওস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন নি, যিনি তাঁকে সঠিক পথের

সন্ধান দিতে পারতেন। ফলে ধর্মকর্ম বিষয়ে যথার্থ ও উপযুক্ত জ্ঞান লাভের মতো বিদ্যা তিনি অর্জন করতে পারেন নি।

তিনি শুধু ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁর শিষ্য ইব্‌নে কাইয়্যিমের কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন এবং তাঁদেরই তকলীদ করেছিলেন। অথচ তাঁরা দু'জনেই তকলীদ বৈধ বলে স্বীকার করতেন না।

শেখ সৈয়দ মুহম্মদ আমীন যিনি ইবনে আবেদীন নামে খ্যাত, 'রাদ্দোল মুখ্‌তার' নামক কিতাবের ব্যাখ্যায় বিদ্রোহীদের প্রসংগে লিখেছেন ঃ আমাদের যুগে মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহ্‌হাব নজদীর অনুসরণকারীদের সাথে তাদের তুলনা দেওয়া যেতে পারে। তারা সম্প্রতি নজদ থেকে বের হয়েছে এবং উভয় হরম শরীফে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তারা নিজেদেরকে হাম্বলী মযহাব অবলম্বী বলে প্রচার করে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা নিজেদেরকে ব্যতীত পৃথিবীর অপর সকল মুসলমানকে কাফির জ্ঞান করে এবং তাদের রক্তপাত বৈধ মনে করে। সুতরাং তারা আহলে সুন্নাহ্ মতাবলম্বী সাধারণ মুসলমান এবং তাদের আলিমদেরকে হত্যা করতে ইতস্তত করে নি। ১২৩৩ হিজরীতে আল্লাহ্ তাদের শক্তি চূর্ণ করেছেন এবং মুসলমানদের সৈন্যবাহিনী জয়যুক্ত হয়েছে। ১২১৮ হিজরীর মহররম মাসের ৮ই তারিখে প্রকাশ্য দিনের আলোকে তারা পবিত্র হরম শরীফের উপর আক্রমণ করেছিল। শেখ মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহ্‌হাব এর পূর্বেই ১২০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছিলেন। শেখের পুত্র আবদুল্লাহ বিন্ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্‌হাবের সময় এই আক্রমণ হয়েছিল। (আবজাদুল উলুম ঃ ৮৭১ পৃঃ)

২৬. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলবী এবং মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্‌হাব নজদীর মত ও পথ

শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়ে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নীতি ছিল ঃ প্রথমত সকল সমস্যা কুরআন এবং হাদীসের আলোকে বিচার করে দেখা। মুজতাহিদ ফকীহ্‌গণের সিদ্ধান্ত এবং মতামত তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে যাচাই করতেন। ফকীহ্‌দের যে সমস্ত মত কুরআন ও হাদীসের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ

হতো তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং যেগুলি তার খেলাফ বা বিপরীত দেখতে পেতেন, সেগুলি অগ্রাহ্য করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর কাছে ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য ছিল না। তাঁর পৌত্র শাহ ইসমাঈল শহীদ সাহেবের নীতিও ছিল তাই। তিনি তাঁর পিতামহের নীতিই অনুসরণ করতেন আর লোকদের ধারণা নাই থাকুক আসলে তিনি ইসলামের কোন নতুন কথা আমদানী করেননি। শাহ ইসমাঈল শহীদের এই তরীকা হানাফী ফিক্হর বিপরীত ছিল না। শরীয়তের এই হলো রাজসড়ক, যে পথ প্রাচীন এবং তৎপরবর্তী মুসলমানগণ অনুসরণ করে এসেছেন। শাহ সাহেব বহু লুপ্ত সুন্নাহ্ (রীতি) পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বহু প্রকার শির্ক ও বিদআত উচ্ছেদ করেন। তিনি আল্লাহ্র পথে শাহাদত বরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শত্রুগণ অনর্থক তাঁর বিরুদ্ধে গোঁড়ামির অভিযোগ এনেছে এবং তাঁর ও তাঁর সাথী–সহচরদের সাথে অবাঞ্ছিত ব্যবহার করেছে। তাঁর নীতি আদর্শ শেখ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাবের মত ও পথের সাথে সম্পর্কিত বলে প্রচার করেছে এবং তাঁকে ওহাবী বলে আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি নজদও চিনতেন না এবং নজদীদেরও জানতেন না। তাঁর পরিবারের সকলেই হানাফী ফিক্হের অনুসারী এবং পবিত্র ধ্যান–ধারণার বাহক ছিলেন। (নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত হাত্তাহ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

মওলানা ইসমাঈল শহীদ তাঁর প্রণীত 'তাকভিয়াতুল ঈমানে' আল্লাহ্র সমীপে প্রার্থনার মাধ্যমে অবলম্বন এবং লঘু শির্ক প্রভৃতিকে কুফরী বলেন নাই, তবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধরূপে সাব্যস্ত করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্হাব লিখিত 'কিতাবুত্তাওহীদের' মতামত এ দুটো মৌলিক বিষয়ে সৈয়দ আহমদ শহীঁদের মতের বিপরীত।

'হে আল্লাহ্ আমাকে নাজাত দাও'–এভাবে প্রার্থনা করাকেই 'তাও হাস্সুন–ফীদ্ দোওয়া' বলা হয়। শায়খ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহ্হাব নজদী এ ধরনের প্রার্থনার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু মওলানা শাহ মুহম্মদ ইসমাঈলের মতে এরূপ প্রার্থনা অবৈধ নয়। 'তাকভিয়াতুল ঈমানে' তিনি এর ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু 'ইয়া শায়খ আবদুল কাদির শাইয়ান' (হে শায়খ আবদুল কাদির কিঞ্চিৎ দান কর বা করুণা কর)

এরূপ প্রার্থনা নিষিদ্ধি করেছেন, কেননা তাতে অন্য লোককে আল্লাহ্র স্থান দেওয়া হয়। এরীতি উভয়ের নিকটই বর্জনীয়। প্রার্থনায় মাধ্যম অবলম্বনের বিষয়ে দু'জনের মতামতের পার্থক্য এই। লঘু শির্ক সম্পর্কে আল্লাহ্র বানী এই ঃ

ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء

তরজমা ঃ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপন করাকে তিনি ক্ষমা করেন না, এ ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁদের দু'জনের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের প্রকাশ্য দাবি, শির্ক অক্ষমার্হ। শির্ক ব্যতীত অন্য যে-কোন গুরুতর গুনাহ, ক্ষমার যোগ্য। শির্ক শব্দ দু'টি অর্থ বহন করে। শির্ক আকবর বা গুরুতর শির্ক, শির্ক আসগর বা লঘু শির্ক। শির্ক আকবর বা গুরুতর শির্ক যে কুফরী, কোন মুসলমানেরই সে সমন্ধে মতবিরোধ নেই। নিঃসন্দেহে গুরুতর শির্ককারী ক্ষমার অযোগ্য এবং অনন্তকাল শাস্তি ভোগের অধিকারী। শির্ক আসগর অর্থাৎ লঘু শির্কও অপরাধ বটে এবং তজ্জন্য শাস্তিও ভোগ করতে হবে সত্য, কিন্তু তা ক্ষমার অযোগ্য নয়--আলিমদের ধারণা এই। কিন্তু মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহ্হাবের চোখে লঘু ও গুরু শির্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং লঘু শির্কের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে ইসলাম গ্রহণযোগ্য নয়। 'যারা ইয়া শায়খ' বা من احلف بغير الله فقد اشرك আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারুর নামে যারা হল্‌ফ করে, তাঁদের মতে তারা শির্ক করে। আলিম সম্প্রদায় এবং শেখ মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহ্হাবের মধ্যে মত-পার্থক্য এখানে সুস্পষ্ট। মওলানা ইসমাঈল শহীদ এ প্রশ্নের যে মীমাংসা করেন তা একটি নির্দেশরূপে জারি হয়। তিনি বলেন, লঘু শির্কের জন্য যে পরিমাণ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, তার ক্ষমা নেই- ভোগ করতেই হবে। লঘু শির্ক এবং কবীরা গুনাহ্ এক বস্তু নয়। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে, তবে কুফরীর জন্য যে অনন্তকাল শাস্তি নির্দিষ্ট তা ভোগ করতে হবে না। মুহম্মদ বিন্ আবদুল ওহ্হাব উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত শির্ক সম্পর্কে লঘু-গুরু তারতম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন। আমি নিজেও এর মধ্যে তারতম্যের পক্ষপাতী নই, বরং আয়াতের সাধারণ প্রয়োগই মেনে নিয়েছি এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাহাবী এবং

তাবেয়ীনদের যুগ থেকে অনুসৃত সর্বসম্মত নীতিই পালন করেছি। মওলানা ইসমাঈল শহীদ এ বিষয়ে অনন্য। অবশ্য শাহ্ ইসমাঈলের সম্পর্কে আলিমদের কোন ইংগিত নেই। আমি নজদের আলিমদের সাথে এ বিষয়ে বন্ধুভাবে আলোচনা করে দেখেছি। তাঁরা শুনে বিস্মিত হয়েছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করাও তাঁরা সমীচীন মনে করেন নি। কেননা, তাতে তাঁদের ইমাম প্রবর্তিত নীতির বুনিয়াদ উৎপাটিত হয়ে যায়। অপর দিকে, তাঁরা মওলানা ইসমাঈল শহীদের মতকেও অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাঁর মর্যাদাও তাঁদের কাছে ছিল দেখেছি। সুতরাং দুটো আন্দোলনকে এক করে দেখা যায় না। উপমহাদেশ থেকে আগত আহলে হাদীসদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত মক্কা মুয়ায্যমায় নজদীদেরকে বলতেন যে, ইসমাঈল শহীদ তাঁদেরই মতাবলম্বী। কিন্তু আমি তাঁদের উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাঁরা বিস্মিত হয়ে বলেছেন যে, উপমহাদেশীয় আহলে হাদীসগণ তাঁদের ইমামের কথাই বুঝতে পারে নি। আমি আরও বলেছি ঃ আশ্চর্য হবার কথা এই যে, মওলানা ইসমাঈল শহীদের সেই কিতাব সরল উর্দুতে লিখিত।

২৭. ইমাম শওকানী

মুহম্মদ বিন্ আলী বিন্ মুহম্মদ শওকানী ১১৭২ হিজরীর ২৮শে যিল্কদ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন জ্ঞান–বিজ্ঞান এবং তার শাখা–প্রশাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন। তিনি নিজেও বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তার সংখ্যা অন্যূন পঁয়ষট্টি হবে। সে সব গ্রন্থের মধ্যে 'নায়লুল আওতার' অতুলনীয়। এই গ্রন্থে তিনি প্রত্যেকটি সমস্যা বিশেষ সাবধানতার সংগে আলোচনা করেছেন, আলোচনায় কোথাও তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন নি। এই আলোচনায় তিনি প্রাচীনদের মতামতের গন্ডীতে আবদ্ধ থাকেন নি। ইমাম শওকানী বলতেন যে, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটিই সর্বোত্তম এবং রচনার উৎকর্ষ ও উচ্চমান সর্বত্র রক্ষিত আছে। তাঁর ছাত্রগণ এই গ্রন্থ তাঁর কাছে বার বার পড়েছেন । শিক্ষিতেরা এই গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। ইমাম শওকানী তাঁর ওস্তাদদের জীবিতাবস্থায়ই এ গ্রন্থ

প্রণয়ন করেছিলেন। সুতরাং তাতে যে সমস্ত ত্রুটি–বিচ্যুতি ছিল তাঁর ওস্তাদগণ সেগুলি নিশ্চয়ই সংশোধন করে দিয়েছিলেন। শওকান একটি শহরের নাম। শওকানীর মৃত্যু হয়েছিল ১২৫০ হিজরীর জমাদিউস্‌সানী মাসে। (আবজাদুল উলূম ঃ ৮৭৭ পৃঃ)

আমি ইমাম মুহম্মদ বিন্ আলী শওকানীর ফিকহ্ ইমাম হোসাইন বিন্ মুহসেন ইয়ামনীর নিকট শিক্ষালাভ করি। তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন মুহম্মদ বিন্ নাসির হাজেমী এবং আহমদ বিন্ মহম্মদ বিন আলী শওকানীর নিকট। এঁরা দু'জনই ইমাম শওকানীর ছাত্র ছিলেন। আমি দীর্ঘকাল ধরে ইমাম শওকানীর গ্রন্থাবলী থেকে উপকৃত হয়েছি। আমার স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠা নেই যে, তাঁর গ্রন্থগুলি অধ্যয়নের ফলে গবেষণাকারীদের গবেষণা–পদ্ধতি অনুধাবন করা আমার পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি ইজতিহাদ সম্পর্কে আমি একমত হতে পারি নি। অবশ্য তিনি একজন মধ্যমপন্থী ধর্মীয় আলিম ছিলেন, এ আমি স্বীকার করি। তিনি মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইজতিহাদের ক্ষমতা রাখতেন। তিনি শাফেয়ী মতাবলম্বী এবং সুন্নাহ্‌র প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। তবে তিনি আহলে সুন্নাহ্ এবং 'আহলে জাহিরদের সাথে অনেক ষিষয়েই একমত ছিলেন না। সুতরাং যাঁরা ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ এবং তাঁর অনুসারীদের তরীকা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তাঁরা খুব ভাল করে জানেন যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তরীকার প্রধান এবং সুস্পষ্ট মৌল সূত্রগুলির মধ্যে এও একটি মৌল যে, কি নীতি, কি আনুষঙ্গিক বিষয়, এর কোনটাই ইমামিয়া শিয়া কিংবা যায়েদী মতাবলম্বীদের সাথে শাহ সাহেবের তরীকা এক নয়। দুটো বিষয়ে আরো স্পষ্ট করে তোলার জন্য আমি ইমাম শওকানী এবং ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে এক একটি করে দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

ইমাম শওকানী তাঁর 'ইরশাদুল্ ফহুল' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ইজমার প্রশ্নে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। প্রশ্ন এই যে, ইজমা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু ইজমা ঠিক হলো কিনা এ সম্পর্কে জানা কি প্রকারে সম্ভব ? তা'ছাড়া ইজমার বরাত দেওয়া সঙ্গত কিনা, তাও একটি প্রশ্ন। ইজমা শরীয়তে দলীল হিসাবে গণ্য হবার মর্যাদা রাখে কিনা ? সংখ্যাধিক্যের অবশ্য ধারণা যে, ইজমা শরীয়তে

প্রমাণসিদ্ধ। কিন্তু নিজাম, শিয়াদের ইমামিয়া সম্প্রদায় এবং খারেজীদের কোন কোন দল একে শরীয়তের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে নারাজ। আর বস্তুত ইজমা তখনই দলীল বলে স্বীকৃত হতে পারে, যখন তা আমাদের সম্মুখে সম্পন্ন হয়; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্মুখে তা না ঘটছে ততক্ষণ তা শরীয়তের প্রমাণ বলে কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? এর পরে ইমাম শওকানী ইজমা গ্রহণকারীদের পক্ষের দলীলগুলি বর্ণনা করেছেন এবং তার জওয়াব দিয়েছেন। আলোচনার উপসংহারে লিখেছেন ঃ 'সার কথা হচ্ছে এই যে, তুমি যদি বিষয়টি খুব ভেবেচিন্তে দেখ এবং প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা কর, তবে তা তোমার নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে ; শেষ পর্যন্ত তাতে তোমার কোন সন্দেহ থাকবে না। ধরে নাও, আমরা ইজমা গ্রহণকারীদের দলীলগুলি মেনেই নিলাম এবং ইজমা সম্ভব হওয়া এবং সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাও মেনে নিলাম ; কিন্তু তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, যে প্রশ্নটির উপর ইজমা হয়েছে, তা নিজেও সত্য। এবং শরীয়তের দিক থেকে তার অনুসরণ অপরিহার্য এবং জরুরী। যেমন বলা হয় যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই ন্যায়ের উপর রয়েছেন। তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, অন্য একজন মুজতাহিদকে তাঁর ইজতিহাদ অবশ্যই মেনে নিতে হবে। এ কথা ভালো করে তোমাদের বোধগম্য হলে প্রকৃত পথ কোন্‌টি তা তোমাদের বুঝতে সহজ হবে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা ইজমা সম্পর্কে যা লিখেছেন তা আমি এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছি যাতে করে আমার কথাটা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ইজমা সম্পর্কে মওলানা ইসমাঈল শহীদ তাঁর 'অসূলে ফিক্‌হ্' কিতাবে লিখেছেন, 'ইজমা দ্বারা শরীয়তের বিধান বিধিবদ্ধ হয়। এর কয়েকটি প্রকার আছে ঃ এক হলো বাসীত বা সরল, অর্থাৎ একটি বিষয়ের উপর সকলে একমত হওয়া ; দুই বা ততোধিক বিষয়ের উপর একমত হওয়াকে মুরাককাব বা যৌগিক বলা হয়। তবে এর শর্ত হলো এই যে, দুই বা ততোধিক বিষয়ের ইজমার ক্ষেত্রে একটি বিষয় সাধারণ হওয়া চাই। তারপর ইজমা হাকীকী বা প্রকৃত ইজমা। ইজমা হাকীকীতে সকলের সোচ্চার সমর্থন থাকবে। যদি কেউ মৌন থাকে তবু তার মৌনতা সম্মতির লক্ষণরূপে গৃহীত হওয়া চাই।

আর এক ধরনের ইজমার নাম হুক্মী ইজমা। এটি হাকীকী ইজমার বিপরীতার্থক। অন্য এক প্রকার ইজমার নাম কওভী বা দৃঢ় ইজমা। অতীতকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল মুসলমান যে বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত, সেটিই হলো দৃঢ় ইজমা। আর এক প্রকার ইজমার নাম মুতাওয়াস্সিত অর্থাৎ আহলে হক বা সত্যবাদীদের দ্বারা যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এরূপ ইজমা কেবল সাহাবাদের যুগেই সম্ভব ছিল। এ জাতীয় ইজমার তৃতীয় প্রকার হচ্ছে জয়ীফ বা দুর্বল ইজমা। সাহাবাদের পরবর্তী কালের ইজমাকে এ নাম দেওয়া হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে–ইজমায়ে হাকীকী ব্যতীত, কওভী (দৃঢ়) হউক বা মুতাওয়াস্সিত হউক–সবই অকাট্য প্রমাণ এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রে ওদের মূল্য 'মশহুর হাদীসের' ন্যায়। অন্যান্য ইজমা প্রমাণ হিসাবে অকাট্য এবং নিখুঁত নয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র গ্রন্থাবলী বিশেষ করে 'ইযালাতুল্ খিফা' পাঠ করা আবশ্যক, যদিও আমার মতে ইমাম শওকানী এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আরো বহু দৃষ্টান্ত আছে, এখানে আমি মাত্র একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট মনে করি এবং তা সঠিক পথ নির্ধারণের ব্যাপারে একটি মূলনীতি সদৃশ। তা হচ্ছে এই যে, ইজমায়ে মুতাওয়াসসিত বা সাহাবাদের দ্বারা যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র কাছে তা খাঁটি পথ বলে স্বীকৃত, কিন্তু ইমাম শওকানী তা শরীয়তের দলীল বলে মেনে নেন নি। (আত্ তাহমীদ ঃ পৃঃ ৬১)

ইজমা শরীয়তে দলীল বলে স্বীকৃত হওয়া নির্ভর করছে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর খিলাফতের উপর।

হযরত উসমান কর্তৃক সংগৃহীত সহীফা (কুরআন)–কে আমরা বর্তমান পরিভাষায় ইজমার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় পরিষদের ফয়সালা বলে ব্যবহার করতে পারি। আজ যাকে কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত বলে বলা হয়, সে যুগে তাকেই ইজমা বলা হতো। এ ধরনের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য বলে মেনে নেওয়া ব্যতীত কোন সিয়াসী আন্দোলন পৃথিবীতে সফল হতে পারে না। শিয়া সম্প্রদায় এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে নি। তবে আহলে সুন্নাহ সরাসরি ইজমার উপরই

নির্ভরশীল। মোট কথা, যারা একটু ভেবে দেখে, তাদের কাছে এ দুটো মতবাদের পার্থক্য গোপন থাকতে পারে না।।

২৮. ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী

ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানীর সংস্কার আন্দোলনের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে হলে সম্রাট জালালুদ্দীন মুহম্মদ আকবর সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় জানা আবশ্যক। শের শাহের হাতে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন ইরানের শাহ ইসমাঈল সফুভীর আশ্রয়ে গমন করেন। তৎপর ইরানের সংগে রীতিমত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয়ে তাদের সাহায্যে হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। হুমায়ুন শিয়া মতবাদ প্রচলন করতে এবং বৈরাম খাঁকে শিয়া রিজেন্ট হিসাবে দরবারে স্থান দিতে রাজী হয়েছিলেন। সম্রাট আকবর শিয়া প্রাধান্য বিলোপ করার জন্য জাতীয় সরকার গঠন করেন। তাঁর সংস্কারে কোন সুন্নী খলীফার প্রভাব ছিল না। কোন শিয়া বাদশাহ্ও নির্দেশ জারি করতে পারত না আকবরের সংস্কারের উপর। আকবরের ন্যায় সুবিচারক বাদশাহ উপমহাদেশে রাজত্ব করেন নাই। তাঁর রাজত্বে আইনের চোখে তাঁর পুত্র এবং সাধারণ লোক এক বরাবর ছিল। হেরেম শরীফে অবস্থানকালে আমি উলামা মশায়েখ এবং বাদশাহ্দের নাম নিয়ে তাঁদের রূহের জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করতাম। কিন্তু তাতে সম্রাট আকবরের নাম কখনো নিতাম না। একদিন স্বপ্নে দেখলাম একটি প্রশস্ত উঁচু মঞ্চ। তার রং শ্বেত মর্মর সদৃশ শুভ্র। আকবর তার উপর দাঁড়িয়ে। সম্মুখে একটি কাষ্ঠখন্ডে একটা লোক ঝুলছে এবং আমি সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখছি। এ স্বপ্নের তাৎপর্য আমার কাছে এই মনে হলো যে, উপমহাদেশে একমাত্র আকবরই ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ শাসক, যিনি ন্যায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়কে সমান সুযোগ দিয়েছিলেন, যাতে তারা উভয়ই সমভাবে সুফল ভোগ করতে পারে। এটা কোন নীতি হতে পারে না যে, মুসলমান শুধু মুসলমান হওয়ার জন্যই ন্যায়বিচার লাভ করবে এবং হিন্দু হিন্দু হওয়ার কারণে তা থেকে বঞ্চিত হবে।

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই হলো আল্লাহ্র দীনের দাবি; এর মধ্যে কোন জাতিভেদ নেই। ন্যায়ের এ উচ্চ মঞ্চে আকবরই আরোহণ করেছিলেন। তাঁর সম্মুখে যে দন্ড দেখছিলাম, তা ন্যায়েরই দন্ড ছিল। জাঁহাগীর কেন স্বর্ণ শৃংখল পরেছিলেন? তাঁকে অবশ্যই বিলাসপরায়ণ মনে করা হতো। তিনি আকবরের পুত্র ছিলেন। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর কর্তব্য।

মোটকথা, সম্রাট আকবর যখন জাতীয় সরকার গঠন করলেন, তখন বহির্বিশ্বের ইসলামী সরকারগুলির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। তদবস্থায় দু'টি মাত্র পথ খোলা ছিল। এক, বিভিন্ন ধর্মমতের উচ্ছেদ সাধন করে ধর্ম-নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা--ইউরোপে যার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে; কিন্তু আকবর সেই পথের ধার দিয়েও গেলেন না। দ্বিতীয় পথ ছিল, প্রত্যেকটি ধর্মমত স্বীকার করে নিয়ে সেগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া। হিন্দু-মুসলিম সবাই অবশ্য রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। অন্য কথায় সরকারের প্রতি বিরুদ্ধতা না হওয়া পর্যন্ত ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান। রাষ্ট্রীয় নীতি ছিল দ্বিতীয়টি। ইংরেজ যা অনুসরণ করছে এবং এ ব্যাপারে নিজদেরকে ওস্তাদ বলে প্রচার করছে।

এদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বসবাস করছে। এ অবস্থাধীনে সপরিষদ বাদশাহ কি নীতি গ্রহণ করতে পারেন? এজন্যই আকবর দ্বীন-ই-ইলাহীর ধুয়া তুলেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, বাদশাহ এবং তাঁর মন্ত্রণা-পরিষদ কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতী হবেন না। তবে তাঁরা ধর্মের গন্ডী থেকে একেবারে মুক্তও হয়ে যাবেন না। কেননা তাতে তাঁরা অধর্ম প্রশ্রয়ও পেতে পারে। অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্র ধর্মের অধীন বলে স্বীকার করবেন। হিন্দুর কাছে আল্লাহ্র ধর্মের ব্যাখ্যা এক প্রকার, মুসলিমের কাছে তা আবার অন্য প্রকার। অপরপক্ষে, একজন শিয়ার কাছে তার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সরকারের এসব পরস্পর-বিরোধী মতের জালে জড়িয়ে পড়া চলবে না। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বাদশাহ এবং তাঁর মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যগণ যাঁর যাঁর ধর্মের প্রতি অনুগত থাকবেন। এই সাম্যকেই দ্বীন-ই-ইলাহী নাম দেওয়া হয়েছিল। এত বড়

বিরাট উপমহাদেশের জন্য এর চেয়ে উত্তম অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা সম্ভবপর ছিল না।

আমাদের মতে সম্রাট আকবর যা শুরু করেছিলেন মৌলিক নীতির দিক থেকে তা ঠিকই ছিল। কিন্তু তার বাস্তব কার্যায়নের জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, তেমন যোগ্যতার অধিকারী লোকের অভাব ছিল। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দ্বারা আমাদের মতে, সে অভাব পূরণ হয়েছিল। আকবর যা শুরু করেছিলেন, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ তার চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ ইসলামকে মানবতার ধর্ম বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অতপর বিভিন্ন ধর্ম বিশ্লেষণ করে পারস্পরিক ঐক্য–সূত্রটি প্রদর্শন করেছেন।

শাহ সাহেবের নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করলে হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে যে কোন শাসক উপমহাদেশ শাসনে কৃতকার্যতা প্রদর্শন করতে পারে। বৈদেশিক আদর্শ গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই।

শাহ সাহেবের রাষ্ট্র–বিজ্ঞান আয়ত্ত করার পর কেউ যদি ইসলামী রাষ্ট্রগুলি পরিদর্শন করে, তবে তার মনে এ ধারণা সৃষ্টি হবে যে, তারা অবশ্য তাদের দেশে ফিকহ্–ভিত্তিক শাসন চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু দেশে যদি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সন্নিবেশ হয়, অথবা তাদেরকে স্থান দিতে বাধ্য হতে হয়, তা হলে ধর্ম–নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছাড়া গত্যন্তর নেই। তুরস্কের অবস্থা দেখ। তারপর আরব এবং আফগানিস্তানে গিয়ে দেখ, তারা কিভাবে তুরস্কের অনুকরণ করছে। মুসলিম দেশগুলির বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই যে, সেগুলিতে হয় আকবরের দ্বীন–ই–ইলাহী বিদ্যমান অথবা ধর্ম–নিরপেক্ষতা। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র রাষ্ট্রীয় দর্শন মেনে নিলে ইসলামী রাষ্ট্রগুলি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতো না।

আকবরের মন্ত্রণা–পরিষদ যে ভুল করেছিল এবং যেভাবে তারা ইসলামের গন্ডী থেকে বের হয়ে গিয়েছিল, তার সংস্কারের কাজে প্রথমে হাত দিয়েছিলেন মুজাদ্দিদে আলফে সানী এবং তাঁকে মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করা হয়েছিল। তবে মুজাদ্দিদ সাহেব সবেমাত্র কাজ শুরু করেছিলেন, তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন সম্রাট মুহম্মদ শাহের আমলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস। শাহ সাহেবের যখন কাজ করার সুযোগ এসেছিল, তখন প্রকৃত অর্থে মুসলমানদের

হাত থেকে দিল্লীর বাদশাহী চলে গিয়েছিল। এ কারণেই তাঁর আদর্শ তখন বেশী প্রসার লাভ করতে পারে নি।

মোট কথা, আকবরের শাহী দরবারের কোন কোন সদস্য যে ভুলের অনুসরণ করেছিল, মুজাদ্দিদ সাহেব তার সংস্কারের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্ তাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুজাদ্দিদ সাহেবকে তার আদর্শের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি 'আরহাস' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। আমি একবার শায়খুল হিন্দ্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, শাহ সাহেব মুজাদ্দিদ সাহেবকে 'আরহাস' বলে কেন? শায়খুল হিন্দ্ বললেন, 'আরহাস' একটি অতি বড় কথা। হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্ব-মাহাত্ম্য বোঝাবার জন্য এ শব্দটিই উপযুক্ত। 'আরহাস' অর্থ প্রাচীরের প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা। মুজাদ্দিদ সাহেব সম্পর্কে শাহ সাহেব কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দটি রীতিসম্মত নয় বলে আমার যাহা মনে হয়েছিল শায়খুল্ হিন্দ্ তা নিরসনের জন্যই এ কথা বলেছিলেন।

হযরত শাহ সাহেব মক্‌তুবাতে লিখেছেন ঃ প্রতি এক হাজার বছর গত হওয়ার পরে মুসলিম জাহানে নয়া জামানার আবির্ভাব হবে। এ যুগে আধ্যাত্মিক বিকাশ কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যরূপে হয়েছে। মোট কথা, মুজাদ্দিদ সাহেবই হচ্ছেন এ যুগের অগ্রপথিক বা নিশানবরদার। তিনি এ যুগের বহু রহস্যের প্রতি ইংগিত-ইশারা করে গিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন এ যুগের কুতুবে ইরশাদ (আধ্যাত্মিক সূফিগণের একটি বিশিষ্ট মর্যাদা)। তাঁর পবিত্র নামের কল্যাণে এ জমানার বহু গোমরাহী এবং বিদআত দূরীভূত হয়েছে। এ যুগের দ্বার উন্মোচনকারীরূপে শেখ মুজাদ্দিদ অনেক রহস্যের প্রতি ইংগিত করেছেন। তার অনেকগুলি আমা দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে।

মোট কথা, ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আল্‌ফে সানী শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্য ছিলেন ধ্রুবতারা বিশেষ এবং সেই আলোকেই আমি তাঁর নিম্নোক্ত উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করেছি। তিনি বলেনঃ আমাকে এক বিরাট কর্মক্ষেত্র সোপর্দ করা হয়েছে। আমাকে পীর-মুরিদীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়

নাই। আমাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধু সৃষ্টির পূর্ণতা সাধনই নয় বরং আরও কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। (৬ষ্ঠ মকতুব ঃ ২য় খন্ড) অবশ্য কল্পনাপ্রবণ ব্যাখ্যাকাররা তাঁর এসব উক্তির খুব সাধারণ অর্থ করেন।

ফিক্‌রে হরকস্‌ বকদ্‌রে হিম্মতে উস্‌ত্‌

যে যেমন স্তরের লোক, চিন্তাও তার তেমনি হয়ে থাকে।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম রব্বানী এ যুগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাফ্‌হীমাতে ইলাহিয়ায় বলা হয়েছে যে, ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্‌ ছিলেন এ জমানার কাইয়্যিম বা প্রতিষ্ঠাতা।

তাফ্‌হীমাতে ইলাহিয়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ আমার পূর্বে যে সব বুযুর্গ অতীত হয়েছেন, তাঁরা 'ওয়াহ্‌দাতুল্‌ ওয়াজুদ্‌' (অস্তিত্বের অনন্যতা)–এর তত্ত্বে বহুদূরে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁরা একমাত্র সত্তার উপলব্ধিতে পৌছেছিলেন। তারপর উচ্চ মার্গে পৌছে সর্বভূতে আল্লাহ্‌ দেখেছেন তাঁরা। স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য ও মিলনের রহস্য তাঁরা জানেন। শেখ মুজাদ্দিদ সেই মহালোকের জ্ঞান–সমুদ্রের তীরে বিচরণ করেছিলেন। তাই কখনো তিনি বলেছেন যে, সৃষ্টির সত্তা বিরাজমান, আবার কখনো তিনি বলেছেন, সৃষ্টি কল্পনামাত্র। আবার কখনো বলেছেন যে, সৃষ্টি সত্তার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব। এ সবের তিনি কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। তারপরে জমানার কাইয়্যিম বা প্রতিষ্ঠাতা এলেন এবং এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন। (পৃঃ ১০১–১০২)

ইমাম রব্বানীর কোন কোন উক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ তার ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে তার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম রব্বানীর কোন কোন উক্তির এ দেশে এবং আরবে খুব প্রতিবাদ হয়েছিল। তিনি উক্তি করেছিলেন যে, হযরত রসূলে করীম (স.) আমার মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করেছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এখানে দুর্বোধ্যতা, অভিব্যক্তির অস্পষ্টতা এবং সঠিক শব্দের প্রয়োগের অভাব ঘটেছে, নতুবা মর্মের দিক থেকে এতে কোন অসুবিধা নেই এবং এতে মতভেদের অবকাশও নেই। যেমন সুলতান মাহমুদ গজনী উপমহাদেশ জয় করেছিলেন এবং এখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও রাজ্যগুলির কর্তৃত্ব

এবং বিভিন্ন জাতির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করার মূল ক্ষমতা রসূলুল্লাহ্র ব্যৈক্তিক ক্ষমতারই অন্তর্গত, তবুও উপমহাদেশে অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুলতান মাহমুদই হচ্ছেন তাঁর মাধ্যম। এ ভাবেই রসূলুল্লাহ্র কোন কোন কামালিয়ত বিকাশের মাধ্যম হয়েছিলেন মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানী। শাহ সাহেব বলেন যে, মুজাদ্দিদ সাহেবের উক্তিতে শুধু ভাষার অস্পষ্টতা রয়েছে। (মকতুবাত ঃ ৯০৮ পৃঃ)

২৯. সৈয়দ আহ্মদ শহীদের শিক্ষাদীক্ষা

ইমাম আবদুল আযীযের যে সমস্ত ঘনিষ্ঠ সহচরের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ কর্তৃক শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল এবং সুদীর্ঘ কাল ধরে ওয়ালীউল্লাহ্র আদর্শ যাঁরা প্রচার করে আসছিলেন, তাঁদের মধ্যে ইমাম আবদুল আযীযের তিন ভ্রাতা ছাড়া শাহ ইসমাঈল শহীদ, মওলানা মুহম্মদ ইসহাক এবং মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুবের নাম উল্লেখযোগ্য। আমীর-ই-শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলভী এঁদের শামিল ছিলেন না। তবে তাঁকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী, সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী এবং বংশের দিক থেকে সৈয়দ ছিলেন। এ সব বৈশিষ্ট্যের দরুন ইমাম আবদুল আযীয তাঁকে জিহাদের নেতৃত্বের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র আদর্শ থেকে তিনি যাতে বিচ্যুত না হন, তজ্জন্য দর্শনে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত দু'জন পরামর্শদাতাও তাঁর সাথে দেওয়া হয় এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে নির্বাচন করেছিলেন শাহ মুহম্মদ ইসহাককে।

সৈয়দ আহমদ শহীদের লেখাপড়া সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর সামনে পুস্তক খুলে ধরলে তাঁর চোখ অন্ধকার হয়ে আসতো। অর্থাৎ কুরআন এবং সুন্নাহ্র অতিরিক্ত কোন কিছু অধ্যয়ন করা থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা হয়েছিল। এ কথার প্রকৃত মর্ম এই যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র তরীকার যাঁরা 'কাশ্‌ফ্' বা আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন, তাঁদের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহ্র অতিরিক্ত কোন শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না । আমাদের মতে একজন আমীরের জন্য দীনী শিক্ষার যতটুকু প্রয়োজন, সৈয়দ সাহেব তা অর্জন

করেছিলেন। তাঁকে উম্মী বা নিরক্ষর প্রমাণ করার যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তা ঠিক নয়। তাছাড়া এও সম্পূর্ণ ভুল যে, শাহ ইসহাক সাহেবের ইংগিতক্রমে মওলানা আবদুল হাই সৈয়দ সাহেবের সাহচর্যে গিয়েছিলেন এবং বাইয়াত হয়েছিলেন। তারপর মওলানা আবদুল হাই সাহেবের কথায় মওলানা ইসমাঈল শহীদও তাঁর কাছে বাইয়াত হয়েছিলেন।

আসল কথা এই যে, অধ্যয়নকে সৈয়দ সাহেব বোঝাস্বরূপ জ্ঞান করতেন। 'কাশ্‌ফ্‌' যাঁদের স্বভাবের সাথে মিলে গেছে তাঁদের কাছে অধ্যয়ন বোঝা মনে হয়ে থাকে। এজন্যই তাঁকে শুনে শুনে শিখবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও তা নিয়মানুগত পদ্ধতি অনুযায়ী ছিল না। সিন্ধুতে আমার কোন কোন ওস্তাদের বেলায় আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাঁরা আরবী-ফারসীর প্রাথমিক পুস্তকগুলিই মাত্র পাঠ করেছিলেন। কুরআন শরীফের তরজমা এবং হাদীস শরীফ তাঁরা আলিমদের মুখে শুনে শুনে লিখতেন, তাঁরা যাঁদের কাছে শুনতেন, তাঁরা আমার ওস্তাদদের চেয়ে ঢের বেশি শিক্ষাদীক্ষার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু যখনই কোন শরীয়তের প্রশ্নে কাশ্‌ফের সাহায্যে হযরত রসূলে করীম (সা.) থেকে মীমাংসা পেয়ে যেতেন, তখন তাঁদের অনুসরণকারীদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হতো, তার দশ ভাগের এক ভাগও সে সমস্ত আলিমের দ্বারা হতো না-যাঁদের কাছে তাঁরা শিক্ষা লাভ করেছিলেন। যাই হোক, আমরা সৈয়দ সাহেবকে একজন শিক্ষিত লোক বলেই মনে করি। তাঁর জীবনী লেখকগণ তাঁকে মূর্খ বলে অভিহিত করে তাঁর চরিত্রকে বিকৃত করেছেন। কাশ্‌ফের বলেই সব কিছু তিনি অর্জন করেছিলেন।

যাঁরা এ কথা বলতে চান, তাঁদের আসল মতলব হলো এ কথাই বুঝানো যে, শাহ্‌ আবদুল আযীযের সাথে তাঁর শাগরিদীর সম্পর্ক ছিল না। তাঁকে কতকটা ইমাম মাহদীর রূপে চিত্রিত করাও তাঁদের অন্য একটি উদ্দেশ্য। তাঁদের এ ধারণা আন্দোলনের অনেক ক্ষতি করেছে।

শাহ্‌ ইল্‌মুল্লাহ্‌র কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর পুত্র ছিলেন সৈয়দ মুহম্মদ জিয়া এবং তাঁর পুত্র শাহ আবূ সাঈদ। ইনি ছিলেন আমীর-ই-শহীদ

সৈয়দ আহমদের মাতামহ এবং ইমাম ওয়ালীউল্লাহ্র খলীফা। সীরাতে আহমদীর ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ এই বংশের প্রধান আলিমদের মধ্যে অনেকেই শাহ ওয়ালীউল্লাহ এবং তাঁর পুত্রদের কাছে শরীয়ত এবং তাসাউফ শিক্ষা করেছিলেন। শাহ্ আবূ সাঈদ, শাহ মুহম্মদ ওজীহ, সৈয়দ মুহম্মদ মুঈন এবং আমীর-ই-শহীদের চাচা সৈয়দ মুহম্মদ লুকমান শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র কাছে এবং বড় ভাই সৈয়দ কুতুবুল হুদা, সৈয়দ মুহম্মদ ইসহাক শাহ আবদুল আযীযের কাছে এবং শাহ আবদুল কাদিরের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। এভাবে এই খান্দানে মুজাদ্দিদে সরহিন্দী এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভীর শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব ও কল্যাণ সঞ্চিত হয়েছিল। আধ্যাত্মিক তরীকার স্বতন্ত্র উৎস ছিল এই খান্দান। চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্য এ খান্দানের বৈশিষ্ট্য ছিল। আমীর-ই-শহীদের খান্দানে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর খলীফা শেখ আদম বনুরী থেকে পুরুষাণুক্রমে এই বৈশিষ্ট্যের ধারা চলে এসেছিল। এই ছিল কারণ, যে জন্য শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র আদর্শে আমীর-ই-শহীদের সর্বতোভাবে অনুরঞ্জিত হওয়াটা কিছু গৌণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যখন সুযোগ দেখা দিয়েছিল, তখন তিনি 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

পূর্ব এবং পশ্চিম উপমহাদেশের মধ্যে রেষারেষির ভাব বহু প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান। চন্দ্র বংশ-সূর্যবংশ পূর্ব-পশ্চিমের সেই রেষারেষির অপর নাম। আমাদের ধারণা, উপমহাদেশে ইসলাম আসার পরেও সে রেষারেষি বহাল ছিল। আমীর-ই-শহীদের সময়ও সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। আমীর-ই-শহীদ পূর্বাঞ্চলের রায় বেরেলীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের মুরীদ মহলও সাধারণত বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের ছিল। তাঁর তুলনায় দিল্লী ছিল পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দিল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁদের আন্দোলনকে নিজেদের ধারণা করতেন। মওলানা বেলায়েত আলী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে একটি আন্দোলন দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি মওলানা ইসহাক এবং ওয়ালীউল্লাহ-পন্থীদেরকে এ ময়দান থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন।

৩০. সমাজ ব্যবস্থার স্তর বিন্যাস

ব্যক্তি-মানস তার স্বাভাবিক প্রয়োজন এবং জৈব দাবি কখনো পূরণ করতে পারে না। যে মানবসমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক দাবি মিটাবার মতো উপকরণ বিদ্যমান থাকে, তাকে সমাজ বলা হয়। এ হচ্ছে মানব সভ্যতার প্রথম ধাপ। সমাজকে বহাল রাখার জন্যই সমাজের জনসমষ্টি সরকার গঠন করে। সরকার গঠিত হয়ে যাওয়ার পর বিপ্লবের উপস্থিতি সমাজের কোন অনিষ্ট করে না ; সুতরাং সরকার প্রতিষ্ঠা মানব সভ্যতার দ্বিতীয় ধাপ। সমাজ এবং সরকার-এ দুটোর বিদ্যমানতাই হচ্ছে সমাজের পূর্ণরূপ। যেখানে শুধু সমাজ আছে, সুষ্ঠু সরকার নেই, সেটা অসম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা। আজকালকার পরিভাষায় তাকে সোসাইটি বলা হয়। নৈরাজ্যবাদীরা সমাজ পর্যন্ত মানে। তারা এই স্তরকেই সামাজিক সভ্যতার চরম পরিণতি জ্ঞান করে। তাদের মতে সোসাইটি নিজেই নিজের সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনে সক্ষম। সরকারহীন জনসমষ্টি ও উল্লিখিত সমাজ ব্যবস্থাই সরকারের স্থান পূরণ করে থাকে। বড়ো পরিবারে যেমন সম্মিলিত ব্যবস্থাই শৃংখলা বজায় রাখে, তেমনি জনবহুল বড় গ্রামে নম্বরদার, চৌধুরী প্রভৃতি থাকে। সেখানে ছোট একটি সরকারের স্থলে তারা পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা কাজ চালিয়ে নেয়। প্রাচীন রাজপুত এবং আফগানদের মধ্যে প্রচলিত জির্গা এ ধরনের ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত।

বিরাট শহর এবং নগরগুলিতে সরকার ব্যতীত কাজ চালানো অসম্ভব। এ সমস্ত স্থানের প্রধান ব্যক্তিরা একটি বৈঠকে মিলিত হন এবং তাঁদের সম্মেলনের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান বা গৃহের ব্যবস্থা করা হয়। আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর সেখানে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকেই তা প্রচারিত হয়। এটাই হচ্ছে আজকের দিনের পার্লামেন্ট। আমাদের ভাষায় এদেরকে বলা হয় 'আহ্লে হল্ ওয়াল্ আকদ' বা মতামত বিনিময় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত প্রতিনিধি। পরবর্তী যুগের বাদশাহ্গণ এই আহলে হল্ ও আক্দকে ধ্বংস করে নিজেদের ব্যক্তিত্বকে উঁচু করে ধরেছিলেন। ফলে নিজেরাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন। বাদশাহ্দের মধ্যে যাঁরা উত্তম স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, বাদশাহী পরিচালনার যোগ্যতা যাঁদের ছিল, তাঁরা হল্ এবং

আকদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন। আমাদের ধারণায় ইউরোপ পার্লামেন্ট তৈয়ার করে নতুন কোন কিছু আবিষ্কার করেনি। এসব পদ্ধতিরই একটি সুগঠিত রূপ তা। আমাদের এখানে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব। দুজন সমশ্রেণীর লোক মিলে রাষ্ট্র চালায়, যেমন দুজন ভ্রমণকারী পরামর্শ করে সাময়িকভাবে একজনকে নেতা মেনে নেয়। এবং ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ চালায়। বড় বড় দেশের বেলায়ও এই একই দৃষ্টান্ত কার্যকরী হতে দেখা যায়। স্বাভাবিক প্রেরণার তাকিদে এ কাজ করা হয়। তেমনি এরূপ মজলিস সাময়িক নেতা নির্বাচন করে নেয় এবং মিলেমিশে কাজ চালায়। বড় বড় শহর ও বড় বড় দেশে এর নজীর পাওয়া যায়। অনেক সময় তারা একটি পরিচালনা বোর্ডের ন্যায়ও কাজ করে, কেননা সেখানে কোন ছোট–বড়র প্রভেদ থাকে না।

৩১. শিখ

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে শিখরা পাঞ্জাবে খুব উৎপাত শুরু করেছিল এবং দিল্লীতে বিশৃংখলা সৃষ্টির আয়োজন করেছিল। কিন্তু আহমদ শাহ আবদালী তখন নাজীবুদ্দওলাহ্‌র সাহায্য করেছিলেন। শিখেরা সারা দেশে একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে রেখেছিল। ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালী লাহোর এসেছিলেন। ফলে শিখেরা পালিয়ে পাহাড়–পর্বতে চলে গেল। আহমদ শাহ আবদালীর সাথে মুকাবিলার জন্য সরহিন্দে জাঠ সর্দার দুলাখ সৈন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। আহমদ শাহ আবদালী নব্বই ক্রোশ রাস্তা দু'দিনে অতিক্রম করে এসে জাঠদের আক্রমণ করলেন এবং পরাস্ত করলেন। এ যুদ্ধে বিশ হাজার শিখ সৈন্য নিহত হয়েছিন। তারপরে তিনি আর কখনো উপমহাদেশে আসেন নি। (তারীখ–ই–যাকাউল্লাহ্ ৯ ঃ ৩১৮)

শিখেরা যে কিরূপ সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, শাহ আবদুল আযীয কর্তৃক তাঁর চাচা শাহ আহলুল্লাহর কাছে প্রেরণের উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি কবিতায় তার সত্যিকার চিত্র ফুটে রয়েছে।

جزى الله عنا قوم سكه و مرهته

عقوبته شر عاجلا غير اجل

و قد قتلوا جمعا كثيرا من الورىٰ
و قد او جمعوآ فى اهل شاء و جال
لهم كل علم نهبة فى بلادنا
يخوضون فينا بالضحى و الاصائل
فهل ههنا من معاذ لعائذ
و هل من مغيث ينتى الله عادل

আল্লাহ্ শিখ ও মারাঠাদের প্রতিশোধ নিন
তাদের ঘৃণ্য উপদ্রব নিকটে–দূরে নয়।।
তারা আমাদের অনেককে হত্যা করে ফেলেছে
*　　　　　*　　　　　*
প্রতি বৎসরই আমাদের উপর তাদের আক্রমণ চলে,
দিবা–রাত্রি যে–কোন সময়ে আমাদের ভিতর তারা অনুপ্রবেশ করে।
আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ওখানে কোন আশ্রয় আছে কি ?
ওখানে কোন প্রতিকার এবং সুবিচারের উপায় আছে কি ?
অপর এক চিঠিতে লিখছেন ঃ

ايام برد اتت فالقلب مجذع
من قوم سكه و ان الخوف معقول
انفاهم الله من هذه الديار فهم
شر الاعادى و هم من جنة غول
فوضت امرى و امر الناس كلهم
الى الا له و ان الحفظ مامول

শীতকাল আগত প্রায়, তাই মন উৎকন্ঠিত
শিখদের ভয়ে এবং সে ভয় যথার্থ।
আল্লাহ্ তাদেরকে এ দেশ থেকে উচ্ছেদ করুন,
যেহেতু তারা নিকৃষ্টতর শত্রু আর তারা সন্ত্রাসের সমষ্টি
আমরা সবাই আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ করেছি
নিঃসন্দেহে আমাদের নিরাপত্তা তাঁর কাছে প্রত্যাশিত।

৩২. মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব দেহলবী

তিনি ছিলেন শাহ্ মুহম্মদ ইসহাক সাহেবের ভাই। তিনি ১২০০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ শাহ ইসহাক এবং শাহ মুহম্মদ ইয়াকুবের জন্ম হওয়া এবং তাদের হিজাযে হিজরত করার সংবাদ ভবিষ্যদ্বাণীতে জ্ঞাত হয়েছিলেন। শেখ মুহম্মদ আশেক তাঁর লিখিত কওলে জলীতে লিখেছেন ঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ বলেছেন যে, শাহ মুহম্মদ ইসহাক এবং ইয়াকুব আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের দান এবং তাঁরা উভয়ে পূত চরিত্র এবং নেককার বলে খ্যাত হবে। তাঁরা উভয়েই মায়ের দিক থেকে আমার সাথে সম্পর্কিত হবে। স্বভাবত মাতৃভূমির প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে এবং মাতৃভূমি পরিত্যাগ করা খুবই বেদনাদায়ক হয়ে পড়ে। তবে অবস্থার চাপে তাও মেনে নিতে হয়।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'কওলে জলী'র উপরোক্ত উক্তির আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপরোক্ত ইংগিতের লক্ষ্য শাহ মুহম্মদ ইসহাক এবং মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; কারণ তাঁরা উভয়েই দিল্লী থেকে হিজরত করে মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে বছরের পর বছর ধরে হাদীসের অধ্যাপনা করেছেন। আরব ও আজম তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা উপকৃত হয়েছে।

আমার মতে এহ্‌ইয়ায়ে উলুম (জ্ঞান বিস্তার) কেবল হাদীস বর্ণনা করাই নয়। তাঁরা উভয়ে শেষ পর্যন্ত আম্‌র বিল্ মা'রুফ ওয়া নাহিয়ি আনিল মুন্‌কার (সত্যের নির্দেশ এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ) অর্থাৎ জিহাদের আহ্বান এবং আল্লাহ্‌র

কালেমা ঘোষণা করেছিলেন। এই 'এহ্ইয়ায়ে উলুম' অর্থাৎ জ্ঞান বিস্তার কথার এই–ই হচ্ছে আসল তাৎপর্য। শেখ মুহম্মদ ইয়াকুব তাঁর নানা ইমাম আবদুল আযীয এবং তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ বিশেষ করে শাহ মুহম্মদ ইসহাক সাহেবের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শেখ মুযাফ্ফর হোসাইন কান্ধলবী, আমীর ইমদাদুল্লাহ্, শায়খুল ইসলাম মওলানা মুহম্মদ কাসেম প্রমুখ দেওবন্দের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা তাঁর কাছে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। শেখ মুহম্মদ ইয়াকুবের মৃত্যু হয়েছিল ১২৮২ হিজরী ২৮শে যিলকা'দাহ তারিখে এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১২৮৩ হিজরীর মুহররম মাসের ১৫ই তারিখে। তখন থেকে ওয়ালীউল্লাহ্পন্থীদের নামকরণ হয়েছিল দেওবন্দী জমাত বা দেওবন্দ পন্থী।–(আত্ তাহমীদ ঃ ২১৫ পৃঃ)

ইমাম আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর ওয়ালীউল্লাহ্পন্থীদের নেতৃত্ব ইমাম ইসহাকের হাতে সোপর্দ হয়েছিল। ১২৬২ হিজরীতে শাহ ইসহাকের মৃত্যু হলে মওলানা মুহমদ ইয়াকুব দেহলবী তাঁর স্থলবর্তী হয়েছিলেন।

শাহ আবদুল আযীযের বরাতে বলা হয় যে, তিনি বলতেন ঃ আল্হামদু – লিল্লাহ্ হিল্লাযী ওয়াহাবা লী আলাল্ কিবারী ইসমাঈল ও ইসহাক। (কুরআন) অর্থাৎ সেই আল্লাহ্র সব প্রশংসা যিনি বার্ধক্যে আমাকে ইসমাঈল এবং ইসহাককে দান করেছেন। (কুরআনে হযরত ইব্রাহীমের উক্তি)

৩৩. মওলানা মাম্লূক আলী

মওলানা মাম্লূক আলীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন ছিলেন শেখ মুহম্মদ হাশেম। তাঁর বংশসূত্র কাসেম বিন্ মুহম্মদ বিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর সাথে গিয়ে মিলেছে। সম্রাট শাহজাহান তাঁকে নানুতে জায়গীর দিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানেই বাসস্থান নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁদের বংশে বড় বড় আলিম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্র মতবাদ প্রচারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তাঁদের মধ্যে যুগের বিশিষ্ট বিদ্বান মওলানা মামলূক আলী অন্যতম। তাঁর পিতা আহমদ, তাঁর পিতা আলী, তাঁর পিতা গোলাম শরফ, তাঁর পিতা

আবদুল্লাহ্, তাঁর পিতা ফাতাহ, তাঁর পিতা মুহম্মদ মুফতি, তাঁর পিতা আবদুস সামী, তাঁর পিতা শেখ মুহম্মদ হাশেম।

মওলানা মামলূক আলী ছিলেন শেখ রশীদুদ্দীনের শাগরিদ। তিনি আরবী, ফিক্হ এবং অন্যান্য বিদ্যায় সমকালীন আলিমদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। ওস্তাদ মওলানা রশীদুদ্দীনের পরে তিনি দিল্লী কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর শাগরিদদের মধ্যে মওলানা মুহম্মদ মুয্হার নানুতবী, শায়খুল ইসলাম মওলানা মুহম্মদ কাসেম নানুতবী, আবদুর রহমান পানিপথী, আহমদ আলী সাহারানপুরী, মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী, শেখ মুহম্মদ ইয়াকুব ইব্নে মামলূক আলী প্রমুখ ছিলেন। আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ আহমদ দেহলবী, কুরআন শরীফের অনুবাদক নযীর আহমদ, মওলবী যাকাউল্লাহ্ এবং অন্যান্য খ্যাতনামা পন্ডিত তাঁর শাগরিদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর লিখিত 'আস্রুস্ সানাদীদে' লিখেছেন ঃ 'মওলবী রশীদুদ্দীন খানের শাগরিদ মওলানা মামলূক আলী ব্যবহারিক, শ্রুতবিদ্যা এবং পাঠ্য তালিকাভুক্ত পুস্তকে অগাধ পান্ডিত্য এবং দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। জ্ঞানভান্ডার যদি কোন কারণে শূন্য হয়ে পড়ে, তবুও তাঁর স্মৃতিফলক থেকে তা পুনঃ উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

চৌদ্দ–পনর বছর ধরে তিনি শাহজাহানাবাদ মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেছেন, এখন তিনি প্রধান অধ্যাপক। ১২৬৭ হিজরীতে মওলানা মামলূক আলীর মৃত্যু হয়। তাঁকে দাফন করা হয় শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র গোরস্তানে। তাঁর সুযোগ্য সন্তান শেখ মুহম্মদ ইয়াকুব দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক হয়েছিলেন। আমার ওস্তাদ শায়খুল্ হিন্দ্ মাহমুদুল হাসান তাঁরই কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। (আত্ তাহমীদ)।

মওলানা মামলূক আলী সরকারী মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়ালীউল্লাহ্র আন্দোলন বৃটিশ রেসিডেন্টের বিষদৃষ্টি এড়িয়ে সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে চলতে পেরেছিল। অবশ্য মওলানা মামলূক আলীর কিছু সংখ্যক স্বাধীন সহকারীরও প্রয়োজন ছিল। আমীর ইমদাদুল্লাহ্ শাহ মুহম্মদ ইসহাকের মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র এবং তাঁর জামাতা মওলবী নাসীরুদ্দীনের

শাগরিদ ছিলেন। তিনি আলিমদের রংগে পুরোপুরি অনুরঞ্জিত ছিলেন না। আমীর-ই-শহীদের প্রকৃতির সাথে তাঁর প্রকৃতির অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। সুতরাং তিনি অনেকটা সৈয়দ শহীদেরই নমুনা ছিলেন। মওলানা মুহম্মদ কাসেম এবং মওলানা রশীদ আহমদ তাঁর সাথে এভাবে কাজ করতেন, ঠিক যেমন সৈয়দ আহমদ শহীদের সাথে মওলানা আবদুল হাই এবং মওলানা ইসমাঈল শহীদ।

৩৪. মওলানা কুতুবুদ্দীন দেহলবী

ইনি ছিলেন শাহ্ মুহম্মদ ইসহাকের খলীফা। তিনি 'মিশকাতের' ব্যাখ্যা লিখেছেন। এর দ্বারা লোকের বিশেষ উপকার হয়েছে। তাছাড়া তিনি আরও বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি শাহ্ মুহম্মদ ইসহাকের বিশিষ্ট সহচর ছিলেন। ১২৮৯ হিজরীতে তিনি মদীনা শরীফে ইন্তিকাল করেন।

৩৫. মওলানা মুযাফ্ফর হুসাইন কান্ধলবী

তিনি ছিলেন অত্যন্ত খোদাপোরস্ত সত্য পথের দিশারী এবং অন্যায়ের বিরোধী। তিনি নিজ চাচা মুফতী ইলাহী বখ্শ এবং মওলানা ইসহাকের কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি মওলানা মুহম্মদ ইয়াকুব দেহলবীর কাছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। মওলানা মুহম্মদ ইসহাক হিজাযে হিজরত করার পরে উপমহাদেশে তিনি তাঁর প্রতিনিধিরূপে কাজ করতেন। শায়খুল ইসলাম মওলানা মুহম্মদ কাসেমকে তিনিই বক্তৃতামঞ্চে তুলেছিলেন। ১২৮৩ হিজরীর ১০ই মুহর্‌রম তিনি ইন্তিকাল করেন এবং 'বাকী' গোরস্তানে দাফন করা হয়।

৩৬. দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা

ওয়ালীউল্লাহ্-আন্দোলনের প্রধান কর্মকর্তাগণের মধ্যে যাঁরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হিজাযে হিজরত করেন, তাঁরা দিল্লী মাদ্রাসার আদর্শে একটি দীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইমাম আবদুল আযীযের যুগে এবং সেখানে অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন

মওলানা আবদুল হাই, তারপরে রশীদুদ্দীন দেহলবী, তারপরে মওলানা মামলূক আলী দেহলবী। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের হাঙ্গামায় অর্থাৎ ১২৭৪ হিজরীতে এই মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়।

আমীর ইমদাদুল্লাহ, ইমাম আবদুল গনী দেহলবী এবং ওয়ালীউল্লাহ্–পন্থী বিশিষ্ট নেতারা হিজাযে এ আন্দোলনের শক্তিশালী কেন্দ্র গঠন করতে চেয়েছিলেন; এবং সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় এ আন্দোলন নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। উপমহাদেশে আমীর ইমদাদুল্লাহ্র প্রতিনিধি ছিলেন শাইখুল ইসলাম মওলানা মুহম্মদ কাসেম। হাজী ইমদাদুল্লাহ্ এক সময় বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন বান্দাকে এক এক জন লিসান (মুখপাত্র) দিয়ে সাহায্য করেন। শামস তাবরেজীর জন্য মওলানা রূমী ছিলেন মুখপাত্র। তেমনি মওলানা কাসেমকে আমার মুখপাত্ররূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমার মনে যা জাগরিত হয় মওলানা কাসেমের মুখ থেকে তা–ই প্রকাশ পায়।

মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী এক সময় হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি বলেছেন ঃ মওলানা মাহমুদুল হাসানকে কম মনে করো না। সে তার যুগের শেখ হবে। (তাহমীদ)

৩৭. মওলানা ইমদাদুল্লাহ্

তিনি তত্ত্বদর্শী, শরীয়ত–তরীকতে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন এবং আল্লাহ্র বাণী প্রচারে একজন মুজাহিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন ফারুকী বংশোদ্ভূত। ১২৩৩ হিজরীতে তিনি নানুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেখ মুহম্মদ কলন্দর, শেখ ইলাহী বখ্স্ কান্ধলবী এবং শেখ নাসীরুদ্দীন দেহলবীর কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন। বালাকোটে সৈয়দ আহমদ শাহাদতপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর জমাতভুক্ত সবাই মওলানা নাসীরুদ্দীন দেহলবীর কাছে বাইয়াত হন। এই বাইয়াত গ্রহণকারী দলের মধ্যে হাজী ইমদাদুল্লাহ্ই ছিলেন সবার অগ্রণী। ১২৬১ হিজরীতে আমীর ইমদাদুল্লাহ মক্কা–মদীনায় হিজরত করেন। সেখানে তিনি মওলানা ইসহাক সাহেবের সাথে গিয়ে মিলিত হন এবং তাঁর কাছ থেকে

আন্দোলন ও তরীকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১২৬২ হিজরীতে তিনি উপমহাদেশে ফিরে আসেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ্র আসল নাম ছিল ইমদাদ হোসাইন। মওলানা ইসহাকই তাঁর উপরোক্ত নামকরণ করেছিলেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ্ জনসাধারণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছিলেন। অসংখ্য গুণী–জ্ঞানী তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে মওলানা মুহম্মদ কাসেম, রশীদ আহমদ, শেখ ফায়যুল হাসান সাহারানপুরী এবং উপমহাদেশের অন্যান্য খ্যাতনামা আলিম ছিলেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের হাঙ্গামায় যোগদানকারীদের তিনি আমীর ছিলেন। তারপর তিনি গোপনে মক্কা শরীফে হিজরত করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ্ দেওবন্দী জমাতের আমীর ছিলেন। ১৩১৭ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন।–(তাহমীদ)

৩৮. মওলানা মুহম্মদ কাসেম

আবূ হাশেম মুহম্মদ কাসেম ছিলেন আসাদ আলীর পুত্র। তিনি গোলাম শাহের, তিনি মুহম্মদ আলাউদ্দীনের, তিনি মুহম্মদ ফাতাহ্'র, তিনি মুহম্মদ মুফতীর, তিনি আবদুস সামীয়ের এবং তিনি ছিলেন মুহম্মদ হাশেমের পুত্র। তিনি ১২৪৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর চাচা মওলানা মামলূক আলী, মওলানা আবদুল গনী, মওলানা আহমদ আলী এবং হাজী ইমদাদুল্লাহ প্রমুখের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ১২৮৩ হিজরীতে তাঁর হাতে দেওবন্দ দারুল উলূমের (বিশ্ববিদ্যালয়) বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়। আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তারও নয় বছর পরে ১২৯২ হিজরী মুতাবেক ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ২৪শে মে। মওলানা কাসেম হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাহিদদের অন্যতম ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র মতবাদ তিনি সমকালীন উপমহাদেশীয়দের সম্মুখে যুগোপযোগী রূপ দিয়ে পেশ করেন। অসংখ্য জ্ঞান–পিপাসুর তিনি উৎস ছিলেন–তাঁদের মধ্যে আমার ওস্তাদ শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদুল হাসান একজন ছিলেন ; পরবর্তী কালে যিনি দেওবন্দ আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ের ইমাম এবং অগ্রনায়ক ছিলেন। মওলানা মুহম্মদ কাসেম সাহেবের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জাতির দরিদ্র জনসাধারণ–আমীর এবং বিশিষ্ট

শ্রেণী নয়। এ আন্দোলন একমাত্র আল্লাহ্র মদদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং দেওবন্দ আন্দোলন উচ্চ শ্রেণীর সংস্পর্শ থেকে যথাসম্ভব মুক্ত ছিল। মওলানা মুহম্মদ কাসেমের ইন্তিকাল হয় ১২৯৭ হিজরীতে। মওলানা ইসমাঈল শহীদের ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল তাঁর চরিত্রে।

৩৯. মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী

শায়খুল ইসলাম আবূ মাসঊদ রশীদ আহমদ গাংগুহী ছিলেন হিদায়েতুল্লাহ্ আনসারীর পুত্র। ১২৪৪ হিজরীতে তাঁর জন্ম হয় এবং মওলানা মামলূক আলী, মওলানা আবদুল গনী, মওলানা আহমদ সাঈদ এবং মওলানা ইমদাদুল্লাহ্র কাছে শিক্ষা এবং দীক্ষা লাভ করেন। আমি (লেখক) নিজেও মওলানা রশীদ আহমদের কাছে সুনানে আবূ দাউদ হাদীসের এক বৃহৎ অংশ পাঠ করেছি এবং তাঁর দ্বারা আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। মওলানা রশীদ আহমদ সাহেবের প্রভাব এড়ানো সম্ভব ছিল না । আমি তাঁর আদর্শ জীবনের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়ি যে, তা ত্যাগ করার ধারণাও মনে কখনো উদয় হয় নাই। তাঁরই কল্যাণে ফিক্‌হ এবং হাদীসে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র নীতি ও আদর্শ আমার হৃদয়ংগম হয়েছে। তাঁরই কল্যাণে ফিক্‌হ, তাসাউফ ও মারেফাত, আরবী ভাষা, কুরআন–হাদীস সম্পর্কিত জ্ঞান–গবেষণার বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মওলানা রশীদ আহমদকে আমি হানাফী ফিকহে এক সুদৃঢ় ইমাম এবং মুজতাহিদরূপে লাভ করেছি। তিনি তাঁর ওস্তাদ মওলানা আবদুল গনী সাহেবের চিন্তাধারার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন এবং সেই সাথে পর্বতের ন্যায় অটল ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্র মতবাদে তিনি শাহ ইসহাক সাহেবের প্রতিচ্ছবি ছিলেন। তাঁর রচিত 'বারাহীনে কাতেয়া'র সাহায্যে 'সুন্নাহ্' এবং 'বিদআতের' তাৎপর্য শিক্ষা করেছি। শাহ ইসমাঈল শহীদ প্রণীত 'ইজাহুল্ হক'–এর সাহায্যে তিনি উক্ত গ্রন্থ লিখেছিলেন। আমীর ইমদাদুল্লাহ এবং মওলানা মুহম্মদ কাসেম সাহেবের পরে তিনি দেওবন্দী জমাতের আমীর হয়েছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদের সংখ্যা তিন শতেরও অধিক। ১৩২৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

৪০. হিযবে সাদেকপুরী বা সাদেকপুরী জমাত

বালাকোটের ঘটনার পর অবশিষ্ট মুজাহিদগণ আমীর নাসীরুদ্দীন দেহ্লবীর হাতে বাইয়াত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মওলানা ইসহাকের জামাতা। পরে তাঁর জমাতের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। মুজাহিদরা আমীর-ই-শহীদের লাশ পান নি। এ ঘটনার উপর তাঁরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে বেশী সংখ্যক লোক আমীর শহীদের শাহাদতের ঘটনায় বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদল, তাঁরা অবশ্য সংখ্যায় অল্পই ছিলেন, সৈয়দ আহমদ যে শহীদ হয়েছেন এ কথা মেনে নিতে পারেন না। সুতরাং তাঁরা খুব জোরেশোরে এ কথা প্রচার শুরু করে দিলেন যে, আমীর জীবিত রয়েছেন, তিনি শহীদ হন নি। তিনি শিঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন। বালাকোটের ঘটনার পরে সৈয়দ আহমদ সাহেব সম্পর্কে এই দুই ধরনের মত সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের উপমহাদেশীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে এ সংবাদের প্রতিক্রিয়া হয়। মওলানা ইসহাক এবং তাঁর জমাত সৈয়দ আহমদ সাহেবের শাহাদতের সংবাদ সমর্থন করতেন। মওলানা বেলায়েত আলী সাদেকপুরী সাহেবের বিশ্বাস ছিল, সৈয়দ আহমদ সাহেব শহীদ হন নি ; বরং কোথাও অদৃশ্য হয়ে আছেন। মওলানা বেলায়েত আলী ছিলেন শাহ ইসমাঈল শহীদের বিশিষ্ট সহচর। সৈয়দ আহমদ শহীদ জিহাদের প্রচারে তাঁকে বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করতেন। বালাকোটের ঘটনার সময় তিনি সেখানে ইপস্থিত ছিলেন না। এজন্যই তিনি সৈয়দ আহমদ সাহেবের শাহাদতের ঘটনা বিশ্বাস করতে পারেন নি। এই ছিল কারণ, যা উপলক্ষ করে দুদলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এর ফল দাঁড়ালো এই যে, ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে এ ঘটনা উপলক্ষে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুরু করলো এবং অমুসলিম শক্তি ইসলামের শক্তিকে গ্রাস করে চলেছিল।

সাদেকপুরী জমাতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে একজন ছিলেন বিহারের সৈয়দ নযীর হোসাইন। পরে তিনি দিল্লীতে এসে বসবাস করেছিলেন। তিনি ১২২০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১২৩৭ হিজরী পর্যন্ত সাদেকপুরেই শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেন। ১২৪৩ হিজরীতে তিনি দিল্লীতে আসেন এবং মওলানা ইসহাক সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন অতিশয় মেধাবী এবং

বিচক্ষণ। কুরআন–হাদীস এবং অন্যান্য শাস্ত্র এবং সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর ওস্তাদ মওলানা ইসহাক সাহেবের অনুসরণে হানাফী ফিক্হ দৃষ্টেই ফতোয়া দিতেন। 'ফতোয়ায়ে আলমগিরী'তে তাঁর এতটা দক্ষতা ছিল যে, তা যেন তাঁর প্রায় মুখস্থ ছিল। মূলে মওলানা নযীর হোসাইনের আকর্ষণ সাদেকপুরী জমাতের প্রতি খুবই সামান্য ছিল। ১২৭৪ হিজরীর পরে তিনি স্বাধীন ইজতিহাদ করতেন। অনেক বিষয়ে তিনি শাহ ইসমাঈল শহীদের অনুসরণ করতেন।

সাদেকপুরী জমাতের মধ্যে একজন ছিলেন নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান। তিনি আমীর বেলায়েত আলীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং শেখ আবদুল হক বেনারসীর কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ইয়মনের আলিমদের কাছেও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইমাম শওকানীর প্রতি তাঁর বিশেষ ভক্তি ছিল।

(আত্ তাহ্মীদ ঃ ১৪৬ পৃঃ)।

সাদেকপুরী জমাত সম্পর্কে 'আত তাহ্মীদ' (১৪৮ পৃঃ) থেকে আরও জানা যায় যে, সাদেকপুরী জমাতের বেশি ঝোঁক ছিল শাহ ইসমাঈল শহীদ এবং মওলানা ইসহাকের প্রতি। তবে দুটো জমাতই শাহ ওয়ালীউল্লাহ এবং তার পরে ইমাম আবদুল আযীয এবং তার পরে সৈয়দ আহমদ শহীদের আনুগত্যের ব্যাপারে একমত ছিল। অবশ্য সাদেকপুরী জমাত পরে জাহেরিয়া, ইয়মনের যায়েদী এবং নজদের হাম্বলী মতাবলম্বীদের সাথে মেলামেশা করেছিল। তার ফলে তাঁরা শাহ ইসমাঈল শহীদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন এবং উক্ত দু'টি জমাতের মত ও আদর্শে অনেকখানি ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। মুশ্রিক্দের আদৌ ক্ষমা না পাওয়া এবং প্রার্থনায় কোন অসিলা অবলম্বন এই দু'টি ব্যাপারে উপরোক্ত দুই জমাতের মধ্যে যে মতানৈক্য বিদ্যমান, তা শাহ ইসমাঈল শহীদের 'তাকভিয়াতুল ঈমান' একটু মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই ধরা পড়ে। এভাবে শাহ ইসমাঈলের 'উসূলে ফিক্হ্' এবং ইমাম শওকানীর 'ইরশাদুল্ ফুগুল' পাঠ করলে ইজমার প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইসমাঈল শহীদের 'আল্ আবকাত' পাঠ করলে মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর দর্শন সম্পর্কে তাঁর এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এবং হাম্বলী মতাবলম্বীদের

মতামতের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। মওলানা নযীর হোসাইন দেহ্‌লবী ইবনুল আরাবীকে 'কাফের'বলে স্বীকার না করার প্রশ্নে শাহ্ ইসমাঈল শহীদের অনুসারী ছিলেন। তিনি 'আল হায়াত বা'দাল মওত্' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "মিয়া সাহেব, বিশিষ্ট ওলামাদের মধ্যে শায়খ মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। তাঁকে 'খত্‌মুল বেলায়েতুল্ মুহম্মদীয়া' বলে সম্বোধন করতেন। কনোজের মওলানা বশীরুদ্দীন ছিলেন ইবনুল আরাবীর বিরোধী। তিনি তাঁর বিষয় নিয়ে মিয়া সাহেবের সাথে বিতর্কের উদ্দেশ্যে একবার দিল্লী এসেছিলেন। তিনি দু'মাস ধরে দিল্লী অবস্থান করলেন। প্রতিদিন তর্ক-আলোচনায় বৈঠক সরগরম হয়ে উঠত। কিন্তু ইবনে আরাবীর প্রতি মিয়া সাহেবের যে গভীর আস্থা ছিল, তা থেকে তিনি বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হলেন না। দু'মাস পরে অবশেষে মওলানা বশীরুদ্দীন দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। এভাবে মওলানা আবূ মুজীব শামসুল হক ও ইবনে আরাবীর প্রশ্ন নিয়ে মিয়া সাহেবের সাথে ক্রমাগত কয়েক দিন তর্ক-আলোচনা করেছিলেন এবং 'ফুসুসুল হেকম্'-এর সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন। মিয়া সাহেব প্রথমে তাঁকে বুঝালেন, তারপর যখন দেখলেন যে, বিষয়টি মেনে নেওয়া যায় না, তখন তিনি বললেন ঃ 'ফুতুহাতে মক্‌কিয়া' ইবনে আরাবীর সর্বশেষ গ্রন্থ। এর দ্বারা তাঁর পূর্বের গ্রন্থ রদ হয়েছে।"

অবশ্য শাহ ইসহাকের জমাতে তাঁদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও দু'দলের বিরোধ মিটে নি। অবশেষে মওলানা ইসহাক হিজরত করে হিজাযে চলে গেলেন এবং ১২৬২ হিজরীতে মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌পন্থীরা দুই স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তার এক জমাত কথিত হতো 'দেহলবী জমাত' নামে অন্য জমাতের নামকরণ হয়েছিল 'সাদেকপুরী জমাত' বলে। আমীর বেলায়েত আলীর জমাতে সাধারণত বাংলা এবং বিহারের লোকসংখ্যাই ছিল বেশি। তিনি নতুনভাবে জিহাদের আহবান জানাতে শুরু করেন এবং নিজেকে আমীর-ই-শহীদের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। এ ছিল ১২৪৮ হিজরীর ঘটনা। মওলানা বেলায়েত আলীর জমাতের কেন্দ্র ছিল পাটনার সাদেকপুরে। এজন্যই তাঁর জমাতের নাম হয়েছিল সাদেকপুরী জমাত। মওলানা বেলায়েত আলীর সাথে

বেনারসের মওলানা আবদুল হক বিন্ ফযলুল্লাহও শরীক ছিলেন। এক সময়ে মওলানা ইসমাঈল শহীদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তা ছাড়া তিনি ইমাম শওকানীর কাছেও পড়াশুনা করেছিলেন। এঁরা সাদেকপুরী জমাতের পক্ষে রীতিমতো সংগঠনের কাজে নেমে পড়েছিলেন। তবে তাঁরা মওলানা ইসহাকের সম্ভ্রমের খাতিরে দিল্লী এবং তার আশেপাশে খোলাখুলিভাবে দলীয় প্রচার করতেন না। আমীর বেলায়েত আলী ১২৫০ হিজরীতে হিজায গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ইয়মনে গিয়ে ইমাম শওকানীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

মওলানা ইসহাক উপমহাদেশ থেকে হিজরত করে হিজায চলে গেলে আমীর বেলায়েত আলী তাঁর ভাই ইনায়েত আলীকে ১২৫৮ হিজরীতে সীমান্ত প্রদেশের বোনের নামক স্থানে আমীর–ই–শহীদ সৈয়দ আহমদের পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষারত মুজাহিদীনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। ১২৬২ হিজরীতে মওলানা ইসহাক সাহেবের ইন্তিকাল হয়ে যাওয়ার পর আমীর বেলায়েত আলী নিজেও সেখানে গেলেন এবং সেখানে তিনি কিছুটা সাফল্যও অর্জন করলেন। ১২৬৯ হিজরীতে আমীর বেলায়েত আলী ইন্তিকাল করেন এবং তাঁর জায়গায় তাঁর ভাই ইনায়েত আলী আমীর হন। মুজাহিদীনের এই জমাত সৈয়দ আহমদ সাহেবের পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এ সময় তাঁরা কোন জিহাদে অবতীর্ণ হন নি। সাদেকপুরী দলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সৈয়দ আহমদ শহীদ অদৃশ্য হয়েছেন, তিনি পুনরায় অবশ্যই ফিরে আসবেন। এ কারণেই মুসলমান আমীর এবং সুলতানগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও তাঁরা দূরেই রয়েছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, তাঁদের আমীর আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন না। এ সত্ত্বেও আমীর ইনায়েত আলীর জমাতে এমন লোকও ছিলেন, যাঁরা সৈয়দ আহমদ শহীদ পুনরায় ফিরে আসার ধারণার সাথে পুরোপুরি একমত ছিলেন না। তাঁরা অনেকটা দিল্লী জমাতের দিকেই আকৃষ্ট ছিলেন।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তাঁর 'আত–তাজুল মুকাল্লাল' গ্রন্থে ইবনে আরাবী কাফির নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, শরীয়ত এবং মারেফতের বিশেষজ্ঞ আলিমগণ যে মত পোষণ করেন, তাই তাঁর সম্পর্কে যথার্থ

মত। তাঁদের মতে ইবনে আরাবীর মত সম্পর্কে কোনরূপ বিতর্ক না করা সংগত। তাঁর যে মতগুলি বাহ্যত শরীয়তের খেলাফ বলে দেখা যাবে, সেগুলির সদর্থ গ্রহণ করা এবং তাঁর প্রতি কুফরী আরোপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। তা ছাড়া অন্য যে সব নেতৃস্থানীয় আলিম যাঁদের ধর্মপরায়ণতা সর্বজনগ্রাহ্য, যাঁদের জ্ঞান–গবেষণার প্রতি মুসলমানদের সমর্থন ছিল, সদনুষ্ঠানে 'যাঁদের' বিশিষ্ট খ্যাতি ছিল, তাঁদের সবার বেলায় এই মতই পোষণ করা উচিত।

৪১. মওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী

তাঁর পিতা ছিলেন লুৎফুল্লাহ্ আনসারী। তিনি মওলানা মাম্‌লূক আলী, মওলানা ওহীদুদ্দীন সাহারানপুরী এবং মওলানা শাহ ইসহাক সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কিছু দিন শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকেন। তিনি দিল্লীতে 'মাতবায়ে আহমদিয়া' নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং তাতে কুরআন শরীফ এবং হাদীসের গ্রন্থসমূহ নিখুঁতভাবে মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। তিনি তৎকালীন হাদীসের একজন হাফেজ ছিলেন। তিনি শায়খুল ইসলাম মওলানা মুহম্মদ কাসেমের সাথে যুক্তভাবে বুখারী হাদীসের টীকা প্রণয়ন করেন। তাছাড়া তিনি আরো অনেক হাদীসের ব্যাখ্যা লিখেছিলেন। ফলে দেশে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। তাঁর কাছে শায়খুল্ ইসলাম মওলানা মুহম্মদ কাসেম এবং আমার ওস্তাদ শায়খুল হিন্দ্ও শিক্ষালাভ করেছিলেন। মওলানা আহমদ আলী ১২৯৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।(তাহমীদ ঃ ২২৬ পৃঃ)

৪২. মওলানা শায়খ মুহম্মদ থানবী

থানাভুনের মওলানা শেখ মুহম্মদ থানবী একজন মুহাদ্দিস নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি বিরোধী ছিলেন। দেওবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মওলানা হোসাইন আহমদ মদনী এক সময় সাহারানপুরে এক বক্তৃতা প্রসংগে বলেছিলেন ঃ আমীর ইমদাদুল্লাহ্, শায়খুল ইসলাম মওলানা মুহম্মদ কাসেম এবং মওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী প্রমুখ

নেতা মওলানা শায়খ মুহম্মদ থানবীর মসজিদে গিয়ে তাঁর সাথে আজাদীর জন্য জিহাদ সম্পর্কিত ব্যাপারে মত বিনিময় করেন। মওলানা শায়খ মুহম্মদ থানবী নিরস্ত্র উপমহাদেশীয়দের জিহাদের কোন সংগতি নেই বলে এরূপ জিহাদের বিরোধিতা করেন। মওলানা মুহম্মদ কাসেম সাহেব বললেন ঃ 'আমরা কী বদর যোদ্ধাদের চেয়েও নিঃসম্বল ?' উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনে আমীর ইমদাদুল্লাহ্ বললেন ঃ 'আল্‌হামদু লিল্লাহ ! ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেছে।' এই বলে তাঁরা সেখান থেকে চলে এসে জিহাদের প্রস্তুতি নিলেন। আমীর ইমদাদুল্লাহ সর্বাধিনায়ক, মওলানা কাসেম সিপাহ্‌সালার এবং শায়খুল ইসলাম মওলানা রশীদুদ্দীন কাজী নিযুক্ত হলেন। এভাবে থানাভুনকে একটি দারুল্ ইসলামে পরিণত করলেন। তারপর তাঁরা অভিযান করে মুযাফ্‌ফর নগর জেলার শামেলী কসবা অধিকার করেছিলেন। মরহুম মওলানা আশরাফ আলী থানবী উক্ত শায়খ মুহম্মদ থানবীর আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং শায়খুল হিন্দের রাজনৈতিক মতামত ভ্রান্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। মওলানা আশরাফ আলী থানবীর যে জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে লিখিত আছে যে, তিনি শায়খ মুহম্মদ থানবীর অনুসারী ছিলেন। মওলানা আমীর ইমদাদুল্লাহ্ এবং শায়খ মুহম্মদ মূলে একই পীরের খলীফা ছিলেন। একমাত্র জিহাদের প্রশ্নে তাঁরা পরস্পর ভিন্ন হয়ে গেলেন এবং জমাতও দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। সুতরাং মওলানা আশরাফ আলী অতপর কোন্ সূত্রে আমীর ইমদাদুল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন? মওলানা শায়খুল হিন্দ এবং তাঁর ওস্তাদের বিশেষ কর্মপন্থাকে ব্যর্থ করে দেবার এটা একটা জঘন্য অপকৌশল।

৪৩. মওলানা মাহমুদ হাসান

শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমুদ হাসান ছিলেন আমার ওস্তাদ। দেওবন্দ অবস্থানকালে তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল যুলফুকার আলী। বংশসূত্রের দিক থেকে তিনি উমাইয়া গোত্রীয় কোরাইশ। তিনি ১২৬৮ হিজরী অথবা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতা এবং চাচার কাছে। দেওবন্দ মাদ্রাসা শুরু হলে তিনি

সেখানে ভর্তি হন। এবং মওলানা মামলূক আলী সাহেবের পুত্র মওলানা ইয়াকুব এবং মওলানা মাহমুদ দেওবন্দীর কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মওলানা কাসেম সাহেবের সংস্পর্শে থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মওলানা আহমদ আলী, শায়খ মুহম্মদ মযহর নানুতবী এবং শেখ আবদুর রহমান পানিপথীর কাছ থেকে শিক্ষা দানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁরা সবাই তাঁকে এ কাজের যোগ্য বিবেচনা করে শিক্ষাদান কার্যে দোওয়া করেন। মওলানা মুহম্মদ কাসেম মদীনা শরীফ যান এবং মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছ থেকে তাঁর জন্য অনুমতি আনয়ন করেন। তাছাড়া তিনি তাঁর ওস্তাদ মওলানা কাসেম সাহেবের অনুমতিক্রমে হাজী ইমদাদুল্লাহ্ সাহেবের কাছেও আধ্যাত্মিক প্রেরণা অর্জন করেন। যে সমস্ত বিশিষ্ট ওলামা শায়খুল ইসলাম মওলানা মুহম্মদ কাসেম সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনজন বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই তিনজনের মধ্যে শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেব ছিলেন ওস্তাদের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। তিনি ওস্তাদের জ্ঞান ও বিদ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন এবং সর্বাপেক্ষা বেশি অনুগতও ছিলেন। আমি (লেখক) তাঁর কাছে মওলানা কাসেম সাহেব প্রণীত 'হুজ্জাতুল ইসলাম' পাঠ করেছি। পড়ার সময় আমার মনে হতো যেন ইল্‌ম ও ঈমান আমার প্রতি উপর থেকে বর্ষিত হচ্ছে। হযরত শায়খুল হিন্দ আমার মতে, অসম্ভব তীক্ষ্ন ধীসম্পন্ন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষায় যাঁদেরকে মুফ্‌হমীন (গভীর জ্ঞানসম্পন্ন) বলা হয়, তিনি ছিলেন সেই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ওস্তাদের প্রতি তাঁর ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। ওস্তাদের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন। মওলানা কাসেম সাহেবের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল ভক্তি এবং বিনয়ের। এই সম্পর্ককে শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ আহ্‌লে বাইয়াতের সম্পর্ক বলে নাম দিয়েছেন।

হিজরী ১৩৩৯ সনের ১৮ই রবিউল্ আউয়াল মোতাবেক ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর তারিখে ইমাম আবদুল আযীযের মৃত্যুর এক শত বছর পরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইফাবা--৯১-৯২--প্র/১৪৭৯ (উ)--৫২৫০